বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

বাগেরহাট

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
বাগেরহাট

প্রধান সম্পাদক
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
মোল্লা আমীর হোসেন

সংগ্রাহক ও সংকলক
চানক্য বাড়ৈ
রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস
প্রবীর কুমার বিশ্বাস
রেখা আক্তার

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
বাগেরহাট

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/ জুন ২০১৪

বা/এ ৫৩৩৩

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
কর্মসূচি পরিচালক
লোকজ সংস্কৃতি বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITIR ETIHASH GRONTHAMALA: BAGARHAT (Present state of Folklore in Bagarhat District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan. Managing Editor : Md Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : 300.00 only.

ISBN-984-07-5342-8

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার সাংস্কৃতিক জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং

www.pathagar.com

অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *ময়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *ময়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ গ্রন্থমালা ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্‌ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed”. অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের

www.pathagar.com

অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।

৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।

৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।

৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।

৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।

৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।

১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্যাদি/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্কওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রাপথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

www.pathagar.com

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

অ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ঞ. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে ফিল্ড-ওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner

www.pathagar.com

rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ট. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ঠ. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ড. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল

www.pathagar.com

বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলজ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা

www.pathagar.com

(চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাগুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুরপুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা, বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর),

www.pathagar.com

আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শির্নি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মণ্ডা (মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), বরিশালের উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহর্রমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

www.pathagar.com

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম। তবে লোককবি ও পথুয়া সাহিত্যের কথা থাকবে।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা কাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth)।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বে ়শিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকখাদ্য (folk food), ঘ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঙ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk Song) ও গাথা (ballad)
ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা
পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।
ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. ঘাটুগান, ২. গাজির গান, ৩. বাইদ্যা বা বাইদ্যানীর গান, ৪. পালাগান, ৫. একদিল গান, ৬. কবিগান, ৭. জারিগান, ৮. বিষহরির পাঁচালি। খ. লোকনৃত্য।
সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-মেয়েলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. মহিলা খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।
অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার প্রভৃতি।
নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।
দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)
একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)
দ্বাদশ অধ্যায় : লোকছড়া ও ভাটকবিতা (folk rythm & vat poem)
ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)
চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রধান সমন্বয়কারী, বাংলা একাডেমির সংশ্লিষ্ট পরিচালক, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, নিবন্ধন অফিসার রাফিকা সুলতানা সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান বাগেরহাট জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাগেরহাটের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

আমরা আশা করি, এই সংকলন গ্রন্থটি লোকজ সংস্কৃতানুরাগীদের কাছে আদরণীয় হবে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৫৮

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. নদ-নদী ও খাল-বিল
ঙ. বনভূমি ও গাছপালা
চ. জনবসতির পরিচয়
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
ঝ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঞ. মুক্তিযুদ্ধ
ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৫৯-৭০

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৭১-৭৫

লোকশিল্প

১. মৃৎশিল্প
২. শোলা শিল্প

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ৭৬-৭৯

ঘরবাড়ি (ঘরের বিভিন্ন ধরন)

লোকসংগীত (folk song) ৮০-২৩৪

১. পটগান
২. অষ্টকগান
৩. প্রধান প্রধান লোকসংগীত
৪. ময়না গান
৫. হাচিয়া গান
৬. বারাশিয়া গান

www.pathagar.com

৭. দেহতত্ত্ব গান
৮. মেয়েলি গীত
৯. বিয়ের গান
১০. গাজির গান
১১. রয়ানি গান
১২. রামায়ণ গান
১৩. সাতপাল বা হালুই
১৪. বাস্তুকে জাগানোর গান

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২৩৫-২৩৮

ক. মৃদঙ্গ
খ. সারেঙ্গী
গ. ঢোল
ঘ. কাঁসা
ঙ. খরতাল
চ. করতাল
ছ. মন্দিরা
জ. আড়বাঁশি
ঝ. একতারা

লোকউৎসব (folk festival) ২৩৯-২৪৩

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব
২. ঈদ উৎসব
৩. শারদীয় দুর্গোৎসব
৪. জন্মাষ্টমী
৫. দোল উৎসব
৬. আম্বুবাচী
৭. গাস্বি

লোকমেলা (folk fair) ২৪৪-২৪৫

লোকাচার (ritual) ২৪৬-২৫১

১. সাধভক্ষণ
২. বুড়ির ঘরপোড়া অনুষ্ঠান
৩. গায়ে হলুদ
৪. মনসা পূজা
৫. রাধা বয়ড়ার বনবিবির পূজা
৬. বুড়ির বাসা

www.pathagar.com

লোকখাদ্য (folk food) ২৫২-২৫৪

লোকনাট্য (folk drama) ২৫৫-২৯৯

যাত্রা : পারিবারিক রামযাত্রার দল

লোকক্রীড়া (folk games) ৩০০-৩০৫

১. লুকোচুরি
২. সাতচাড়া
৩. পুতুল বিয়ে
৪. এক্কাদোক্কা
৫. কড়িখেলা
৬. কানামাছি
৭. গুলিখেলা
৮. গোলাপ-টগর
৯. গোল্লাছুট
১১. ঘুঁটিখেলা
১১. ওপেনটি বায়োস্কোপ
১২. বাঘবন্দী
১৩. পুতুল খেলা
১৪. ষোলোগুটি
১৫. লাঠিখেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৩০৬-৩২১

১. পতিতাবৃত্তি
২. হিজরা
৩. ঘরামি/ছৈয়াম/বাউয়ালি
৪. সুন্দরবন দুবলায় শিশু শ্রম দাস
৫. অলংকার খোঁজার ডুবুরী
৬. পাতার বাঁশি বাজিয়ে জীবন-জীবিকা
৭. তাল পাতার বল, চাটাই ও পাখার জীবিকা
৮. মৎস্য শিকার
৯. নলের টাকায় সঞ্চয়
১০. কবিরাজ

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৩২২-৩২৭

ক. লোকচিকিৎসা

১. ঝাড়া

২. সঞ্জীবনী অক্ষয় নবরত্ন তাবিজ

খ. তন্ত্রমন্ত্র

১. বাঘ ঠেকাতে ব্রহ্মজাল মন্ত্র

২. মাছ শিকারে গিয়ে বাঘ তাড়ানোর মন্ত্র

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk reform) ৩২৮-৩৩০

ধাঁধা (riddle) ৩৩১

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩৩২-৩৩৭

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩৩৮-৩৪০

১. সুন্দরবনে ত্রিকোন দ্বীপে হরিণ শিকার

২. মুণ্ডাদের কুমির শিকার

৩. বাঘ শিকার

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

সুন্দরবনে বাঘের বাস
দরাটানা ভৈরব পাশ
সবুজ শ্যামলে ভরা নদীর বাঁকে
বসতো যে হাট
তার নাম বাগেরহাট

বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের একটি অতি পুরোনো জনবহুল এলাকা বাগেরহাট। দেশের অনেক অঞ্চল যখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ তখন এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল সুসংগঠিত-জনপদ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে বলে জানা যায়। কখন কারা কোথা থেকে এসে এখানে জনবসতি গড়ে তোলে সে প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। পাঠান আমলে ইসলাম প্রচারক হযরত খানজাহান (রা.) এখানে পৌঁছান। এ অঞ্চল আবাদ এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য।

কোনো অঞ্চলকে বুঝতে গেলে সে অঞ্চলের নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বাগেরহাট নামটি কত পুরোনো তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, এর প্রাচীন নাম খলিফাতাবাদ। এর আর এক প্রাচীন নাম 'হাবেলী কসবা'। হযরত খানজাহান (রা.) এর সময় খলিফাতাবাদ নামকরণ হয়। খলিফা শব্দ থেকে খলিফাতাবাদ। খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। খলিফাতাবাদ শব্দের অর্থ প্রতিনিধির শহর। খানজাহান (রা.) গৌড়ের সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯)-এর সেনাপতি হিসেবে এ অঞ্চল দখল করে সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতেন বলে জানা যায়। এ কারণেই এ স্থানের নামকরণ করা হয় খলিফাতাবাদ।

মোগল আমলের শেষের দিকে প্রস্তুত একখানা পর্তুগিজ মানচিত্রে দক্ষিণ বঙ্গের পাঁচটি বন্দর নগরীর একটি ছিল খলিফাতাবাদ। এর বর্তমান নাম বাগেরহাট। বাগেরহাট নামটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের এবং এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। 'বাগের' শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে হাট শব্দ যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, একটি বাজার প্রতিষ্ঠার সাথে এর নামকরণ সম্পৃক্ত। অনেকের মতে, নবাবী আমলের শাসনকর্তা আগা বাকেরের নামানুসারে বাগেরহাট নামকরণ হয়েছে। তুর্কিস্থানের অধিবাসী আগা বাকের খান নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলে শাসনভার গ্রহণ করে এ অঞ্চলে আসেন। শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি একটা বাজারের পত্তন করেন। তার নাম অনুসারে এ বাজারের নাম হয় বাকরগঞ্জ বা বাকেরহাট, যা পরবর্তীতেকালে বাগেরহাটে পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

www.pathagar.com

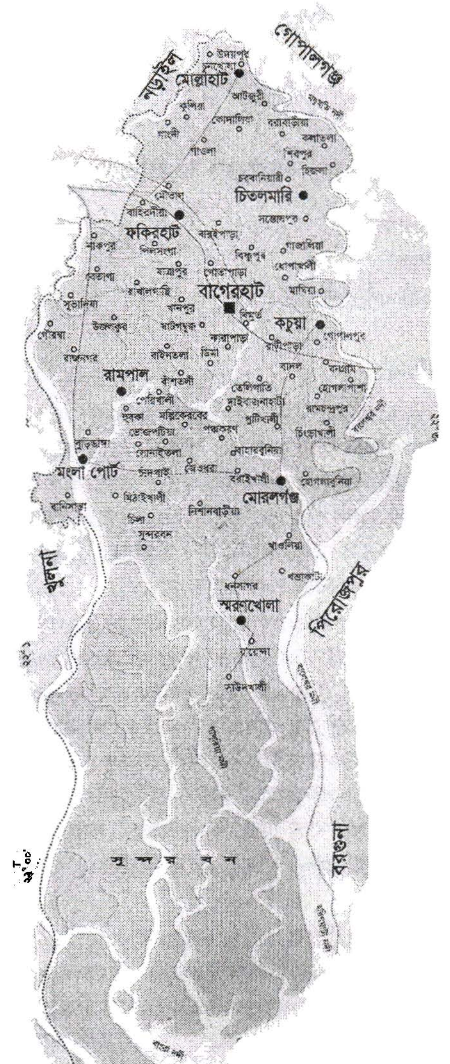

বাগেরহাট জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

তার নাম অনুসারে এ বাজারের নাম হয় 'বাকরগনতে' বা 'বাকেরহাট'। যা পরবর্তীতেকালে পরিণত হয়েছে বাগেরহাটে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাবেক জেলা প্রশাসক সিরাজউদ্দিন আহমদের লেখায় এর সমর্থন মেলে। তার মতে, আগা বাকের খান হযরত খানজাহানের ভক্ত ছিলেন। তার মাজারে শত শত লোক আগমন করত। তাদের সুবিধার জন্য তিনি বাগেরহাট নদীর তীরে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে বন্দরের নামকরণ হয় বাগেরহাট। কারো কারো মতে, বাগেরহাটের নিকটবর্তী সুন্দরবন থাকায় এলাকাটিতে বাঘের উপদ্রব ছিল। এ জন্য এ এলাকার নাম হয় বাঘেরহাট, ক্রমান্বয়ে তা বাগেরহাট-এ রূপান্তরিত হয়। মতান্তরে, হয়রত খান জাহান আলীর প্রতিষ্ঠিত 'খলিফাত-ই-আবাদ'। এর বিখ্যাত 'বাগ' অর্থ বাগান অনুসারে এর নাম হয় বাগেরহাট। এর সমর্থকদের মতে, খান জাহান আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গল সাফ করে এ অঞ্চলে এতো সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরি করা হয়েছিল যেন এলাকা বাগানের হাটে পরিণত হয়েছিল। এই বাগান বা বাগ-এর প্রাচুর্যতার জন্যই বাগেরহাট নামকরণ হয়েছে। তবে এলাকায় বর্তমানে ব্যাপক প্রচারিত ও গ্রহণযোগ্য মতটি হলো- শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটির উত্তর দিকের হাড়িখালী থেকে বর্তমান নাগের বাজার বা হাট পর্যন্ত যে লম্বা বাঁক রয়েছে পূর্বে সে বাঁকের পুরাতন বাজার এলাকায় একটি হাট বসত। নদীর বাঁকে প্রতিষ্ঠিত এ হাট থেকেই প্রথমে বাকের হাট পরে বাগেরহাট নামে এলাকাটি পরিচিত হয়।

কচু রায় নামক জমিদারের নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাজারের নামকরণ হয় কচুয়া বাজার এবং এখানে থানা স্থাপিত হলে তা কচুয়া থানা ও সে অনুযায়ী পরবর্তীকালে উপজেলার নামকরণ হয়।

বাংলার শাসক যখন নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯) তখন হযরত খান জাহান আলী (রা.) এ অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন এবং বর্তমান বাগেরহাটে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এ অঞ্চল শাসন করেন। মানুষের কল্যাণে তিনি ষাটগম্বুজ মসজিদ (এখানে বসে তিনি মূলত শাসন কার্য পরিচালনা করতেন)সহ আরো অনেক মসজিদ, দিঘি, রাস্তা, হাট-বাজার তৈরি করেন । তাঁর মাজার গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ২৬ জিলহজ্ব ৮৬৩ হিজরি (১৪৫৯ খ্রি.) তে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর তিরোধানের পর হুসেন শাহী বংশের উত্তরাধিকারীরা শাসন কার্য অব্যাহত রাখেন। হোসেন শাহী বংশের সুলতান নসরৎ শাহ খলিফাতাবাদে যে টাকাশাল স্থাপন করেছিলেন তা এখানকার মিঠাপুকুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে এখনো একটি মসজিদ তখনকার রাজকার্যের সাক্ষ্য বহন করছে। মোগল আমলে এ অঞ্চল রাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারে আসে এবং তাঁর পতনের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এখানকার যাত্রাপুরের অযোধ্যা নামক স্থানে তিনি একটি আকর্ষণীয় মঠ নির্মাণ করেন, যা কোদলা মঠ নামে পরিচিত। মোগল আমলে শাসনকর্তা আগা বাকের এ এলাকার ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন। এভাবে ক্রমেই এ এলাকা সমৃদ্ধ হতে থাকে একটি উন্নত ও জনবহুল জনপদে বাগেরহাট রূপান্তরিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। বিশেষ করে জমিদার ও ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকাবাসীর সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ সৃষ্টি হতো।

www.pathagar.com

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর মোড়েল বাহিনীর সাথে রহিমুল্লাহর সংঘর্ষ তার অন্যতম উদাহরণ। এর তদন্ত করেছিলেন খুলনার তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৬৩ খ্রি. বাগেরহাট থানা যশোর জেলার একটি মহকুমায় উন্নীত হয় এবং এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয় বর্তমান বাগেরহাট শহরে। তখন খুলনাও যশোরের একটি মহকুমা। ১৮৮২ সাথে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা মহকুমার সমন্বয়ে খুলনা জেলা গঠিত হয়। জেলা শহর নিকটবর্তী হওয়ায় বাগেরহাট শহরের উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হয়। ১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট মহকুমা জেলায় উন্নীত হয় এবং বাগেরহাট শহরেই এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। এতে বাগেরহাট শহরের গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পায় এবং 'এ' ক্যাটাগরির পৌরসভায় উন্নীত হয়। জেলার তিনটি পৌরসভার মধ্যে সদর পৌরসভা সর্ববৃহৎ।

মংলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উপজেলা। খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার অধীন। মংলা নদীর নাম অনুসারে এই উপজেলার নাম হয়েছে মংলা। প্রথমে মংলা পার্শ্ববর্তী থানা রামপাল এর অধীন ছিল। ১৯৭৬ সালে মংলা থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে উপজেলা হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

পাল বংশীয় (সপ্তদশ শতক) সময়ে কোন এক রাম পদ পাল এর নামনুসারে রামপাল উপজেলান নাম করণ হয়েছে । ১৮৬৩ খ্রি. রামপাল থানা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৮৩ খ্রি. উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

১৮৪৯ খ্রি. মার্গারেট মোরেল নামে এক ব্রিটিশ মহিলা সুন্দরবনের এক বিশাল এলাকার জমিদারিত্ব লাভ করেন। এখানে পানগুছি নদীর তীরে কুঠি গড়ে তুলে পুত্রদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। এ কুঠিবাড়িকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে ওঠে বাজার ও ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং তাঁর নামানুসারে এ বাজারের নাম হয় মোরেলগঞ্জ। ১৮৬৩ খ্রি. পর্যন্ত এ এলাকা বাখেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ খ্রি. পর্যন্ত খুলনা জেলার রামপাল থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৬ খ্রি. খুলনা জেলার স্বতন্ত্র থানায় রূপান্তরিত হয়।

শরণখোলা অর্থাৎ আশ্রয়স্থল। শরণখোলার এই নামের পেছনে যে প্রচলিত গল্প আছে তা হলো, দিগন্ত বিস্তৃত বলেশ্বর নদীর পূর্ব পাড়ের বিতাড়িত ব্যক্তিরা নিরাপদ আশ্রয়স্থান হিসেবে সুন্দরবনের এই এলাকা বেছে নেয়। বন কেটে আবাদ করে এখানে লোকালয় গড়ে তোলে। শরণখোলার বিবরণ দিতে গিয়ে স্বরোচিষ সরকার তাঁর একাত্তরে বাগেরহাট গ্রন্থে লিখেছেন, 'উনিশ শতকের শেষার্ধে মোরেলগঞ্জ থানার সাউথখালী ইউনিয়নের শরণখোলা গ্রামে একটি ফরেস্ট অফিস ও পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হয়েছিল'। তখন সুন্দরবন সংলগ্ন এই অঞ্চল ছিল লাহা এস্টেটের অংশ। ১৯০৭ সালে মোরেলগঞ্জ থানার ধানসাগর, খোন্তাকাটা, রায়েন্দা এবং সাউথখালী ইউনিয়ন নিয়ে স্বতন্ত্র একটি থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। থানার নাম শরণখোলা হলেও থানা সদর প্রতিষ্ঠিত হয় ভোলা নদীর উত্তর তীরে দক্ষিণ রাজাপুর গ্রামে। ভোলা নদীতে চর পড়তে শুরু করল ১৯৬৫ সালের ১৬ই আগস্ট থানার পূর্ব প্রান্তে বলেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত রায়েন্দা বাজারে থানা সদর স্থানান্তরিত হয়।"সুন্দরী গাছের জন্য সুন্দরবনের নাম হয় সুন্দরবন।

www.pathagar.com

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

২২° ৩২´ থেকে ২২° ৫৬´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯° ৩২° মিনিট থেকে ৮৯° ৪৮´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের জনপদের নামই বাগেরহাট। এ জেলার আয়তন ৫৮৮২.১৮ বর্গকিলোমিটার। তম্মধ্যে ১৮৩৪.৭৪ বর্গকিলোমিটার বনাঞ্চল, ৪০৫.৩ বর্গকিলোমিটার জলাশয় এবং অবশিষ্টাংশ নিম্ন সমভূমি। এ জেলার উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলা, পশ্চিম ও উত্তরে খুলনা জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে পিরোজপুর জেলা।

১,৪৬২.২২ বর্গ কিলোমিটার এর এই উপজেলার উত্তরে রামপাল উপজেলা। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে মোড়লগঞ্জ এবং শরণখোলা উপজেলা। পশ্চিমে পশুর নদী।

রামপাল উপজেলার উত্তরে বাগেরহাট সদর এবং ফকিরহাট উপজেলা। দক্ষিণে মংলা এবং মোরেলগঞ্জ উপজেলা। পূর্বে মোরেলগঞ্জ ও বাগেরহাট সদর উপজেলা। পশ্চিমে বাটিয়াঘাটা এবং দাকোপ উপজেলা।

আয়তন ১,৮৮,১৬০ একর, ২৯৪ বর্গমাইল। নদী বাদে ৩৭.১২০ একর ৫৮ বর্গমাইল। এখানে শিক্ষিতের হার ৩৮.১% এই উপজেলায় পাকা রাস্তা আছে ৩৬.২৩ কিলো এবং কাঁচা রাস্তা মোট ২৩৬। কিলো এবং আধাপাকা রাস্তা ১৪ কিলোমিটার। দিঘি ও পুকুরের সংখ্যা মোট ২০০৮টি। তন্মধ্যে সরকারী খাস পুকুর আছে ০৬ টি। বেলী ব্রিজ আছে ০৮টি এবং কালভার্ট ১৮টি আর জেলা ব্রিজ ০৫টি। উপজেলা পরিষদ সেতু আছে ২০টি। বন এলাকা ১৪৬.৯২৫ একর ২৩০ বর্গ মাইল।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে তবে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনামলে পূর্ববর্তী রাজবংশের অনুসারীরা বা পরাজিতরা আত্মরক্ষার্থে সুন্দরবনে আশ্রয় নিত। এর পাশাপাশি রাজধর্মের অনুসারীদের অত্যাচারে অন্য ধর্মের মানুষের আশ্রয় স্থলও ছিল এই সুন্দরবন। এই জনপদ ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্ত ও তাঁর বংশধরদের অধীনে ছিল। ৭ম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এটা দখল করেন। ১৫শ শতকে খানজাহান আলীর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাগেরহাট পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মোঘলদের অধীনে থাকার পর ইংরেজ শাসনাধীনে আসে।

রাজা শশাঙ্কের আমলে শৈবরা রাজানুগ্রহ লাভ করে ও বৌদ্ধসহ অন্যরা অত্যাচারিত হয়ে বিতাড়িত হওয়ার অভিযোগ আছে। এরপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরা ক্ষমতায় এলে হিন্দুরা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে সুন্দরবনে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে সেনদের আমলে বৌদ্ধরা অত্যাচারের শিকার হয়ে সুন্দরবনে আশ্রয় নেয়।

এভাবে এ অঞ্চল বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের আবাস স্থলে পরিণত হয়। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এদেরই কোনো একটি গোষ্ঠীর শাসন এখানে চলছিল। সুন্দরবনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সুন্দরবনে বৌদ্ধদের কর্তৃত্ব ছিল। কারণ সুন্দরবনে সেন রাজা লক্ষণ সেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাল বংশীয় ও বৌদ্ধ ধর্মীয় ডোম্মন পাল স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমর্থনও তিনি লাভ

www.pathagar.com

করেছিলেন। লক্ষণ সেন ডোম্মন পালকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং এরপর এ এলাকায় আর কোন বহিঃশক্তির আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। হযরত খান জাহান আলীর খননকৃত 'খাঞ্জেলী দীঘি' খননকালে পাওয়া ধ্যানী বৌদ্ধমূর্তি থেকে অনুমিত হয় যে খান জাহান আলীর আগমনের বহু পূর্ব হতেই বাগেরহাটে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি জনপদ ছিল। বর্তমানে সে মূর্তিটি ঢাকার কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারের সংরক্ষিত আছে। তাই মনে করা যুক্তি সঙ্গত যে, এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি ডোম্মন পালের বংশধরদের শাসন চলছিল এবং তাদের বিরুদ্ধেই পাঠান সেনাপতি ও ইসলাম ধর্মের প্রচারক খান জাহান আলী অভিযান চালান। তিনি তাদেরকে পরাজিত করে এ এলাকা মুসলিম শাসনাধীন আনেন।

বাগেরহাটে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে পঞ্চদশ মাঝামাঝি সময় ভারতের জৌনপুর থেকে ৩৬০ জন নিয়ে ইসলাম প্রচারের লক্ষে এ অঞ্চলের আগমন করেন মহান আউলিয়া হযরত খানজাহান (রা.)। তবে তিনি বাংলার সুলতানী শাসকদের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং দিগ্বিজয়ে বের হয়ে জয় লাভ করতে করতে বাগেরহাট অঞ্চলে এসে সর্বশেষ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এখানে স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান চাঁপাইনবাব গঞ্জের সোনা মসজিদ এলাকা হয়ে রাজশাহী জাহানাবাদ থেকে ঘাঁটি সরাতে সরাতে তিনি যশোরের বারো বাজারে আসেন। এখান থেকে তাঁর এ দলটি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে তাঁর নেতৃত্বে একটি দল ভৈরব নদের তীর ধরে বর্তমান খুলনার নয়াবাদ এলাকায় এসে ঘাটি স্থাপন করেন। অন্য দলটি তাঁর অন্যতম শিষ্য বুড়া খাঁর নেতৃত্বে কপোতাক্ষ নদের তীর ধরে বর্তমান পাইকগাছায় এসে অবস্থান নেন। খানজাহান আলী খুলনায় এসে জঙ্গল সাফ করে এখানে আবাদের ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমান বাগেরহাট এলাকার আদি অধিবাসীদের পরাজিত করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে তিনি খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাটসহ বরিশালের একাংশ নিয়ে গড়ে তুলে ছিলেন বিশাল 'খলিফাতাবাদ'। এর প্রধান নগর আজকের এই বাগেরহাট। প্রায় ছয়শ বছর ধরে বিশ্ববিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদসহ অন্যান্য বেশকিছু মহামূল্যবান প্রত্নসম্পদ অক্ষত অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এসব কীর্তিশালা থেকে স্বীকার করতে হয় যে, এখানে একটি সুখী সমৃদ্ধ জনবহুল এলাকা তিনি গড়ে তুলে ছিলেন। প্রাচীন সেই খলিফাতাবাদ নগরীকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বাগেরহাট শহর। এটা বর্তমানে দেশের একটা অনন্য শ্রেষ্ঠ জেলা, দেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে এ জেলার অবস্থান ১৮৬৮.৯১ বর্গ কি. মি.। সুন্দরবনসহ এর সর্বমোট আয়তন ৫৮২৮ বর্গ কি. মি.। এর পূর্বসীমানায় রয়েছে বলেশ্বর নদী, পশ্চিমে খুলনা জেলা, উত্তরে মধুমতি নদী এবং দক্ষিণে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর। শতাধিক বৎসর খুলনা জেলার একটা মহকুমা থাকার পর ১৯৮৪ সালে তা একটি স্বতন্ত্র জেলায় রূপলাভ করে। বর্তমানে এ জেলার ৩ টি পৌরসভা, ৯ টি থানা ও জনসংখ্যা ১৪,৩১৩৩২ জন।

সুবিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠ, অজস্র গাছপালা, নদ-নদী, খাল-বিল, নয়নাভিরাম বনভূমি এবং সমুদ্র নিয়ে অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত জেলা এই বাগেরহাট। এখানে সাতশো থেকে ১৫শ শতাব্দীর বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। বিখ্যাত সাধক ও শাসক খানজাহান আলীর রাজধানী, তাঁর দৃষ্টিনন্দন মাজার ও দিঘি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন এবং দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর মংলা এই জেলাতে অবস্থিত।

www.pathagar.com

এই জেলার আয়তন ৩৯৫৯.১১ বর্গকিলোমিটার যার জলভাগ ৭৫.৮৬ বর্গকি. মি. এবং ১৮৬৮.৯১ বর্গকি. মি. বনাঞ্চল। বাগেরহাট জেলার পূর্বে বলেশ্বর এবং পশ্চিমে পশুর নদী যথাক্রমে পিরোজপুর ও খুলনা জেলা থেকে একে পৃথক করেছে। উত্তরে গোপালগঞ্জ এবং দক্ষিণে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর এই হল বাগেরহাটের সীমারেখা। প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বাগেরহাট পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে গড়ে উঠলেও ১৮৪২ সালে এটি যশোর জেলার খুলনা মহকুমার একটি থানার মর্যাদা পায় এবং ১৮৬৩ সালে খুলনা মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশে যশোর জেলার মহকুমার মর্যাদা পায়। অতঃপর বাগেরহাট ১৮৮২ সালে খুলনা জেলার মহকুমা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৮৪ সালে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্রিটিশ শাসনামলে এখানে জনবসতির শুরু। মংলা যশোর জেলার হোগলা পরগনার অন্তর্গত ছিল। যশোর, খুলনা,বাগেরহাট এবং বরিশাল থেকে কিছু লোকজন বসবাস ও চাষাবাদের জন্য এখানে আসে। ১৮০০ খিস্টাব্দের প্রথম দিকে মংলা ছিল সুন্দরবন। সুন্দরবন কেটে এখানে বসবাস এবং চাষাবাদ শুরু হয়। বর্তমানে এই উপজেলায় ৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা রয়েছে। মোংলা পোর্ট নামে এখানে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর।

রামপাল এক সময় যশোর জেলার হোগলা পরগনার অধীন ছিল। ১৮০০ সালের প্রথম দিকে এখানে সুন্দরবন ছিল। ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুষ্টিয়া, যশোর থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে বসবাস এবং কৃষি কাজের জন্য আসে এবং জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে। জমিদাররা তাদেরকে জমি স্থায়ী বন্দোবস্থ দিত। কিন্তু খাজনা দেয়ার ভয়ে তারা জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে চাইত না। ফসল হলে খাজনা দিবে এই শর্তে জমি বন্দোবস্ত নেয়া শুরু করে কৃষকরা।

পানগুছি নদীর তীরে মোরেলগঞ্জ উপজেলার সদরদপ্তর অবস্থিত। এটি একটি পৌরসভাও। সদরদপ্তর এলাকাটি একটি বড় বাজার হিসেবেও খ্যাত। মোরেলগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা মার্গারেট মোরেল জঙ্গল সাফ করে আবাদী এলাকায় পরিণত করার জন্য নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এখানে আনেন এবং মাত্র দশ বছরের মধ্যে ৬৫ হাজার বিঘা জমি আবাদী করতে সক্ষম হন। তবে অঙ্গীকার অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করায় কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। এ সময় জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান মাহমুদের সাথে রহিমুল্লাহর বিরোধে জমিদারের ম্যানেজার ডেনিস হেলি মাহমুদের পক্ষে রায় দিলে রহিমুল্লাহ পক্ষপাতিত্বের কারণে ক্ষুব্ধ হয় এবং এক পর্যায় বারইখালীর কৃষক রহিমুল্লাহ কৃষকদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ করে। এ প্রেক্ষাপটে রহিমুল্লাহর সমর্থক কৃষকরা ডেলিকে লাঞ্চিত করলে হেলির বন্দুকধারী বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল বাহিনী রহিমুল্লাহর বাড়ি আক্রমণ করে। ফলে শুরু হয় যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বরোচিষ সরকার তাঁর *একাত্তরে বাগেরহাট* নামক গ্রন্থে লিখেন যে, গভীর রাতে হেলির নেতৃত্বে রহিমুল্লাহর বাড়ি আক্রমণ করা হয়।

বন্দুকধারী বরকন্দাজরা বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। রহিমুল্লাহর সংগ্রহেও বন্দুক ছিল। সারারাত ধরে যুদ্ধ চলে। কিন্তু ভোর হতে না হতেই

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষের অসংখ্য লাঠিয়াল ও প্রচুর সংখ্যক বন্দুকধারীদের আক্রমণের মুখে রহিমুল্লাহর লাঠিয়ালগণ বেকায়দায় পড়ে যান। রহিমুল্লাহর বাড়ির চারদিকে গড়ের মতো করে খাল কাটা ছিল এবং সদর দরজাটা ছিল খোলা। পথটিকে তিনি কাঁথা ভিজিয়ে টাঙিয়ে রেখেছিলেন, যাতে গুলি এসে তাতে বাধা পায়। রহিমুল্লা এই কাঁথার আড়াল থেকে শত্রুপক্ষের দিকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বল্পগুলি থাকায় রহিমুল্লাহর দিক থেকে আক্রমণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে। অবশেষে তিনি পরাজিত এবং নিহত হন। জমিদারের লোকেরা শত শত মানুষের ঘড়বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং লুটপাট করে।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ফকিরহাট থানায় অবস্থান কালে এই ঘটনা তিনি জানতে পারেন এবং সাথে সাথে কিছু পুলিশ নিয়ে উক্ত স্থানে পৌছান এবং যশোর থেকে আরো পুলিশ চেয়ে পাঠান। মামলা চলে ১৫বছর। একজনের ফাঁসি হয়। চৌত্রিশ জনের যাবজ্জীবন হয়। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে ডেনিস হেলি খালাস পান, পরে তিনি আসামে অবস্থানকালে বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘ. নদ-নদী ও খাল-বিল

বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে সুবিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠ, অজস গাছপালা, নদ নদী, খালবিল ও সমুদ্র নিয়ে অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত জেলা এই বাগেরহাট।

বাগেরহাট জেলার পূর্বে বলেশ্বর এবং পশ্চিমে পশুর নদীর অসংখ্য খাল বিলে ৭৫.৮৬ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে এ অঞ্চল। এসব খাল-বিলে প্রায় সারা বছরই পানি থাকে, শুকনো মৌসুমে পানি কিছুটা কম থাকলেও বর্ষা মৌসুমে নদ-নদীগুলো পানিতে থাকে টইটম্বুর। সমুদ্র সংলগ্ন এলাকা বলে বর্ষার মৌসুমে পানির চাপ বেশি থাকে। সিডর ও আইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বার বার আঘাত হানে এ এলাকায়। রেকর্ড আছে যে বিগত ২০০ বছরে এই এলাকায় (সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে) ৭০টি বড় দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ১৫০ বছরে ১৯ টি হয়েছে এবং গত ৫০ বছরে ৫১ টি হয়েছে ।

এ সকল নদ-নদীতে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। নদী উপকূলবর্তী এলাকার অধিকাংশ লোক মাছের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মাছ ধরে এবং বিক্রি করে তারা তাদের সংসার পরিচালনা করে থাকে। এসকল নদীর তীরবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠেছে হাট-বাজার। এ হাটবাজারে দূর-দূরান্ত থেকে নদীপথে জিনিস পত্র বেচা-কেনা করা হয়। এছাড়া নদী এ অঞ্চলের মানুষের অন্যতম যাতায়াত পথ। মাছ ছাড়াও এসকল খাল বিলে প্রচুর পরিমাণে কাঁকড়া, কুচে ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলো বিক্রি করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। গ্রামের অধিকাংশ লোক এলাকার উৎপাদিত ফসল, জিনিসপত্র নদীপথে শহরের বাজারে বিক্রি করে থাকে। মোট কথা, নদী এলাকার মানুষের জীবন জীবিকায় এ সকল নদ-নদী, খাল-বিল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উল্লেখযোগ্য নদী হলো পশুর নদী, মংলা নদী, পুটিমারী নদী ও খড়মা নদী। এ ছাড়া মংলা উপজেলার সুন্দরবন অংশে রয়েছে শ্যালা, মরা পশুর ও কুঙ্গা নদী।

www.pathagar.com

এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য খালগুলি হলো চিলার খাল, কুমারখালী খাল, কাইনমারী খাল, ব্যাপারী খাল, চড়ক খাল, জালচেরা খাল।

রামপাল উপজেলার প্রধান দুটি নদী হলো মংলা ও পশুর নদী। এ ছাড়া প্রধান প্রধান খাল হলো কুমারখালী, দাউদখালী এবং বগুড়া।

রামপাল উপজেলার হুড়কা ইউনিয়নের হুড়কা গ্রামে অবস্থিত এই ঝলমলিয়া দিঘি। এর জল ঝলমল করত বলে দিঘিটির নাম হয়েছে ঝলমলিয়া দিঘি। গ্রামের সুশান্ত কুমার মণ্ডল (৪৫) বলেন, দিঘিটির বয়স আনুমানিক ৫০০-৬০০ বছর। ১৯৭৪ সালে দিঘিটির কিছু অংশ আবার খনন করা হয়। তখন দিঘির পূর্ব এবং দক্ষিণ পাড়ে দুটি বাঁধানো ঘাট পাওয়া যায় যার ইটের এর সাথে ষাটগুম্বুজ মসজিদের সামঞ্জস্য রয়েছে। ইট বা টালিগুলি তিন ইঞ্চি পুরু এবং এক ফুট দৈর্ঘ্য এবং এক ফুট প্রস্থ।

দিঘিটি মোট আট একর জমির উপর অবস্থিত। এর মধ্যে চার একর জলায়তন।

অনেক দূর থেকে লোকজন এই দিঘির পানি পান করার জন্য নিয়ে যায়। সুমিষ্ট এই দিঘির পানি খেলে সব রোগ সেরে যায় বলে লোকজনের ধারণা রয়েছে। এই পার্শ্ববর্তী মংলা উপজেলা এবং দাকোপ উপজেলার লোকজন আসে এই দিঘির পানি নেয়ার জন্য। সাধারণত নৌকা, ভ্যানে করে সবাই পানি নেয়। স্থানীয়রা কলসি করে পানি নেয়। পানি তোলার জন্য উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকে পাকা ঘাট রয়েছে। অনেকে রোগ নিরাময়ের জন্য পুকুর থেকে বোতলে করে পানি নিয়ে যায়। অনেক শ্রমজীবী মানুষ এখান থেকে ড্রামে করে পানি নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে। রামপাল, মংলা এবং দাকোপ উপজেলার সমুদ্রগামী (বঙ্গোপসাগর) মৎস্যজীবীরা তাদের নৌকায় এই দিঘির পানি নিয়ে যায়।

দিঘির পাড়ে ২০০ বছরের পুরোনো কিছু গাছ রয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিকে ১টি গাব গাছ, দুটি পূণ্যনাশা গাছ, উত্তর পশ্চিম কোনো আরো একটি পূণ্যনাসা গাছ রয়েছে। পাকিস্তান সময়ের কিছু পুরোনো গাছ রয়েছে এই দিঘির পাড়ে। উত্তরপাড় ঘাটের দু পাশে দুটি বড় বটগাছ। পূর্ব পাড়ে একটি বটগাছ এবং দক্ষিণ-পূর্ব পাড়ে একটি বড় বট গাছ রয়েছে। দিঘির পাগুলি দীর্ঘদিন ধরে হুড়কা ইউনিয়নবাসীর মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এখানে। দিঘির পাড়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন-বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন এখানে মানত করতে আসে । এছাড়া পূজা পার্বণের সময়েও লোকজন মানত করে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। দূর্গাপূজার প্রত্যেক দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আরতি বন্দনা হয়। শেষদিন স্থানীয় বাসিন্দারা যাত্রা গান করে । এছাড়া কবিগানও অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামল সরকার নামে একজন ছড়াগানের চারণ কবি রয়েছেন। এছাড়া মংলা থেকে মীরা রানী, ভাগা থেকে শংকর সরকারও এখানে কবিগান পরিবেশন করে থাকেন।

পশ্চিমপাড়ে কালিমন্দিরে শ্যামা পূজা হয়। শ্যামা পূজায়ও কবিগান হয়। মন্দিরে বালক ব্রহ্মচারীর জন্মদিনও পালন হয়। রাসমেলার সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়। সবই হয় এই দিঘিকে ঘিরে। ২৩-২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি বছর সনাতন মেলা হয়। সনাতন বিশ্বাস নামে চারুকলার একজন মেধাবী ছাত্র ২০০২ সালের ২৪ ডিসেম্বর মারা যায়। তারই নামে সনাতন মেলা। সনাতন বিশ্বাস এর বাড়ি ঝলমলিয়া দীঘির উত্তর পূর্বকোণে। মেলায় ঢাকা থেকে তার চারুকলার বন্ধুরা

www.pathagar.com

আসে এবং তাদের উদ্যোগে, পরিবার এবং স্থানীয়দের প্রতিযোগিতায় তিনদিনের সনাতন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন স্মরণ র‍্যালী, বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিকালে স্মরণ সভা, রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় দিন স্থাপনা শিল্পের প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তৃতীয় দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা, মাতুয়া সংগীত পরিবেশিত হয়। প্রতিদিনই প্রয়াত সনাতন বিশ্বাসের আঁকা পেইন্টিং এর প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদিন সকাল বিকাল ঝলমলিয়া দিঘির পাড়ে কাচা মালের বাজার বসে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সভা সেমিনার লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান লেগে থাকে। প্রতি সপ্তাহে গীতা পাঠ হয়। শিবপূজা হয় তিন দিন ধরে, চৈত্র মাসে দুদিনব্যাপী নামযজ্ঞ হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিন কীর্তন হয়, কবিগান হয়। শ্যামাপূজা হয়। কার্ত্তিক মাসে। রাসমেলা হয় অগ্রহায়ণ মাসে সাত দিনব্যাপী। চড়কপূজা হয় চৈত্র মাসের শেষের দিন। পূর্ব পাড়ে রয়েছে ঝলমলেশ্বরী মন্দির। একটি শহিদ মিনার রয়েছে। পশ্চিম পাড়ে একটি কালীমন্দির রয়েছে। দক্ষিণ এবং পূর্ব পাড়ে দিঘির জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা দোকান বসিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পিকনিক করতেও এখানে লোকজন আসে।

মোরেলগঞ্জ উপজেলায় নদ-নদী, খাল-৫২৬৬ একর।

শরণখোলা উপজেলায় নদী এলাকা ৪.১১৫ একর ০৬ বর্গ মাইল।

রামপাল ও মংলা উপজেলার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কুমোর খালী নদী। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানি গানবোটগুলোর অবাধ যাতায়াত হয়েছিল এই নদী দিয়েই। ১৯৮০ সালের পর থেকে নদী তার যৌবন হারাতে থাকে। ২০১৩ সালে নদীটি তার বার্ধক্যে এসে পৌঁছে গেছে। ভাটায় নদীটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, লোকজন হেঁটে এ পার থেকে ওপারে পার হয়ে যায়। জোয়ারের সময় লঞ্চ, কার্গো এবং ট্রলার চলতে পারে না, বালুতে আটকে যায়। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত লোকজন নদীটি বাঁচানোর জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি করে আসছে।

এই কুমোর খালী নদীকে ঘিরে রামপালে একসময় জনবসতি গড়ে ওঠেছিল। রাম পাল ও শ্যাম পাল নামের দুই ভাই পাল বংশের রাজাদের কাছ থেকে জমির ইজারা নিয়ে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। রাম ও শ্যাম দুই ভাইয়ের বাড়িটি রামপাল নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে বর্তমানে সেই বাড়ির অস্তিত্ব আর নেই, তবে রাম পালের নাম অনুসারে এলাকার নামকরণ হয়েছে রামপাল। গত মার্চ মাসে রামপাল উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির লোকজন প্রায় ৫ হাজার জনসাধারণকে সাথে নিয়ে কুমোর খালী নদীর মাঝে দাঁড়িয়ে নদী বাঁচানোর জন্য বিশাল এক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় খবরও ছাপা হয় কিন্তু প্রশাসন নীরব। রামপালের জনসাধারণ চিন্তা-ভাবনা করছে নদী খননের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারক লিপি দেয়ার।

দাউদখালী ও বিসনা সেতু : সুন্দরবনের যে অংশটি বাগেরহাট রেঞ্জের মধ্যে পড়েছে সেখানের যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই খারাপ। অধিকাংশ রাস্তা মাটির, দু একটি রাস্তায় ইটের সলিং ও পিচ। এলাকার এই করুণ যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা ২০০০ সালে রামপাল থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত পিচের রাস্তা ও দুটি নদী দাউদখালী ও বিস্‌নার উপর সেতু নির্মানের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন।

www.pathagar.com

দাউদখালী ও বিসনা সেতুর নির্মাণের কাজ শেষ হয় ২০০১ সালে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুটি সেতুই উদ্বোধন করেন ২০০৮ সালে। নদীতে তখন প্রবল স্রোত, লঞ্চ, স্টিমার ও কার্গো জাহাজ অনায়াসে চলাচল করত। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদী দুটো এখন মৃত। শুকনো মৌসুমে দাউদখালী নদীর মাঝ দিয়ে ঘোরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এবং অন্য জেলা থেকে আসা পর্যটক ও অতিথিরা আসেন। আসলে নদী দুটোর অবস্থা এমন ছিল না এবং বর্তমানের এই অবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এলাকার বড় বড় ঘের মালিকগণ। এই ঘের মালিকেরা বাগদা চিংড়ি চাষ করে কোটি কোটি টাকার সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য, সকল সরকারি রেকর্ডের খাল বেঁধে দিয়েছেন। বছরের ৬ মাস যখন নদীর পানি লবন থাকে, তখন তারা জমিতে লবন পানি ঢুকিয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি করেছেন। জমিতে দীর্ঘ সময় লবন পানি আবদ্ধ থাকার কারণে এলাকায় একেবারেই ধান জন্মায় না। মানুষের ভিটায় নারকেল, সুপারিসহ বিভিন্ন ফলের গাছ সমূলে মারা গেছে। শীত মৌসুমে দু একজনের বাড়ির উঠানে সামান্য কিছু সবজি হয় যা নিজেদের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এজন্য এলাকার মানুষেরা বারো মাস দেশের অন্য জেলা থেকে আমদানী করা চাল ডাল, সবজি কিনে খায়। জমির স্থায়ী লবণাক্ততা ও জলবদ্ধতা দূর করার জন্য স্থানীয় জনগণ সরকারের কাছে জোরদার তদ্বির করে চলছেন। রামপাল-মংলা উপজেলা প্রশাসন ও ডিসি অফিস ঘেরাও, জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড ও খুলনা হাদিস পার্কে অনশন ধর্মঘট পালন, বাগেরহাট প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন, স্থানীয় সাংসদ বরাবর স্মারকলিপি পেশ এবং খুলনা মংলা মহাসড়ক অবরোধ করেও সরকারি প্রশাসনের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে না।

২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল মন্ত্রণালয় নদী খনন করার জন্য একটি ড্রেজার পাঠিয়েছিল কিন্তু ৬ মাস যেতে না যেতেই নদীর অবস্থা পূর্বের ন্যায় ভরাট হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সরকারি রেকর্ডের খালগুলো অবমুক্ত করে দিয়ে, জোয়ার ভাটার পানির অবাধ প্রবাহের ফলে নদী তার নাব্যতা ফিরে পাবে, জমিতে ও ধান মাছ অন্যান্য ফসলাদি উৎপাদিত হবে।

ঙ. বনভূমি ও গাছপালা

বাগেরহাট জেলার পূর্বে বলেশ্বর এবং পশ্চিমে পশুর নদী যথাক্রমে পিরোজপুর ও খুলনা জেলা থেকে একে পৃথক করেছে। উত্তরে গোপালগঞ্জ ও দক্ষিণে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর এই সীমারেখায় বেষ্টিত। পূর্বে এটি সুন্দরবনেরই একটি অংশ ছিল বলে এখানে গাছপালার ধরণ উপকূলীয় বনাঞ্চলের মতো। নদীর পাড়ে সারি সারি কেওড়া বন, গোলপাতা, গেওয়া ইত্যাদি। চারদিক জুড়ে সবুজের সমারোহ।

বনজ বৃক্ষ : নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, উপকূলীয় জলবায়ু ও পলিমাটির দ্বারা গঠিত এ অঞ্চল বনজবৃক্ষে সমারোহ। পৌর এলাকায় জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে দীর্ঘ বনাঞ্চল এখানে চোখের নজরে না পড়লেও বসত বাড়ি ও তার আশে পাশে বিভিন্ন ধরনের বনজ বৃক্ষের সমারোহ দেখা যায়। এদের মধ্যে মেহগনি, গেওয়া মেগনিশ,

www.pathagar.com

গোলপাতা, বাঁশ, বেত, বাবলা, পিঠেসড়া, ঘূর্ণিফল, কচা, নিম, শাল, সেগুন, কেড়াই, কদম, সজনে, গামারি, দেবদারু, গুড়া, চম্বল ইত্যাদি।

এসকল বৃক্ষ থেকে জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনীয়তা মেটানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের আসবাবপত্র, ইটের ভাটায় জ্বালানী, ঘর-বাড়ি তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের গোলপাতা থেকেই সারাদেশে গোলপাতার চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। সুন্দরী, মেহগনি, চম্বল এ জাতীয় গাছ থেকে ঘরবাড়ি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে এ কথা সত্য যে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে গিয়ে গাছপালা নিধনের ফলে দিন দিন গাছ পালা কমে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ফলজ বৃক্ষ : ফলজ বৃক্ষের মধ্যে আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, তাল, খেজুর, কলা, পেঁপে, গাব, বেল, সবেদা, কেওড়া, আত্মা, ঢেওয়ো, লিচু, জল পাই, আমলকি, পেয়ারা, করসচা, কেফল,জাম, জামরুল, বরই, তেতুল, কামরাঙা, কদবেল, বাদাম, ডুমকোর এসব ফল এলাকার মানুষের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যান্য স্থানে রপ্তানি করা হয়। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বৈরী আবহাওয়ার দরুণ এবং লবনাক্ত পানির তীব্রতায় ও জলাবদ্ধতায় দক্ষিণাঞ্চলের ফসলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, গাছ মরে যাচ্ছে, নদীর গতি পরিবর্তন হচ্ছে, নদী-নালা শুকিয়ে যাওয়ায় কৃষি ফসল একেবারে নেই বললেই চলে। কিছু কিছু অঞ্চলে সামান্য কিছু ফসল উৎপাদন হলেও পৌর এলাকার অধিকাংশ জমি পতিত হয়ে পড়ছে। সেখানে ঘরবাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরির ফলে ফসলি জমি কমে যাচ্ছে।

ওষধি গাছ : ঔষধি বৃক্ষের মধ্যে অর্জুন, মহাসমুদ্র, ওলটকম্বল, নিম, দাতন, ঘৃত কুমারী, নিশিন্দা, তুলসী, বাশক, ভাটি, জন্মশির লতা, মাসাশসা, আকন্দি লতা, থানকুনি, পাথরকুচি, সটি, বিষ কাটালি, কালোমেঘ। নারিকেল, সুপারী, আম, জাম, সবেদা, পেয়ারা, তাল, সিরিশ, মেহগনি, কড়াই রামপাল উপজেলার প্রধান গাছপালা। বর্তমানে জমিতে লবণ জল ঢুকিয়ে বাগদা চিংড়ি চাষের ফলে এ এলাকায় অধিকাংশ গাছ বিলুপ্তির পথে।

সুন্দরবনের ফলজ, বনজ ও ওষধি
বৃক্ষের নাম ও বর্ণনা

ক্রমিক	ফলজ বৃক্ষ	বনজ বৃক্ষ	ঔষধী বৃক্ষ
০১	কেওড়া	গুন্দরী	বেত
০২	ওড়া	ঈশুর	জার্মান লতা
০৩	গোলপাতা	গরান	গড়া
০৪	কেয়াকাঠাল	বাইন	মহাসমুদ্র
০৫	বাগলো	ক্যাপরা	দাঁতন
০৬	হেতাল	বলা	জিওল

www.pathagar.com

কেওড়া : কেওড়া ফল গাছ সুন্দরবনের অতি পরিচিত ও বহুল জন্মানো একটি কাষ্টল উদ্ভিদ। কেওড়ার পাতা ও ফল অতিশয় টক, যার কারণে সুন্দরবনে অবস্থানরত বাওয়ালীদের কাছে কেওড়ার ফলের চাটনি একটি উৎকৃষ্ট খাবার। কেওড়ার পাতা খেয়ে হরিণ ও বানরেরা জীবন ধারণ করে।

ওড়া : ওড়া সুন্দরবনের একটি পরিচিত ফলজ বৃক্ষের নাম, ওড়ার ফল দিয়ে বর্তমানে উন্নতি মানের সম তৈরি হচ্ছে। ওড়ার ফল ও পাতা হরিণের উৎকৃষ্ট খাবার।
গোলপাতা : গোলপাতার ফল অতি উৎকৃষ্ট মানের শ্বাসযুক্ত ভেষজ ফল। প্রখর রোদ ও দাবদাহের সময় এই ফলের শ্বাস মানুষের শরীরের জন্য অতিব উপকারী।

কেয়া কাঁঠাল : কেয়া কাঠাল সুন্দরবনের অতি পরিচিতি একটি ফলের নাম। কেয়া কাঁঠাল দেখতে অনেকটা কাঁঠালের মতো। আমাশয়ে রোগের জন্য কেয়া কাঁঠালের শ্বাস অতিব উপকারী।

বাগলো : বাগলো একটি লতানো উদ্ভিদ। বাগলো গাছের ফলগুলি দেখতে অনেকটা ছোট পাটকেল মতো। বাগলো ফল শিশুদের খুব প্রিয়।
হেতাল : হেতাল গাছ দেখতে অনেকটা খেজুর গাছের মত, হেতালের ফল পাকলে খেজুরে ফলের মতো খেতে সুস্বাদু লাগে।

সুন্দরী : সুন্দরী গাছকে বলা হয় সুন্দরবনের প্রাণ। সুন্দরী গাছের নামেই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন। সুন্দরী একটি কাষ্ঠল উদ্ভিদ, লম্বায় ৩০ থেকে ৪০ ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকার শতকরা ৭০ ভাগ ট্রলার ও নৌকার তক্তা সুন্দরী গাছের। কাঠটি অতিশয় শক্ত ও লবন পানি সহিষ্ণু হবার কারণে সুন্দরী কাঠের নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ ও আসবাব পত্রের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

পশুর : পশুর কাঠ সুন্দরবনের সবচাইতে দামী কাঠ। ঘরের খুঁটি, ঘরের ডাবা ও খাট-পালঙ্ক তৈরিতে পশুর কাঠের ব্যাপক চাহিদা। পশুর কাঠের সার লোহার মতো কালো হয়ে যায়। একটি পশুর কাঠের খুঁটি ২০০ বৎসরেও নষ্ট হয় না।

গরান : গরান গাছের বাকল দ্বারা রং উৎপাদন করা হয়, যার ফলে শহরের কারখানা গুলোতে গরান গাছের ব্যাপক চাহিদা আছে। গরান কাঠ দ্বারা সবজি ক্ষেতের বেড়া তৈরি করা হয়। তাছাড়া অতি উৎকৃষ্ট মানের জ্বালানী হিসেবে বাজারে ব্যাপক চাহিদা।

বাইন : বাইন গাছ সুন্দরবনের একটি অতি পরিচিতি বৃক্ষ। বাইন কাঠ জ্বালানীর জন্য অতি উৎকৃষ্ট মানের। বাইন গাছের পাতা হরিণের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাবার।

ক্যাপরা : ক্যাপরা কাঠের খুঁটি খুবই উৎকৃষ্ট মানের, বিশেষ করে ঘরের বারান্দার খুঁটির জন্য ক্যাপরা খুবই ব্যবহার উপযোগী।

বলা : জ্বালানী কাঠের জন্য বলা উৎকৃষ্ট। বলা গাছের বাকল দিয়ে উন্নত মানের দাড়ি তৈরি হয়।

বেত : সুন্দর বনের বেত খুবই উন্নত মানের। বেতের তৈরী লাঠি, বেতের তৈরী আসবাবপত্র তৈরিতে সুন্দরবনের বেতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বেত গাছের ফল শিশুদের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার।

www.pathagar.com

জার্মান লতা : জার্মান লতা সুন্দরবনে প্রচুর দেখা যায়। জার্মান লতার পাতা দ্বারা উন্নত ঔষধ তৈরি হয়।

সড়া : সড়া গাছ সুন্দরবনের সর্বত্র দেখা যায় এমন একটি লতানো উদ্ভিদ। সড়া গাছের কাণ্ডের রস থেকে উৎপাদিত রস ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মহাসমুদ্র : মহাসমুদ্র গাছ সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। মহাসমুদ্র গাছের শিকড় বেদেরা ব্যবহার করেন সাপ ধরার কাজে।

দাঁতন : দাঁতন গাছ সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। দাঁতন গাছের শিকড় দিয়ে ঔষধ তৈরি হয়, তাছাড়া দাঁতন গাছের নরম কাণ্ড দিয়ে অনেকে দাঁত পরিষ্কার করেন। **জিওল :** সুন্দরবনে অনেক জিওল গাছ দেখা যায়। সুন্দরবনের জিওল গাছের ছাল দ্বারাপেটে ব্যথার ঔষধ তৈরি করা হয়।

চ. জনবসতির পরিচয়

বাগেরহাট পৌরসভায় অবস্থিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা অংশ আছে, যারা স্থায়ী বাসিন্দা নয়। একটা মৌসুম যখন গ্রামাঞ্চলে কাজ কম থাকে (বর্ষাকাল) তখন ঐ সব গ্রামের মানুষ শহরে আসে জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য। তারা কেউ রিক্সা চালায়, কেউ দিন মজুর খাটে, কেউ মাছ ধরে। আবার যখন শীতকাল আসে, গ্রামে ধান কাটার মৌসুম শুরু হয়, তখন তারা ফিরে যায় গ্রামে আপন নীড়ে। এছাড়া অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী। উপকূলীয় এলাকা হওয়ার সুবিধার্থে বিভিন্ন ফসল ধান, নারকেল, সুপারি, কেনাবেচার কাজও করে একটা শ্রেণি। এছাড়া অল্প কিছু লোক চাকুরীজীবী।

অতিথিপরায়ণতা এ অঞ্চলের মানুষের একটি বড়গুণ। বাড়িতে কোন অতিথি আসলে নিজের সাধ্যমত যথা সম্ভব চেষ্টা করে তার যত্ন আত্তি করে থাকে। নতুন আত্মীয় যেমন : মেয়ে বা ছেলের শ্বশুর বাড়ি থেকে কোন মেহমান যখন বেড়াতে আসে তখন তো আর সাধ্যের দিকে তাকান না গৃহস্থরা, ধার-দেনা করে হলেও আত্মীয় রক্ষা করে থাকেন। এসব যত্নের মধ্যে প্রথমে শরবত, মিষ্টি, সেমাই দিয়ে বরণ করা হয়। যদি শরবত এর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত চিনির সাথে পানি মিশিয়ে দিলেও দেওয়া হবে। এতে নাকি ঐ নতুন আত্মীয় সব সময় মিষ্টি করে কথা বলে। এরপর বাড়ির বড় মোরগ জবাই করা হয়। সিয়েই পিঠা, মাংস, দই এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় খাবার। সিয়েই পিঠা পিতলে তৈরি একটা মেশিনে বানানো হয়। বাজারে যথারীতি সিয়েই পাওয়া গেলেও এখন অনেকে এ মেশিনটি কিনে ঘরেই তা তৈরি করে। মেশিনটিতে আতপ চালের গুড়া সেদ্ধ করে দিয়ে ঘোরালে নুডুলস এর মতো বের হয়, ওগুলো আবার সেদ্ধ করে নিয়ে মাংস দিয়ে মিশিয়ে খেতে হয়। অনেকে কাঠ দিয়ে নিজেরা এই মেশিন তৈরি করে থাকেন। এছাড়া কুলি পিঠা ও পান পিঠা। শীতকালে রসে ভিজানো চিতই পিঠা মেহমানদারীর ক্ষেত্রে জনপ্রিয় খাবার। এছাড়া বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করা। তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনদের জন্য উৎসবের উপহার দেওয়ার প্রচলন আছে।

www.pathagar.com

যারা প্রথম মংলা উপজেলায় এসে সুন্দরবন কেটে বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল নমশুদ্র, কিছু সুন্নী মুসলমান এবং কিছু ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের। বর্তমানে মংলার লোকসংখ্যার ১,৩৭,৯৪৭ জন। এরমধ্যে মহিলা ৪২.৩৭% ও পুরুষ ৫৭.২৭%।

বর্তমানে রামপালের জন সংখ্যা ১,৭৬,২০০ জন। পুরুষ ৯৩,৭৪০ জন এবং মহিলা ৮২,৪৬০ জন। মুসলমান ৭৩.৩১% হিন্দু ২৪.৪২% এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ০.২৭%।

শরণখোলা উপজেলার মোট ৪টি ইউনিয়ন। এর মোট লোকসংখ্যা ১,১২,১০০ জন। মোট পরিবার ১৪,৪১৭টি। শরণখোলার অধিবাসীর মূল পেশা কৃষিকাজ এবং মৎস্য আহরণ ও বিক্রি। এছাড়া মৌয়ালি, বওয়ালি, নৌকা মিস্ত্রীর হিসাবে পেশাজীবী আছে বেশ কিছু জনগোষ্ঠী। বাঁশ দিয়ে চাই (মাছ ধরার যন্ত্র), হাজি (ঝুড়ি), কুলা, পাখার বেড়, এলিপাতার পাটি (সুন্দরবনে জন্মে এক প্রকার বেতী), নল খাগড়ার চাষ প্রভৃতি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে এই উপজেলার বেশ কিছু পরিবার।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

স্থাপত্যের জন্য বাগেরহাটের খ্যাতি দীর্ঘদিনের। খানজাহান আলীর সময় থেকে এখানে বিভিন্ন মসজিদ, মাজার, মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এর স্থাপত্যশৈলী বাগেরহাটে গড়ে ওঠা উন্নত সভ্যতার প্রমাণ বহন করে। এর মধ্যে ষাটগম্বুজ মসজিদ, খানজাহান আলীর মাজার, কোদলা মঠ, জিন্দা পীরের মাজার অন্যতম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

হযরত খানজাহান আলী (র.) ও তাঁর মাজার

হযরত খানজাহান (র.) এর মাজারগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠ করে তাঁর কিছুটা পরিচয়ের সূত্র পাওয়া যায়। শিলালিপিতে তাঁর নাম পরিচয় খানে আযম খানজাহান ও উলুঘ খানহাজান লেখা আছে। শিলালিপিতে আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর মৃত্যু তারিখ ৮৬৩ হিজরি ২৬ জিলহজ্ব বুধবার উল্লেখ আছে। উলুঘ তুর্কি শব্দ এবং তা পারিবারিক উপাধি। এ থেকে ধারণা করা যায় তিনি উলুঘ নামক কোনো এক তুর্কি পরিবারের সন্তান। কোনো কোনো লেখকের মতে তিনি পারস্য আরব দেশ থেকে দিল্লি হয়ে এ দেশে আসেন। তুর্ক-আফগান আমলে সেনাপতির সম্মানিত উপাধি ছিল খানে আযম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন সেনা নায়কও ছিলেন এবং খানে আযম খানজাহান উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছিল। এ মহান সেনা নায়ক ও সাধক তাঁর নিজ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লিখে রেখে যাননি। লোক পরম্পরায় তাঁকে সবাই খানজাহান আলী (রা.) নামেই চিনে এসেছে।

তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও খুব বেশি কিছু জানা যায় না। যতদূর জানা যায় তিনি সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেন এবং তাঁর এক বা একাধিক স্ত্রী ছিল। তবে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্-এর সমসাময়িক এবং সম্ভবত তিনি গৌড়ের সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু

www.pathagar.com

এবং সেনানায়ক ছিলেন। সুলতানের প্রতিনিধিরূপে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বাগেরহাট অঞ্চলে বিশাল জনপদ সৃষ্টি করেন এবং রাজ্য বিস্তার করে শাসন কাজ চালাতে থাকেন। সে জন্যই তিনি এ অঞ্চলের নামকরণ করেন খলিফাত-ই-আবাদ। খানজাহান (রা.) এমন এক মহাপুরুষ ছিলেন যাঁর মহতী গুণাবলীর দ্বারা বাগেরহাটসহ সমগ্র ভাটি অঞ্চল উপকৃত ও ধন্য হয়েছে। কথিত আছে এ মহাপুরুষ মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যশোরের বারোবাজার থেকে শুরু করে সমগ্র ভাটি অঞ্চল জুড়ে ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দিঘি খনন করেছিলেন। মুসলমানদের প্রথম আবাদকৃত এ অঞ্চলে উপাসনার জন্য মসজিদগুলি এবং নোনা পানির দেশ ভাটি অঞ্চলে পানীয় জলের এ দিঘিগুলি আপামর জনগণের কাছে খোদার আশীর্বাদের মতই প্রতিভাত হয়েছিল। আরও কথিত আছে, এ দেশে আগমনের সময় তাঁর সাথে যে ৩৬০জন আউলিয়া এসেছিলেন সম্ভবত তাঁদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ ও ৩৬০টি দিঘি খনন করেছিলেন। প্রথমে শাসকরূপে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে ধর্মচিন্তা ও জনসেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন এক অলৌকিক ক্ষমতাবান মহাপুরুষ। দুঃস্থ মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন বিতরণ, জলকষ্ট নিবারণের জন্য অসংখ্য দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ,হাট-বাজার স্থাপন, মানুষের ধর্মীয় উপাসনার জন্য অপূর্ব স্থাপত্য সুষমামণ্ডিত অগণিত মসজিদ নির্মাণ কালের শত ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে আজও সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার বাণী বহন করে চলেছে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনপদের ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রতিটি ঘরে ঘরে।

খাঞ্জেলী দিঘির উত্তর পাড়ে এক উচ্চ ভূমিতে তাঁর সমাধি সৌধ নির্মিত। সমাধি সৌধটি বর্গাকৃতি, এর আয়তন ৪২ফিট এবং প্রাচীরের উচ্চতা ২৫ফিট, এর ছাদে একটি গম্বুজ আছে। সমাধি সৌধের ভিতর একটি প্রস্তর নির্মিত বেদিতে হযরত খানজাহান (রা.)এর মাজার অবস্থিত। দরগাহ বা সমাধি সৌধের স্থাপত্য শিল্প অনেকটা ষাটগুম্বুজের ন্যায়। শিলালিপিতে মৃত্যু তারিখ, দাফন তারিখ ছাড়াও আল্লাহর নাম, কোরআন শরিফের কয়েকটি সূরা এবং তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে, হাজার হাজার ভক্ত তাঁর রুহানি দোয়া লাভের আশায় মাজার জিয়ারত করতে আসেন। এছাড়া প্রতি বছর ২৫ অগ্রহায়ণ এ মহান সাধকের মাজার প্রাঙ্গণে বার্ষিক ওরশ এবং চৈত্র মাসের প্রথম পূর্ণিমায় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এক বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ ওরশ ও মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর মাজারে সমবেত হন।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

হযরত খানজাহান (রা.) কর্তৃক নির্মিত অপূর্ব কারুকার্য খচিত পাঁচ শতাব্দীরও অধিক কালের পুরাতন বিশালায়তন এ মসজিদটি তাঁর দরগাহ হতে প্রায় দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। স্থাপত্য কৌশলে ও লাল পোড়া মাটির উপর লতাপাতার অলংকরণে মধ্য যুগীয়

www.pathagar.com

স্থাপত্য শিল্পে এ মসজিদ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও ইহা ষাটগম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চতুস্কোনের বুরুজের উপর চারটি গম্বুজসহ এতে মোট ৭৪টি গুম্বুজ আছে এবং মধ্যের সারির বাংলা চালের অনুরূপ ৭টি চৌচালা গম্বুজসহ এতে মোট ৮১টি গম্বুজ আছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এর প্রার্থনা কক্ষের চৌচালা ছাদ ও গম্বুজগুলি ইট ও পাথরের ষাটটি খাম্বার দ্বারা সমর্থিত খিলানের উপর নির্মিত।

জনশ্রুতি আছে যে, হযরত খানজাহান (র.) ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণের জন্য সমুদয় পাথর সুদুর চট্টগ্রাম, মতান্তরে ভারতের উড়িষ্যার রাজমহল থেকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে জলপথে ভাসিয়ে এনেছিলেন। ইমারতটির গঠন বৈচিত্রেও তুঘলক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বিশাল মসজিদের চতুর্দিকে প্রাচীর ৮ফিট চওড়া, এর চার কোনে চারটি মিনার আছে। দক্ষিণ দিকের মিনারের শীর্ষে কুঠিরের নাম রোশনাই কুঠির এবং এ মিনারে উপরে উঠার সিঁড়ি আছে। মসজিদটি ছোট ইট দিয়ে তৈরি, এর দৈর্ঘ্য ১৬০ফিট, প্রস্থ ১০৮ ফিট, উচ্চতা ২২ফিট। মসজিদের সম্মুখ দিকের মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান এবং তার দুই পাশে পাঁচটি করে ছোট খিলান আছে। মসজিদের পশ্চিম দিকে প্রধান মেহরাবের পাশে একটি দরজাসহ মোট ২৬টি দরজা আছে। সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণের জন্য এ ঐতিহাসিক মসজিদ এবং খানজাহান (র) এর মাজারে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। ইউনেস্কো এ মসজিদটি বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সিংগাইর মসজিদ

ষাটগম্বুজ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মধ্যযুগীয় এই মসজিদটি অবস্থিত। এটি একগম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ। মসজিদের (বাইরের দিকের ১১.৮৮ মি.) পলেস্তরা বিহীন দেয়ালগুলো গড়ে ২.১০মি. পুরু। প্রত্যেক কোণে বাইরের দিকে গোলাকারে বর্ধিত একটি করে সংলগ্ন বুরুজ রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে খিলান দরজার সংখ্যা ৩টি। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রতিটিতে খিলান দরজার সংখ্যা ১টি। পূর্ব দেয়ালের মাঝের খিলানটির আকার অন্যগুলোর চেয়ে বড়। ভেতরে পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে দুপাশে দুটি কুলঙ্গীস্থ একটি অবতল মিহরাব আছে। অনুরূপ কুলঙ্গী উত্তর ও দক্ষিণের দরজাগুলোর দুপাশেও আছে। অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য ষাটগম্বুজ মসজিদের অনুরূপ। কেবলমাত্র চার কোণের চারটি সংলগ্ন গোলাকার বরুজ মসজিদের কার্নিস পর্যন্ত ওঠানো।

নয়গম্বুজ মসজিদ

ঠাকুর দিঘি বা খাঞ্জেলী দিঘিরপশ্চিম পাড়ে ১৬.৪৫ মি. ভূমি উপর নির্মিত নয় গম্বুজ মসজিদটি অবস্থিত। এর দেয়ালগুলো ২.৫৯মি. পুরু। মসজিদ অভ্যন্তরে দুসারি পাথরের থাম দিয়ে মোট নয়টি চৌকো খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডের উপর মসজিদের ছাদের নয় গম্বুজ নির্মিত। পশ্চিমের কেবলা দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর একটি করে মোট তিনটি অবতল মিহরাব আছে। এগুলোর টিম্প্যানাম ও স্প্যানাড্রল অংশে পোড়ামাটির কারুকাজ লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

সাবেকডাঙ্গা পুরাকীর্তি

ষাটগম্বুজ মসজিদ থেকে প্রায় ৬ কি. মি. উত্তরে এই পুরাকীর্তিটি অবস্থিত। দক্ষিণমুখী এই পুরাকীর্তিটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত (৭.৮৮ মি. ও৫.১০মি.)। এটি একটি প্রার্থনা কক্ষ। এর ইটের দেয়াল ১.৪৭ মি. পুরু। পুরাকীর্তির কার্নিস ধনুকের ন্যায় বক্র এবং ভিতরের দেয়াল পোড়ামাটির ফুল ও লতা-পাতার অপূর্ব কারুকাজে ভরপুর। স্থাপত্য কৌশল দেখে মনে হয় এটি খানজাহান সময়ের পরবর্তীকালে নির্মিত।

জিন্দাপির মসজিদ

জিন্দাপির মাজার কমপ্লেক্সের উত্তর-পশ্চিম কোনে মধ্যযুগীয় এই মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় (৬ মি. ও ৬ মি.) নির্মিত এটি একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এই মসজিদের চারপাশের চারটি গোলাকার বুরুজ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালগুলো গড়ে ১.৫২মি. পুরু। পূর্ব বাহুতে ৩টি, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে একটি করে খিলান দরজা আছে। সামনের বাহুতে আছে তিনটি মিহরাব। ছাদের অর্ধগোলাকার গম্বুজটি ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। ২০০২ সালে এটিকে প্রত্নতাত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ণ অবয়ব প্রদান করা হয়েছে।

অযোধ্যা মঠ/কোদলা মঠ

পুরাতন বাগেরহাট-রূপসা সড়কে অবস্থিত যাত্রাপুর বাজার হতে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন ভৈরব নদীর পূর্ব তীরে কোদলা গ্রামে অযোধ্যা মঠ অবস্থিত। তলদেশে বর্গাকারে নির্মিত এ মঠের প্রত্যেক বাহু বাহিরের দিকে ২৭ ইঞ্চি দীর্ঘ। ভিতরের প্রকোষ্ঠের মাপ ১০-৫ ইঞ্চি। ইটের তৈরি প্রাচীরগুলি ৮ ফিট ৭ ইঞ্চি প্রশস্ত। মঠে ব্যবহৃত ইটগুলির আয়তন ৬ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি। পালিশ করা লাল ইটগুলি অতি উচ্চমানের। মঠটির উচ্চতা ভূমি হতে প্রায় ৬৪ ফিট ৬ ইঞ্চি। এ মঠের বিশেষ আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর বাইরের অলঙ্করণ। উড়িষ্যা অঞ্চলে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে স্টাইলে মন্দির নির্মাণ পদ্ধতি দেখা যায় তার প্রভাব এ মঠে আছে বলে ধারণা করা হয়।

কবে কার দ্বারা এ মঠ নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। জনশ্রুতি আছে যে, কারো চিতাভস্মের উপর এ মঠ নির্মিত হয়েছিল। প্রবাদ রাজা প্রতাপাদিত্য কর্তৃক তাঁর সভাপণ্ডিত 'অবিলম্ব সরস্বতীর' স্মৃতিস্তম্ভ রূপে মঠটি নির্মিত হয়। পোড়ামাটির অলংকরণে নির্মিত মধ্যযুগীয় এ মন্দিরটি স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাগেরহাট জাদুঘর

পঞ্চদশ শতকে গড়ে ওঠা খলিফাতাবাদ শহরের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের জন্য ১৯৭৩ সালে সরকারের আন্তর্জাতিক আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে সংরক্ষণ ও সংস্কার প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৪ সালে ৫২০ বর্গমিটার এলাকা নিয়ে একটি জাদুঘর নির্মিত হয়। জাদুঘরটি ২০০১

www.pathagar.com

সালের সেপ্টেম্বর মাসে উন্মুক্ত করা হয় এবং যাটগম্বুজ মসজিদ প্রত্নস্থল ও জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য প্রবেশমূল্য দেশি দর্শকদের জন্য ১০.০০(দশ) টাকা এবং বিদেশি দর্শকদের জন্য একশত টাকা ধার্য করা আছে।

শ্রী শ্রী -রাম কৃষ্ণ আশ্রম

বিবেকানন্দের সুমহান মানব–সেবাব্রত প্রচারের উদ্দেশে বাগেরহাট পৌর এলাকায় আজ হতে আটষট্টি বছর পূর্বে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর–এই ব্রতে এই আশ্রম কর্তৃক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যথা- ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে 'ত্রাণ' কাজ পরিচালনা হয়ে আসছে।

বৈশিষ্ট্য : প্রাচীন ভারতে সন্ন্যাস ও সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তার গুরুর প্রেরণায় মিশনের মাধ্যমে দুয়ের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। এই প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী সংঘের সদস্য হিসেবে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয় গ্রহীদেরও। রামকৃষ্ণ মিশন নিছক কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, মূলত এটি একটি আন্দোলন যার লক্ষ্য নতুন সমাজ ও দেশ গঠন। এটি দৃশ্যত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান হলেও এর মূল চরিত্র আধ্যাত্মিক যা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে। সেই দায়বদ্ধতারই অঙ্গ হল সমাজসেবা। তবে এর মূলনীতি অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন। বাগেরহাট শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন বাগেরহাট কড়াপাড়ার তৎকালীন জমিদার বংশের অন্যতম সন্তান স্বর্গীয় সুধীর কুমার রায় চৌধুরী (সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী জ্ঞানাত্মনন্দজী)। তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় ঋষি কামাখ্যাচরণনাগ এবং আরো অনেকে। আশ্রমে প্রতিষ্ঠাকাল হতে এই আশ্রম নানাবিধ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনহিতকর কাজ করে আসছে বাগেরহাট জেলার দশানী গ্রামের স্বর্গীয় সুশীল কুমার দে তাঁর সম্পতির কিছু অংশ দশানী যদুনাথ ইনস্টিটিউশনকে, সরুই বুর মসজিদকে এবং অবশিষ্টাংশ এই আশ্রমকে দান করে যান। তাঁর সম্পতির আয় হতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আশ্রমে ১টি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার নির্মিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থাগারে সকল প্রকার ধর্মীয় পুস্তক এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রির জন্য পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষিত আছে। পুস্তকের সংখ্যা মোট ৩২৩৫টি। ১৯৭২ সাল হতে আশ্রম কর্তৃক এ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা বিভাগের মাধ্যমে মানুষের চিকিৎসা করা হচ্ছে। বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমের আয়ের উৎস হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের কায়িক, মানসিক ও আর্থিক সহানুভূতি। স্বর্গীয় বিনোদবিহারী সেনের পত্নী শ্রীমতি ঝর্না রানী সেন এবং তাদের ভাগ্নে গোবিন্দ চন্দ্র দাসের অর্থানুকূল্যে স্বামী প্রেমানন্দ ভবন নির্মিত হয়েছে। গত ২০০১ সালের ২৭ মার্চ এ ভবনের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ উদ্বোধন করেন। আশ্রম সীমানার মধ্য ৬টি পুকুর রয়েছে, ১টি ছাত্রাবাস আছে ও সারিবদ্ধ সাজানো নারিকেল ও

www.pathagar.com

সুপারি গাছ রয়েছে। দেখলে মনে হয় বিধাতা নিজেই সাজিয়ে রেখেছেন আশ্রম সীমানা। ডানদিকের গা ঘেঁষে রামকৃষ্ণ সরোবর, দিঘির টলটলে জল। এ যেন আকাশ গঙ্গার মিতালি।

প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এখানে চাঁদপাই গ্রামের পির মেছেরশাহ্ মাজারে, মেলা বসে।

হুড়কা ইউনিয়নের গাজী খালী গ্রামে জমিদার ঊষা রানীর বাড়ি। চাকশ্রী বাজারে অবস্থিত নেট দুর্গ, রাজা প্রতাপাদিত্য নির্মাণ করেন। কালেখারবেড় দিঘি, রাজনগর ইউনিয়ন, ঝলমলিয়া দিঘি, দিঘি দুটি খানজাহান আলির সময় খনন করা।

এছাড়াও বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। সেগুলো হলো- মোরেল সাহেবের কুঠিবাড়ি, মোরেল স্মৃতিস্তম্ভ, বনগ্রাম রাজবাড়ি, বীর ও রহিমুল্লার বাড়ি (বড় বাড়ি)।

জ. বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

একুশের চারণ কবি শেখ সামছুদ্দিন

চারণ কবি সামছুদ্দিন আহমদের জন্ম বাগেরহাটের ফতেপুরে। তিনি ভাষা আন্দোলনের শহিদদের নিয়ে গান লিখে নিজে সুর করে নিজেই গেয়ে একুশের চারণ কবি হিসেবে অমর হয়ে আছেন। তাঁর বিখ্যাত গানটি হলো :

ওরে ও বাঙালি
রাষ্ট্রভাষা আন্দালন করিলি রে বাঙালি।
ঢাকার শহর রক্তে ভাসালি।

ওরে ভাইরে
তোতা পাখির বুলির লাইগ্যা খোয়ালি পরাণ
মায়ে সে জানে পুতের বেদন যার কলিজার জান ॥
ও ভাইরে
ইংরেজ যুগে হাঁটুর নিচে চালাইতো গুলি
স্বাধীন দ্যাশে ভাইয়ে ভাইয়ের উড়ায় মাথার খুলি ॥

তাঁর এই গানটি সম্পর্কে কবি আবুবকর সিদ্দিকের মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, "ভাষা আন্দোলনের অরুন্তুদ যন্ত্রণা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানের মধ্য দিয়ে যেমন একদিকে নগরবাসী মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে। তেমনি অন্যদিকে সামছু কবির ঐ গানটি সে ট্র্যাজেডির হাহাকারকে মূর্ত করে পৌঁছে দেয় গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া দেহাতী জনগণের কাছে।" ('একুশের চারণ কবি শেখ সামছুদ্দিন', স্মরণে মুখশ্রী, সাকী পাবলিশিং ক্লাব, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১১০১।)

আবুবকর সিদ্দিকের লেখা সূত্রে সামছুদ্দিন কবি সম্পর্কে জানা যায়, তিনি সংসার জীবনে ছিলেন অভাবী। তিনি কয়েকটি হাটে সপ্তাহে সপ্তাহে তেল বেচতেন। 'খুচরা দোকানদার' বলা যায়। তাঁর বাড়িতেও 'যেনতেন' একটি দোকান ছিল।

www.pathagar.com

অভাবী সংসার হলেও বাড়িতে ছিল তাঁর একটি হারমোনিয়াম। আড়বাঁশিও বাজাতেন। 'মানুষ পাগল হয়ে যেতো তাঁর গানে ও বাঁশিতে।'

স্বল্প বিদ্যার অধিকারী এই স্বভাব কবি ছিলেন রাজনীতি ও সমাজসচেতন। কবি আবুবকর সিদ্দিক একই লেখায় যথার্থই বলেছেন, "সচেতন প্রত্যাশা নিয়েই যৌবনে সামছুদ্দিন পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন কিন্তু সমাজের একজন দরিদ্র মেহনতী মানুষ হিসেবে তিনি পাকিস্তানের মধ্যে তাঁর সে আশা পূর্ণ হতে দেখতে পাননি। আগে থেকেই পূজীভূত হয়েছিল। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন রোধের অঙ্গারে বায়ুর ঘূর্ণীকাণ্ড ঘটায়। যার পরিণামে দু বছর পরে একুশ দফার দাবীতে চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সভা সমিতিতেও সামছু কবিকে দেখি চারণ কবির মত নিজের বাঁধা গান গেয়ে মজলুম জনতাকে মাতিয়ে তুলছে।"

১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে 'মোদের গরব মোদের আশা' শিরোনামে যে ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে তাতে সামছু কবির 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি' গানটিও সংকলিত হয়েছে। তথ্যগত ভুলের কারণে গানের সুরকার হিসেবে শহিদ আলতাফ মাহমুদের নাম ছাপা হয়েছে। গানটির গীতিকার, সুরকার ও আদিগায়ক কবি সামছুদ্দিন আহমদ। চরম দারিদ্র্য ও অসহায়তার মধ্য দিয়েই তার মৃত্যু হয়।

নীলিমা ইব্রাহিম

শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী এবং মাতা কুসুমকুমারী দেবী।

নীলিমা ইব্রাহিম বরাবরই একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি খুলনা কোরোনেশন বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৫), কলকাতা ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন থেকে আইএ (১৯৩৭) এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বিএবিটি (১৯৩৯) পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা বিষয়ে এমএ (১৯৪৩) পাস করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম 'বিহারীলাল মিত্র গবেষণা' বৃত্তি লাভ করেন। একই বছর তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। দীর্ঘকাল পরে ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক। একই বছর তিনি আলিয়ঁস ফ্রঁসেস থেকে ইন্টারমিডিয়েট ইন ফ্রেঞ্চে ডিপ্লোমা লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে নীলিমা ইব্রাহিম কলকাতার লরেটো হাউসে লেকচারার (১৯৪৩-৪৪) হিসেবে চাকরি করেন। তারপর দুবছর (১৯৪৪-৪৫) তিনি ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের লেকচারার ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৭২ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান (১৯৭১-৭৫), বাংলা একাডেমির অবৈতনিক মহাপরিচালক

www.pathagar.com

(১৯৭৪-৭৫) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ (১৯৭১-৭৭)-এর দায়িত্বও পালন করেন।

নীলিমা ইব্রাহিম

নীলিমা ইব্রাহিম বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজকল্যাণ ও নারী উন্নয়ন সংস্থা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমির ফেলো এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, বাংলাদেশ রেড ক্রস সমিতি ও বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী এবং কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বোর্ড অফ গভর্নরসের চেয়ারপার্সন হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল এলায়েন্স অফ উইমেনের সভানেত্রী এবং এসোসিয়েটেড কান্ট্রি উইমেন অফ দি ওয়ার্ল্ড-এর সাউথ ও সেন্ট্রাল এশিয়ার এরিয়া প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি বার্লিন মিউনিখ ও ফ্রাংফুটে অনুষ্ঠিত 'আন্তার্জাতিক বিশ্ব সমবায় সন্মেলন'-এ পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৭৩-এ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক ওয়ান এশিয় সম্মেলন'-এ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৪-এ তিনি মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'বিশ্বশান্তি কংগ্রেস' হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বনারী বর্ষ' এবং ১৯৭৫-এ মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্বনারী সম্মেলন'-এ যোগ দেন।

নীলিমা ইব্রাহিম বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তার রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : গবেষণা শরৎ-প্রতিভা (১৯৬০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক (১৯৬৪), বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা (১৯৭২), বেগম রোকেয়া (১৯৭৪), বাঙ্গালীমানস ও বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্য (১৯৮৭), সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ (১৯৯১); ছোটগল্প : রমনা পার্কে (১৯৬৪); উপন্যাস বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮), কেয়াবন সঞ্চারিনী (১৯৬২), বহ্নিবলয় (১৯৮৫) নাটক দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদ জ্বলা বিকেল (১৯৭৪), সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪); কথানাট্য আমি বীরাঙ্গনা বলছি (২য় খণ্ড-১৯৯৬-৯৭); অনুবাদ এলিনর রুজভেল্ট (১৯৫৫), কথাশিল্পী জেমস ফেনিমোর কুপার (১৯৬৮) বস্টনের পথে (১৯৬৯) ভ্রমণকাহিনী শাহী এলাকার পথে পথে (১৯৬৩) আত্মজীবনী বিন্দু-বিসর্গ (১৯৯১) ইত্যাদি।

নীলিমা ইব্রাহিম আমৃত্যু মানুষের শুভ ও কল্যাণী চেতনায় আস্থাশীল ছিলেন। মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও উদার মানবিকতাবোধই ছিল তার জীবনদর্শন। তিনি সর্বংসহা ধরিত্রীকে স্বর্গের চেয়েও সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত মনে করতেন এবং অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন দেবত্বের চেয়ে মানবত্বে।

নীলিমা ইব্রাহিম সমাজকর্ম ও সাহিত্যে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য বহু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। সেগুলো হলো : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয়বাংলা পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৭), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্মৃতিপদক (১৯৯০), বেগম রোকেয়া পুরস্কার (১৯৯৬), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৯৭), শেরেবাংলা পুরস্কার (১৯৯৭), থিয়েটার সম্মাননা পদক (১৯৯৮), ও একুশে পদক (২০০০)। ২০০২ সালের ১৮ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

শেখ আব্দুল আজিজ

বাগেরহাটের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা শেখ আব্দুল আজিজ। তাঁর গ্রামের বাড়ি মোরেলগঞ্জ তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহচর ছিলেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হলে তিনি খুলনার প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। তিনিই খুলনা ও বাগেরহাটে আওয়ামী লীগ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আওয়ামী লীগের বৃহত্তর খুলনা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪, ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে কৃষি ও যোগাযোগমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

আবুবকর সিদ্দিক

কবি আবু বকর সিদ্দিক রোববার বাংলা ২ ভাদ্র ১৩৪১, ইংরেজি ১৯ আগস্ট ১৯৩৪, বাগেরহাট জেলার, বৈট্‌পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন।

কবি আবুবকর সিদ্দিক ১৯৫৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত চাখার ফজলুল হক কলেজ, বাগেরহাট পি. সি. কলেজ, দৌলতপুর বি. এল. কলেজ. ফকিরহাট কলেজ, কুষ্টিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া গার্লস কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুইন্‌স্‌ ইউনিভার্সিটি, ও নটরডেম কলেজ বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

www.pathagar.com

কবি আবুবকর সিদ্দিক

আবু বকর সিদ্দিকের অনেকগুলো প্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে— কবিতা : ধবল দুধের স্বরগ্রাম, বিনিদ্র কালের ভেলা, হে লোকসভ্যতা, মানুষ তোমার বিক্ষত দিন, হেমন্তের সোনালতা, নিজস্ব এই মাতৃভাষায় ইত্যাদি। ছড়া : হট্টমেলা। উপন্যাস : জলরাক্ষস, খরাদাহ, একাত্তরের হৃদয়ভস্ম, বারুদপোড়া প্রহর। গল্প : ভূমিহীন দেশ, চরবিনাশকাল, মরে বাঁচার স্বাধীনতা, কুয়ো থেকে বেরিয়ে, শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদি। প্রবন্ধ : রমেশচন্দ্র সেন, সাহিত্যের সঙ্গপ্রসঙ্গ, কালের কলস্বর। স্মৃতিকথা : সাতদিনের সুলতান।

আবুবকর সিদ্দিক বিভিন্ন সময়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, বাংলাদেশ কথাশিল্পীসংসদ পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ স্বর্ণপদক, জসীম উদ্‌দীন স্বর্ণপদক, আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, মুকুন্দদাস-আলতাফ মাহমুদ সম্মাননা পদক ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৯৩৯ সালে কালকাতার পার্ক সার্কাসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত কামারগাতি গ্রামে। তাঁর পিতা আযীমউদ্দিন আহমদ, মাতা করিমুন্নেসা এবং স্ত্রী রওশনারা সায়ীদ। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে পিতার অসামান্য সাফল্য ও জনপ্রিয়তা শৈশবেই তাঁকে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট করে। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পাবনা জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৫৫), প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট

(১৯৫৭), থেকে উচ্চাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতক, (১৯৬০) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় (১৯৬১) স্নাতকোত্তর পাস করেন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

পেশা : অধ্যাপনা। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ঢাকা কলেজ; সম্পাদনা করেছেন, কণ্ঠস্বর (১৯৬৪-১৯৮৩)। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। অধ্যাপক আবু সায়ীদের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়।

উল্লেখযোগ্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে–

কবিতা : মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ (১৯৮৮)। ছোটগল্প : রোদনরূপসী (১৯৯৬)। নাটক : যুদ্ধযাত্রা (১৯৯৭)। প্রবন্ধ-গবেষণা : দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৭৬) উত্তর প্রজন্ম (১৯৯২); বন্ধ দরোজায় ধাক্কা (২০০০) স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ ও রচনা (২০০১); নিউইর্কের আড্ডায় (২০০১)। স্মৃতিকথা : নিস্ফলা মাঠের কৃষক (১৯৯৯); ভালোবাসার সাম্পান (২০০২); সাক্ষাৎকার : মুখোমুখি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (২০০১)। বক্তৃতা সংকলন : রসট্রাম থেকে (২০০০)। অনুবাদ : দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (১৯৬৯); শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস (১৯৮২); জার্নাল : বিশ্রস্ত জার্নাল (১৯৯৩); আমার অনুভূতিতে বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র (১৯৯৭); তিনি বহু পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন।

তিনি জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (১৯৭৭); মাহবুবুল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার (১৯৯৭); রোটারী গিড পুরস্কার (১৯৯৯); বাংলাদেশ বুক ক্লাব পুরস্কার (২০০০); এম. এ. হক ফাউণ্ডেশণ স্বর্ণপদক (২০০১); র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার (২০০৪); একুশে পদক (২০০৫) ইত্যাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ রফিক

মোহাম্মদ রফিক ষাটের দশকের অন্যতম কবি এবং শিক্ষক। তিনি একজন মননশীল আধুনিক কবি হিসেবে পরিগণিত। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে ছাত্র-আন্দোলন ও কবিতায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কাব্যিক রসদ জুগিয়ে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন।

কবি মোহাম্মদ রফিক

কবি মোহাম্মদ রফিকের জন্ম ১৯৪৩ সালের ২৩ অক্টোবর বাগেরহাট জেলার বৈটপুরে। পিতার নাম সামছুদ্দীন আহমদ এবং মাতার নাম রেশাতুন নাহার। বাগেরহাটে তাঁর শৈশব কাটে। এস.এস.সি পাস করে ঢাকার নটরডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু পরে ঢাকা কলেজে মানবিক বিভাগে চলে যান। বি.এ. পাশ করার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এম.এ. শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে তিনি এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

কবি মোহাম্মদ রফিক ১৯৬০-এর দশকের প্রারম্ভে সমকাল, কণ্ঠস্বর, স্বাক্ষর, অচিরা ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকারে মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন।

এ সময় তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে যুক্ত হন। পাকিস্তানের সামরিক আদালত তাঁকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়, কিন্তু এম.এ. পরীক্ষার জন্য তিনি ছাড়া পান। ১৯৭১ সালে তিনি প্রথমে মুক্তিযুদ্ধের ১নং সেক্টরের কর্মকর্তা হিসেবে এবং পরে স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করার পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। তিনি ২৯ জুন ২০০৯ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে—কাব্যগ্রন্থ: বৈশাখী পূর্ণিমা (১৯৭০), ধুলোর সংসারে এই মাটি (১৯৭৬,) কীর্তিনাশা (১৯৭৯), খোলা কবিতা (১৯৮৩), গাওদিয়া (১৯৮৬), স্বদেশী নিশ্বাস তুমিময় (১৯৮৮), মেঘে ও কাদায় (১৯৯১), নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৩), রূপকথা কিংবদন্তী (১৯৯৮), মাতিকিসকু (২০০০), নির্বাচিত কবিতা (২০০৩), বিষখালী সন্ধ্যা (২০০৩), নির্বাচিত কবিতা (২০০৭), নোনাঝাউ (২০০৮), দোমাটির মুখ (২০০৯), ত্রয়ী (২০০৯), মোহাম্মদ রফিক রচনাবলী ১ (২০০৯, ঐতিহ্য), মোহাম্মদ রফিক রচনাবলী ২ (২০১০, ঐতিহ্য)।

গদ্য : আত্মরক্ষার প্রতিবেদ (২০০১), স্মৃতি বিস্মৃতির অন্তরাল (২০০২), ভালবাসার জীবনানন্দ (২০০৩), দূরের দেশ নয় আয়ওয়া (২০০৩), খুচরো গদ্য ছেঁড়া কথা (২০০৭), গল্প সংগ্রহ (২০১০)। রচনা সমগ্র : মোহাম্মদ রফিকের রচনাবলী, ১ম খণ্ড (২০০৭)।

পুরস্কার : ১৯৮১ সালে আলাওল পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০১০ সালে একুশে পদকসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন কবি মোহাম্মদ রফিক।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল জেলার রেডক্রস হাসপাতালে জন্ম গ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার মংলায়। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ঢাকা ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল থেকে ১৯৭৪-এ এস.এস.সি এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৭৬-এ এইচ.এস.সি পাস করেন।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্স ক্লাসে ভর্তি। ১৯৮০-তে বি.এ. অনার্স (বাংলা) ও ১৯৮৩-তে এম.এ. (বাংলা) ডিগ্রি লাভ করেন।

www.pathagar.com

'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' ও 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি 'জাতীয় কবিতা পরিষদের' প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। পঁচাত্তরের পরের সবকটি সরকারবিরোধী ও স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। প্রতিবাদী কবি হিসেবে খ্যাত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণ-আন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত। এছাড়া স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে রুদ্রর কণ্ঠ ছিল উচ্চকিত। কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠে যে ক'জন কবি কবিতাকে শ্রোতৃপ্রিয় করে তোলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ: উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮১), মানুষের মানচিত্র (১৯৮৬), ছোবল (১৯৮৬), গল্প (১৯৮৭), দিয়েছিলে সকল আকাশ (১৯৮৮), মৌলিক মুখোশ (১৯৯০), খুঁটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯১)। 'বিষ বিরিক্ষের বীজ' (১৯৯২) তাঁর একখানি কাব্যনাট্য। গীতিকার হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার লাভ (১৯৮০)।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ১৯৯১ সালের ২১ জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তালুকদার আব্দুল খালেক

তালুকদার আব্দুল খালেক প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী (দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়), প্রাক্তন মেয়র (খুলনা সিটি কর্পরেশন) চারবার এম.পি (রামপাল ও মংলা) তালুকদার আব্দুল খালেক এলাকার স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ। রামপাল উপজেলার মল্লিকেরবেড় ইউনিয়নের মল্লিকেরবেড় গ্রামে তার বাড়ি। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। কুবের চন্দ্র বিশ্বাস, বাঁশতলা ইউনিয়নের সুন্দরপুর গ্রামে বাড়ি। দুবারের বারের নির্বাচিত এম.পি। তিনিও আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। মিসেস্ হাবিবুর নাহার (তালুকদার আব্দুল খালেকের স্ত্রী) ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় এম.পি নির্বাচিত হন।

এছাড়াও এ অঞ্চলের কৃতী সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন :

কাজী আজাহার আলী : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সি.এস.পি, স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা সচিব। জন্ম স্থান : ফকিরহাট।

মো. রুহুল আমীন : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পররাষ্ট্র সচিব।

জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

বিধুভূষণ বসু : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মুখপাত্র। জন্ম স্থান : চিরুলিয়া।

সৈয়দ মোস্তাগাউসুল হক: রাজনীতিবিদ, আইনজীবী। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সদস্য। প্রাদেশিক রাজস্বমন্ত্রী। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

শেখ আব্দুল আজিজ : প্রাক্তন মন্ত্রী। জন্ম স্থান : তেলিগাতি, মোরেলগঞ্জ

মহেন্দ্র নাথ ঘোষ : প্রাক্তন খুলনা জেলাবোর্ড চেয়ারম্যান। জন্ম স্থান : বাগেরহাট

মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরী : জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর

www.pathagar.com

অধ্যাপক রফিক : কবি। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর

শহীদ অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন : গবেষক। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

মুকুন্দ বিহারী মল্লিক : যুক্ত বাংলার অর্থমন্ত্রী। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর

মীর মোশারেফ আলী : ভাষাসৈনিক, অধ্যাপক ও আইনজীবী। জন্ম স্থান : কচুয়া।

এস.এম. মোস্তাফিজুর রহমান : প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী। জন্ম স্থান: রণবিজয়পুর, বাগেরহাট সদর।

ডা.মোজাম্মেল হোসেন : পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

সরদার আনোয়ারুল ইসলাম : ভাষা সৈনিক। জন্ম স্থান : ফকিরহাট।

ড. মোহাম্মদ তারেক : সাবেক অর্থসচিব। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

শেখ আলতাফ আলী : সাবেক স্বাস্থ্য সচিব। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

শেখ মো. ওয়াহিদুজ্জামান : সাবেক পানি সম্পদ সচিব। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

মীর সাখাওয়াত আলী দারু : সাবেক সংসদ সদস্য। জন্ম স্থান : কচুয়া।

শেখ কামরুজ্জামান টুকু : মুজিব বাহিনী প্রধান, খুলনা অঞ্চল। বর্তমান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, বাগেরহাট । জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

অধ্যাপক ড. স্বরোচিষ সরকার : আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক । জন্ম স্থান : চিতলমারী।

কুবের বিশ্বাস : পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য। জন্ম স্থান : রামপাল।

আবুল খায়ের মোল্লা : পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য। জন্ম স্থান : মোল্লারহাট।

শেখ তৈয়েবুর রহমান : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র। জন্ম স্থান : ফকিরহাট।

মো. নাসির হায়দার : অধ্যাপক, সরকারি সুন্দরবন আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা। প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভি। জন্ম স্থান : বাগেরহাট সদর।

মংলা উপজেলার রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মধ্যে জনাব ইদ্রিস আলী ইজেরদার (আওয়ামী লীগ), প্রয়াত জনাব রশিদ মোল্লা (বিএনপি) অন্যতম।

ঝ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মংলা উপজেলায় ৩টি কলেজ রয়েছে : ১. মংলা ডিগ্রি কলেজ (১৯৮২) ২. দিগরাজ ডিগ্রি কলেজ ৩. মংলা বঙ্গবন্ধু মহিলা কলেজ। ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়, হলদিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দিগরাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চালনা বন্দর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টি.এ. ফারুখ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া ৩২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, ১৮টি মাদ্রাসা রয়েছে।

www.pathagar.com

রামপাল উপজেলায় বেসরকারি কলেজ রয়েছে ৩টি : আব্দুল কালাম ডিগ্রী কলেজ (১৯৬৮), রামপাল ডিগ্রী কলেজ (১৯৬৮), সুন্দরবন মহিলা কলেজ (১৯৯৩)। ৩৭ টি মাধ্যমিক স্কুল, ১১টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে, ৬৭টি সরকারী প্রাথমিক স্কুল, ৪৭ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৭টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ১৬টি অন্যান্য মাদ্রাসা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- গিলাতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯২৯), ফয়লারহাট কামাল উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৩৭), পেড়িখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৩৯), ডাকরা বহুমূখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৪০), বর্ণী সায়রাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৫৪) শ্রীফলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯৬১),ফয়লারহাট সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৩৭), ইসলামাবাদ সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৩৯), সোনাতৃনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৪০), গোবিন্দপুর সিনিয়র মাদ্রাসা (১৯৪৩)।

মোরেলগঞ্জ উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩৮টি, বেসরকারি ১৬১টি, কলেজ ১৩টি, মাদ্রাসা ৬৪টি, ভোকেশনাল ৯টি। মসজিদ আছে ৬১৮টি, ও মন্দির ৬৮টি।

শরণখোলা উপজেলায় ১টি ডিগ্রি কলেজ, একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ১টি কারিগরি কলেজ, ৫টি সিনিয়র মাদ্রাসা এবং ৩০টি এবতাদিয়া মাদ্রাসা আছে । ৩৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পরও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদে অধিবেশন অনিবার্য কারণ দেখিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে মুহূর্তে সহিংস হয়ে ওঠে সংগ্রামী বাঙালি। মার্চের শুরু থেকেই বাঙালি মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে। অসহযোগ আন্দোলনের ঐতিহাসিক ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু আন্দোলনরত বাঙালির জন্য দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।” তারপর ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সারাদেশব্যাপী শুরু হয় প্রথমে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং তারপর গেরিলা ও মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলা ছিল ৯ নম্বর সেক্টরের সুন্দরবন সাব-সেক্টরের অধীন। সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে মংলা বন্দরে প্রতিরোধের আর এক সাহসী ঘটনা ঘটে। এতে নেতৃত্ব দেন গাজী জলিল। অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ছিলেন খুলনার বিশিষ্ট ছাত্রনেতা শাহ জামাল। খুলনা শহর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যাওয়ার পর এখানকার স্বাধীনতাকামী যুবকেরা আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের একটা বড় দল চলে যায় রূপসা নদীর ওপারে। পরে তাদের অনেকে বাগেরহাটে চলে যান। বাগেরহাটে ঐ সময় আওয়ামী লীগের একজন নাম করা নেতা ছিলেন গাজী

www.pathagar.com

জলিল। তিনি ঐসময় বাগেরহাট আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিন ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। বিভিন্ন সূত্র থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে বাগেরহাটের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এ সময় সংবাদ পান মংলায় এক জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানো হচ্ছে। এ অস্ত্র আনা হয়েছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশে। গাজী জলিল তা প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে যান। তিনি কিছু সংগ্রামী যুবককে সঙ্গে নিয়ে মংলায় অস্ত্র খালাস প্রতিরোধের জন্য রওনা দেন। যথেষ্ট সংখ্যক অস্ত্র ও সংগৃহীত হয়। কয়েকটি অস্ত্র পূর্ব থেকেই তাঁদের কাছে ছিল। মংলায় পৌছে তাঁরা আরো কিছু অস্ত্র পান। মংলা সেন্ট পলস স্কুলের হেডমাস্টার তাঁদের একটা বন্দুক দেন। স্থানীয় লোকজনদের কাছ থেকেও কয়েকটা লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুক সংগৃহীত হয়। মংলা বন্দরের সশস্ত্র প্রহরীরাও তাঁদের সাথে যোগ দেয়। মংলার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ডা. ইব্রাহিমও এক্ষেত্রে তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেন। মংলা বন্দরের শ্রমিক লীগের বেশকিছু সাহসী সদস্য তাদের সাথে একত্র হন। খবর পেয়ে পশুর নদী থেকে গানবোট এগিয়ে আসে। মুক্তিযোদ্ধারা ফায়ার ওপেন করার সাথে সাথে গানবোট থেকে তাদের উপর ব্যাপক গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা মংলা নদীর দক্ষিণ তীরে মূল শহরের পারে পানির ট্যাংকের নিচে পজিশন নিয়ে গানবোটের আক্রমণযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে যেতে থাকেন। তবে এ অসম যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কোনরকমে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। গানবোটের ভারী অস্ত্রের ব্যাপক শেল বর্ষনের মুখে তারা দুর্বল হয়ে পড়েন। এক ঘণ্টারও অধিককাল সময় ধরে বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করে তারা সেখান থেকে সরে যান।

মংলা বন্দরে পরে আরও একটা প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই এখানে ছাত্র-যুবকদের সমন্বয়ে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। মংলা বন্দরের শ্রমিকেরা তাতে যোগ দেয়ায় এ আন্দোলন এক ভিন্ন মাত্রা অর্জন করে। মংলা বন্দরে এ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গাজী আব্দুল জলিল এক বড় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর চেষ্টায় তখন মংলায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক করা হয়েছিল ইসমাইল হোসেনকে। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেখ শাহজাহান, ডা. সুলতান আহমদ প্রমুখ। এদের উদ্যোগে বেশ কয়েকটা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করে স্বাধীনতাকামী ছাত্র-যুবকদের ট্রেনিং দেয়া হতে থাকে। ২৫শে মার্চের পর খুলনা শহর পাকিস্তানি সেনাদের দখলে চলে গেলেও উপর্যুক্ত নেতারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের নিয়ে মংলা বন্দরকে মুক্ত রাখার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এখানকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য বেশকিছু উদ্যোগও নেয়া হয়। কিছু কিছু অস্ত্রও সংগৃহীত হয়। রামপাল থানা ও মংলা ফাঁড়ি থেকে বেশকয়েকটা রাইফেল পাওয়া যায়। পুলিশেরা তা স্বেচ্ছায় প্রদান করে। এ সময় স্থানীয় সংগ্রামীদের উদ্যোগে লোহার পাইপ দিয়ে তিনটি কামান তৈরি করা হয়। যে ৩/4 জন যুবক এ কামান তৈরিতে অংশ নেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল নারায়ণ হালদার। চিলা নামক স্থানে নিয়ে এ কামানের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। শব্দ এবং গোলা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকেও কয়েক বাক্স গোলাবারুদ নামানো হয়। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে নিউজপ্রিন্ট মিলের কাঠ সংগ্রহ কেন্দ্রে কাঠের তৈরি একটা কামান

www.pathagar.com

ছিল। এটা দেখতে ছিল একবারে অবিকল ঢাকার গুলিস্তানের কামানের মতো। যুদ্ধ প্রস্তুতির একটা চিহ্ন হিসেবে সে কামানটি এনে একটা ষ্টিল বডি কার্গোতে সেট করে নদীতে প্রদর্শনের জন্য ১নং জেটিতে রাখা হয়। এটা ছিল স্রেফ একটা প্রতীকী ব্যাপার। তবুও তা জনগণের মধ্যে খুবই উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এপ্রিলের মাঝামাঝিতে মংলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আসার আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতাকামী স্থানীয় মানুষ যৎসামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাহসের সঙ্গে তাদের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ প্রতিরক্ষা অপারেশনের নেতৃত্ব দুজনের ওপর অর্পিত হয়। এরা হলেন রাজ্জাক সরদার এবং সাজ্জাদ হোসেন। তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে ইপিআর ও সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য। তাঁরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় ছাত্র-যুবক শ্রমিকদের নিয়ে মংলাকে মুক্ত রাখার সংগ্রামে অগ্রসর হন। মংলা নদীর তীরের কাঠের জেটিগুলি ভেঙে ফেলা হয়। নদীর তীর বরাবর বিভিন্ন স্থানে ট্রেঞ্চ খনন করে যোদ্ধারা পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এর দুই/তিন দিনের মধ্যেই অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই পাক অভিযান শুরু হয়ে যায়।

প্রথম দিন দুটো গানবোট মংলা নদীতে প্রবেশ করে। মংলার সর্বত্র তখন পত পত করে ওড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। গানবোট থেকে হ্যান্ডমাইকে ঐ পতাকা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধকারী কেউ থাকলে তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। স্থানীয় কিছু পুলিশ অতি উৎসাহী হয়ে তাদের রিসিভ করার জন্য অগ্রসর হলে গানবোট থেকে তাদের ওপর শেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে বেশ কয়েকজন পুলিশ নিহত হয় বলে জানা যায়। তবে গুলির আওতার মধ্যে না আসায় ঐ দিন ট্রেঞ্চে অবস্থানকারী যোদ্ধারা গুলি নিক্ষেপ থেকে বিরত থাক।

পরের দিনও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। ঐ দিন দুটি গানবোট মংলা নদীতে প্রবেশ করে তীরের অতি কাছাকাছি চলে আসে। তখন গর্জে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র। পাকিস্তানি সেনারাও গানবোট থেকে তাদের উপর শেল নিক্ষেপ শুরু করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণে গানবোটের কয়েকজন গানার নিহত হয় বলে জানা যায়। এ বাধা পেয়ে গানবোট দ্বয় পিছিয়ে পশুর নদীতে চলে যায়। এর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সংবাদ পেয়ে পাকনৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ পি এন এস জাহাঙ্গীর চলে আসে। তারা পশুর নদীর মাঝে অবস্থান নিয়ে মংলা বন্দরের উপর প্রচণ্ডভাবে শেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এত মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বল প্রতিরক্ষাব্যূহ গুড়িয়ে যায়। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে চলে যেতে থাকে। জলিল গাজী কয়েকজন সঙ্গীসহ হলদিবুনিয়ার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। যাওয়ার সময় তিনি মংলা আউট পোস্টে অবস্থিত অয়ারলেস সেটটা নিয়ে যান।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মংলা অঞ্চলের প্রধান ছিলেন চিলা গ্রামের দিগ্বজয় নাথ। রামপাল উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন আ. জলিল, গাজী জলিল ও কুবের বিশ্বাস। পেড়িখালী ইউনিয়নের ডাকরা গ্রামে গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয় ২ মে ১৯৭১। একটি মন্দিরের ভিতর ৬৫০ লোক মারা যায়। বর্তমানে এখানে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে। রাজনগর ইউনিয়নের কালেখারবেড় গ্রামে পাকসেনাদের সাথে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ হয় ৪ অক্টবর ১৯৭১।

www.pathagar.com

ডাকরা বধ্যভূমির বিষাদময় ঘটনা

২১ মে ১৯৭১ সাল, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। মোরেল গঞ্জ, শরণখোলা, কচুয়া, চিতলমারী, শ্রীরামকারী থেকে নৌকা যোগে হাজার দশেক শরণার্থী ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করার প্রত্যাশায় জড়ো হয়, রামপাল উপজেলার পেড়িখালী ইউনিয়নের ডাকরা হাইস্কুল মাঠে। ডাকরা ঠাকুর বাড়ির নোয়া ঠাকুর শ্রীমণ্ড আচার্য একটি হারিকেন জ্বালিয়ে শরণার্থীদের কাছে আসলেন, নিজের পরিচয় প্রদান করলেন, এবং বললেন এক জায়গায় এত লোক একসঙ্গে থাকাটা নিরাপদ নয়, কারণ চারপাশে আল বদর, রাজাকার বাহিনী। যে কোনো সময় তারা নিরিহ মানুষের উপর আক্রমণ চালাতে পারে। আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, রাত্রে অর্ধেক লোক ঠাকুর বাড়ির ঘর, উঠান ও বাগানে আশ্রয় গ্রহন করবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাজার পাঁচেক লোক আশ্রয় গ্রহণ করলেন ঠাকুর বাড়িতে, বাকি লোকজন ডাকরা স্কুল মাঠে এবং স্কুলের বারান্দায় অবস্থান করলেন। আগত শরণার্থীদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতী মহিলাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়, ক্ষুধার জ্বালায় তারা কাতর, অগত্যা যুবক, যুবতী ও মধ্য বয়স্করা আগুন জ্বালিয়ে হাড়ি পাতিলে রান্নার আয়োজন করলেন। রাত্রে খাবার গ্রহণ শেষে অধিকাংশরাই ঘুমিয়ে পড়লেন, জেগে রইলেন কতিপয় যুবক ও মধ্যবয়স্ক পুরুষ লোকেরা। রাত পার হল কোনো রকম বিপদ ছাড়াই। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর নতুন একটি নৌকার বহর আসল ডাকরায়। বহরটি ছোট হাজার খানেক লোক হবে। নতুন বহরের লোকেরা বললেন, আমরা সারা রাত নৌকা চালিয়ে বরগুনা থেকে এসেছি, রান্না খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি, আমাদের জন্য আপনারা কিছুটা সময় দেন, আমরা দুটো রান্না করি, তারপর খাবারের পর এক সঙ্গে রওনা দেব। আগের দিন আসা বহরগুলোর লোকজন বললেন, সকালে তো আমাদেরও খাওয়া হয়নি, তাহলে আমরাও রান্না করি, খেয়ে এক সঙ্গে রওনা দেওয়া যাবে। মহিলারা রান্না শুরু করল, সকাল ৯.০০ টার দিকে খাওয়া শুরু করল ঠিক এমন সময় খুলনার মওলানা এ.কে.এম ইউছুফ, বাগেরহাটের রজ্জব আলি ফকির ও রামপালের বাঁশতলি ইউনিয়নের হাজি বাড়ির আব্দুস সালামের নেতৃত্বে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন রাজাকার আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খাদ্যরত নিরস্ত্র শরণার্থীদের উপর এলোপাথারি গুলি শুরু করে। শরণার্থীরা হরিণের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে, মহিলারা তাদের কোলের বাচ্চাদের নিয়ে ঝাপ দেয় কুমোর খালী নদীর জলে; কিন্তু রক্ষা পায়নি। সাত হাজার শারণার্থীর মৃত্যু হয় ঠাকুরবাড়ি ও ডাকরা স্কুল মাঠে। রাজাকার ও তাদের সাগরেদরা লাশগুলো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে কুমোর খালী নদীতে ফেলে দেয়। নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে যায়। ভরা জোয়ারের সময় লাশগুলো ভেসে মংলা হয়ে পশুর নদীতে পড়ে। যাদের পশুর নদী হয়ে শিবসা দিয়ে নৌকা যোগে ভারতের যাওয়ার কথা ছিল, তারা লাশ হয়ে জোয়ারের পানিতে ভেসে চললো ভারত মহাসাগরের দিকে। এক মাসের অধিক কাল পর্যন্ত স্থানীয় লোকজন ও জেলেরা নদীর পানি ব্যবহার করতে পারেনি, চারদিকে শুধু লাশের গন্ধ, নদীর পানিতেও মরা মানুষের পঁচা দেহের বীভৎস গন্ধ ছড়ায় অনেক দিন। খুনি রাজাকার আলবদর বাহিনীর অনেক সদস্য এখন আর বেঁচে নেই, খুনি রজ্জব আলী ফকির দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পরে আত্মহত্যা করে, কেরামত গোলদার অন্যের ছুরিকাঘাতে মারা যায়, মৌলানা এ. কে. এম ইউসুফ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে

www.pathagar.com

বিচারাধীন অবস্থায় মারা যায়। আব্দুস সালাম বর্তমানে আওয়ামী লীগের মংলা উপজেলার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, ২০০৮ সালে তিনি মংলা পৌরসভা থেকে মেয়র প্রার্থী হন, কিন্তু সচেতন জনগণ এই ঘৃণ্য রাজাকারকে সমর্থন করেনি, ফলে তার পরাজয় হয়।

২৫ মে ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ জাহাঙ্গীর ও বাবর প্রবেশ করে রামপালে, উদ্দেশ্য রামপালের কুমার খালীর নদী পথ হয়ে সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টের কাছে নোঙ্গর করা। তখন সুন্দরবন এলাকার সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিন মেজর মধুসহ কয়েকজন সহযোদ্ধা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যুদ্ধ জাহাজ দুটিকে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না, দিলে বন্ধুপ্রতিম ভারত থেকে অস্ত্র আসা বন্ধ হয়ে যাবে। জাহাঙ্গীর ও বাবর নামক যুদ্ধ জাহাজ দুটি এসে নোঙ্গর করে মংলা থানার অদূরবর্তী ঢাংমারী নামক স্থানে। বর্তমানে ঢাংমারীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরেস্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছে। মেজর জিয়া তার বাহিনীর সকল সদস্যদের নিয়ে গহীন সুন্দরবনে মিটিং করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন রাত গভীর হলে জাহাজের গায়ে মাইন লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজ দুটিকে ডুবিয়ে দিতে হবে। ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি মাইন স্কোয়াড টিম গঠন করা হল। টিমের দায়িত্ব প্রদান করা হল হুড়কা ইউনিয়নের ভেকটমারী গ্রামের চৌকস মুক্তিযোদ্ধা সরোজ কুমার মণ্ডলকে, সরোজ মণ্ডলের সাথে আরও যে পাঁচজন ছিলেন, তারা হলেন রামপাল উপজেলার ঝনঝনিয়া গ্রামের ইউসুফ, হুড়কা উত্তর পাড়ার ডিয়েল বালা, বাইনতলা ইউনিয়নের ইব্রাহীম, রামপাল সদরের মোজাফ্‌ফর আকবর হোসেন ও ইদ্রিস মল্লিক। সিদ্ধান্ত ছিল মাইন লাগানোর অপারেশনের সময় ঢাংমারী এলাকার পশুর নদীর পশ্চিম পাড় সুন্দরবনের ভিতর থেকে মেজর জিয়া ও মধু একশো চল্লিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে সুন্দরবনের গাছে মেশিনগান বেধে গুলি চালাবেন। ডাব নারিকেল বিক্রেতার বেশ ধারণ করে ছোট একটি ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে সরোজ মণ্ডল রওনা দিলেন, নৌকার গলুইয়ের ভিতর ডাব নারিকেলের গুলির সাথে সাজানো রইল, রাশিয়ার তৈরী জাহাজ বিধ্বংসী মাইন। নৌকাটি ভিড়ল পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ জাহাঙ্গীরের সাথে। ইউসুফ মাইন নিয়ে পানিতে নামলেন এবং জাহাজের বহিরাঙ্গের লোহার পাতে মাইন সেট করল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকট শব্দে জাহাঙ্গীরের তলদেশ ছিদ্র হয়ে গেল। যুদ্ধ জাহাজ দুটি থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণ শুরু হলো, ও দিকে সুন্দরবনের ভিতর থেকে মেজর জিয়া ও মধুর গ্রুপ মেশিনগান দিয়ে কাভারিং গুলি বর্ষণ শুরু করলেন। এই যুদ্ধ চলছিল দুইঘণ্টা, সুন্দরবনের গাছের পাতা, ডাল যুদ্ধ জাহাজ থেকে ছোড়া গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। মেজর জিয়ার গ্রুপের সতের জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ ডুবতে শুরু করেছে কিন্তু যুদ্ধ জাহাজ বাবর থেকে অবিরল ধারায় গুলি চলছে। মাইন বিস্ফোরক দলের ছয় জনের চার জন সাতার কেটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন, পালাতে পারলেন না দু জন সরোজ ও ইউসুফ। মুক্তিযোদ্ধা সরোজ মন্ডলের ডান চোখে গুলি লাগল, আর একটি গুলি সরাসরি ইউসুফের পৃষ্ঠদেশ দিয়ে ভেদ হয়ে বুকের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেশ স্বাধীনের পর সরোজ মণ্ডল এক চোখ অন্ধ অবস্থায় বেঁচে ছিলেন ২০০৩ সাল পর্যন্ত, তারপর তিনি সন্ত্রাসীদের দ্বারা অপহৃত হন, এখনও পর্যন্ত সরোজ মন্ডলের কোন সন্ধান পাওয়া

www.pathagar.com

যায়নি, সরোজ মণ্ডলের মুক্তিযোদ্ধা ভাতা রামপালের সোনালী ব্যাংকে জমা হয়ে চলেছে, তার একমাত্র মেয়ে পিংকি মণ্ডল টাকা তোলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। ইউসুফের লাশ নদীর চরে আটকে ছিল। সহযোদ্ধারা লাশ নিয়ে চলে আসেন পশুর নদীর কোল ঘেষা ইউনিয়ন রাজনগরে। রাজনগর ইউনিয়নের কালেখার বেড় দিঘির পাড়ে মুক্তিযোদ্ধারা ইউসুফের কবর দেন। বর্তমানে কবরটি ইট দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে, রামপালের মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিবছর একবার ইউসুফের কবরে যান এবং ফুল দিয়ে আসেন।

ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মংলা এলাকার স্বনামধন্য চারণ কবি ছিলেন গৌরপদ সরকার। বাড়ি ছিল বর্তমান চাঁদপাই ইউয়িনের কাইনমারী গ্রামে। তার জন্ম ১৯০১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, খুব গরিব ঘরের সন্তান ছিলেন। লেখাপড়া শিখতে পারেননি। ছোট বেলাতে যখন অপরের বাড়িতে রাখাল হিসাবে কৃষাণ খাটতেন তখন থেকেই তার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি ধুয়া পাঁচালি বলতেন। অপরের বাড়িতে কাজ করার ফাঁকে একটু একটু লেখাপড়া শিখতেন আর ধুয়া পাঁচালি বলতেন। বড় হতে লাগলেন আর কবিদের লড়াইয়ের আসরে যোগ দিতেন। পূর্ণানন্দ সরকারকে কবিগান শিক্ষার গুরুরূপে বরণ করলেন। এবং এক সময় এলাকার স্বনামধন্য কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে কবি গান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৬৪ সালে গৌরপদ সরকার ভারতে চলে যান। সেখানেও তিনি কবি গান গেয়ে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে গৌরপদ সরকার ভারতের মাটিতে মৃত্যুবরণ করেন। নিম্নে তার রচিত একটি গান তুলে ধরা হলো :

অসাধনে দিনতো পুরালো রে ,
দয়াল দিনে দিনে।
দিন যে কমে এলো ক্রমে ক্রমে,
কাল ভাটার টানে টানে॥

অপলক নয়নে চাহি, সাঁজের আকাশে।
দেখি পাখিকুল যায় ব্যাকুল হয়ে, যে যাহার দেশে।
আমি কোন দেশে যাব কাহার পাশে,
দয়াল সে দেশ আমি চিনিনে॥

একে তো জীবন নদী ভাঁটায় দিছে টান
দিনে দিনে শুকিয়ে যায় আমার মালঞ্চ বাগান
এখন মনোবন বিহগী তোলে না তান
সে গেছে অভিমানে॥

হাসি-কান্নার খেলা খেলে কতই করলাম ভুল
এখন মরা বাসি ঝরা গাছের ফুল-
দয়াল তোমায় দিব কোন প্রাণে॥

www.pathagar.com

বর্তমান সময়ে মংলা উপজেলার চিলা ইউনিয়নের হলদিবুনিয়া গ্রামের মীরা রাণী কবি গান গেয়ে থাকেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে সারা বছর কবি গান পরিবেশন করে বেড়ান এবং সারা দেশেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

রামপাল উপজেলার বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের মধ্যে রয়েছে :-প্রফেসর মাহমুদুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক জাতিয় জাদুঘর, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউট এর অধ্যাপক। আন্তজার্তিক মানের শিল্পী। বাড়ি রামপাল ইউনিয়নের শ্রীফলতলা গ্রামে।

চারণ কবি প্রয়াত রসিক লাল সরকার, গ্রাম : ভাগা, ইউনিয়ন : রামপাল। বিজয় সরকারের সাথে প্রায়ই কবি গাইতেন। বর্তমানের কবিদের মধ্যে রয়েছেন শংকর সরকার,গ্রাম : ভাগা, ইউনিয়ন : রামপাল। শ্যামল সরকার ও সুকল্যাণ সরকার, গ্রাম:- হুড়কা, ইউনিয়ন : হুড়কা।

মোরেলগঞ্জ উপজেলায় কিছুদিন আগেও হাটে-বাজারে এবং শহরের বিভিন্ন স্থানে সুর করে কবিতা পাঠ করত লোক-কবি। তিনি নিজে ওই কবিতা রচনা করতেন এবং নিজেই সুর করে গানের মতো করে পাঠ করে বিক্রি করতেন। অনেক লোক-কবির এটাই ছিল জীবিকার্জনের প্রধান উপায়। এমনই একজন লোক-কবি মোরেলগঞ্জ উপজেলার মোস্তাফিজ খান। ৬২ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ চমৎকার সুরে কবিতা পাঠ করেন। এ পর্যন্ত মোট ২৫/৩০টি কবিতা তিনি রচনা করেছেন তার মাত্র ২টি প্রকাশিত হয়েছে।

নির্বাচনের প্রচারের উদ্দেশে জনৈক প্রার্থীর পক্ষে প্রথম কবিতা রচনা করেন মোস্তাফিজ। তারপর শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দানের জন্য রচনা। অতপর প্রলয়ংকারী সিডরের তাণ্ডব এবং দুঃখী মানুষের আহাজারী নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন। একবার তিনি ৪৫০/- (চারশো পঞ্চাশ) টাকার কবিতা বিক্রি করেছিলেন কিন্তু তার ছেলে মেয়েরা নিষেধ করলে তিনি কবিতা আর ছাপান না বা বিক্রি করেন না। তবে এলাকার বিভিন্ন প্রোগ্রামের জন্য তার কাছ থেকে কবিতা লিখিয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন মানুষ। তারা এজন্য তাকে কিছু পারিশ্রমিক দেয়। তিনি চমৎকার ভঙ্গিমায়, সুন্দর সুরে এবং তালে কবিতা পাঠ করেন। এখানে তার মোট ৮টি কবিতার পাণ্ডুলিপি সংযোজিত হলো। এছাড়া তার ৪টি পদ্য সংযোজন করলাম। পদ্যগুলিও সুর করে গাওয়া যায়।

২৫ বছর বয়সী জন্মান্ধ সোহেল গত ১০ বছর যাবৎ লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে জীবিকার্জন করছেন। খাউলিয়া গ্রামের আব্দুল বারেক ও বিউটি বেগমের ৪ সন্তানের মধ্যে অন্ধ সোহেল প্রথম সন্তান। তিনি হাটে বাজারে, বাসে, লঞ্চে, গাড়ীতে করতাল বাজিয়ে চমৎকার গান পরিবেশন করেন। প্রতিদিন তার আয় ১০০/১৫০ টাকা মাত্র। দীনমজুর পিতার অন্যান্য সন্তানরা পড়াশুনা করে। ১০০ খানার বেশি গান মুখস্ত আছে সোহেলের। প্রধানত মাইজভাণ্ডারী গান, বিজয় বিচ্ছেদ, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত এবং লালন গীতি তার প্রিয়। লোকমুখে ও ক্যাসেট রেডিওতে শুনে শুনে গান শিখেছেন সোহেল। বড় বড় অনুষ্ঠানে যখন গান করেন তখন হারমোনিয়াম, তবলা ও ঢোল-করতাল সঙ্গে থাকে। ভবিষ্যতে সোহেলের নিজের গান লেখার ইচ্ছা আছে।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোকমুখে যে কিস্‌সা, কাহিনি, ছড়া, প্রবাদ রচিত হয়, তাই লোকসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত। এখন বিভিন্ন এলাকার লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। তবে এর লিখিত রূপেরও বিবর্তন ঘটে। মানুষের মুখেমুখেই এর নতুন রূপ পায়। লোকমুখে রচিত হয়ে লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে লোকসাহিত্য একটি এলাকার বিশাল শিল্প ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত। বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা লোকসাহিত্যের কয়েকটি উপকরণের বেশকিছু নমুনা উদ্ধার করা হলো।

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

প্রতি বছর বাগেরহাটের সুন্দরবনের উপর নির্ভর করে লক্ষাধিক লোক তাদের জীবন ও জীবিকা পরিচালনা করেন। বিশেষ করে বাওয়ালি, মৌয়ালি, কাঁকড়া সংগ্রহকারী, গোলপাতা আহরনকারী, এবং বর্শেলদের আনাগোনা সুন্দরবনে বেশি। সুন্দরবনের উপর জীবন ধারণকারীদের ভয় দুই জায়গায়, পানি ও ডাঙ্গায়। পানিতে বাস করে লবণ পানির হিংস্র কুমির, যাদের ভয়ে লোকজন পানিতে নামতে চাননা, আর কচিৎ নামলেও গায়ে হলুদ মেখে নামেন, প্রবাদে আছে কুমির হলুদের গন্ধ সহ্য করতে পারেনা, তার পরেও পোনা ও কাঁকড়া সংগ্রহকারীদের পানিতে নামতেই হয়, পত্র পত্রিকায় শিরোনামে এ সংক্রান্ত অনেক সংবাদ মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে, হিন্দু বাওয়ালিরা এক্ষেত্রে যে কাজটি করে তা হলো জলে নামার সময় তারা জলের দেবী মা-গাঙ্গাকে সমরণ করেন। সুন্দরবনে আরও একটি ভয়াল প্রকৃতির প্রাণী আছে তা সকলের জানা, প্রাণীটির নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার, স্থানীয় ভাষায় অনেকে সুন্দরবনের এই রাজাকে বাঘ, কেউবা বড়-মামা বলে সম্বোধন করেন। সুন্দরবনের এই বড় মামারা অধিকাংশ সময় ডাঙ্গায় বিচরণ করে অথবা ঘুমিয়ে সময় কাটিয়ে দেন। হিন্দু বাওয়ালিরা সুন্দরবনের ডাঙ্গায় ওঠার সময় মা-বনবিবিকে সমরন করে বা তার উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করে মিনতি জানাই যাতে তাদের কোন বিপদ না-হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন বাঘ হল গাজি-পিরের সাগরেদ, সেজন্য তারা ডাঙ্গায় উঠার সময় গাজি-কালু ও চম্পাবতীর নাম স্মরণ করেন। ডাঙ্গায় উঠার পর অনেকের পায়খানা প্রশ্রাব এর বেগ হয়, কিন্তু জঙ্গলের মাটিতে করার কায়দা নেই, কারণ সুন্দরবনে যাবার পর তাদের কাছে জঙ্গলের মাটি অতি পবিত্র। পবিত্র মাটিতে কেউ পায়খানা প্রশ্রাব করতে চায় না, সেজন্য সকলে সুন্দরবনের ডাঙ্গায় পায়খানা প্রশ্রাব করার সময় গাছের পাতা ছিড়ে বিছিয়ে দেন। তারপর সেই পাতার উপর সকল ধর্মের বাওয়ালি ও বনজীবীরা প্রাতক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কাজটি বাঘের ভয়েও হতে পারে, আবার এলাকায় বসবাসরত পির আউলিয়া ও দরবেশদের নির্দেশমতও হতে পারে। যাদের আর্শীবাদ ও দোয়া নিয়ে বাওয়ালীরা জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

www.pathagar.com

হরিভজন সাধুর বাণী

সুন্দরবন ঘেষা রামপাল উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুমারখালী নদীর দক্ষিণ পাড়ে একটি খুপরী ঘরে হরিভজন সাধু বাস করতেন। হরিভজন সাধুকে অনেকে হরিভজন পাগল বলেও অভিহিত করতেন। হরিভজন চির কুমার ছিলেন, সেই সুবাদে অধিকাংশ সময় তাঁকে তার গৃহে পাওয়া যেত না। মাসের অধিকাংশ সময় তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকার হাট-বাজার, কীর্তনের আসর, কবিগানের আসরে উপস্থিত হতেন। হরিভজনকে কেউ বাড়ি নিমন্ত্রণ করলে তার সঙ্গে তাদের বাড়িতে যেতেন। হরিভজন তার জীবনে কখনও থালায় ভাত খাননি, কলাপাতায় ভাত খেতেন। এলাকার তিনি যে বাড়িতে খাবার গ্রহণ করতেন দ্বিতীয় বার আর সেই বাড়ি যেতেন না। এলাকায় বৃদ্ধদের আড্ডায় এখনও কথাটি প্রচলিত আছে। হুড়কা ইউনিয়নের বিখ্যাত ডাক্তার বাড়ি একটি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান চলছে, লোকজন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ যে যার মতো থালা নিয়ে খাবার খেতে বসেছেন, এমন সময় হরিভজন সাধুর সেখানে আগমন ঘটল। একটি টিনের বগি থালায় সাধুকে ভাত-তরকারী এনে দিলেন, সাধু টিনের থালা দেখে রাগান্বিত হলেন, কিন্তু কাউকে কিছু না বলে আসন থেকে উঠে রওনা দিলেন, বাড়ির সীমানা ছাড়ার সাথে সাথে প্রবল বেগে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। লোকজন খাবার ফেলে বিভিন্ন ঘরে আশ্রয় নিতে লাগল। বাড়ির মুরুব্বী সীতানাথ ডাক্তার ছুটলেন হরিভজন সাধুর খোঁজে। ডাক্তার দেখলেন হরিভজন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ-হা করে বৃষ্টির পানি খাচ্ছেন। ডাক্তার, হরিভজন সাধুকে অনুনয় বিনয় করে বাড়ি নিয়ে আসলেন। বাড়ির কলাগাছ থেকে পাতা কেটে, সেই পাতায় খাবার দিলেন, নিমির্ঘেই ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। হরিভজন সাধু যেখানে যেতেন, সঙ্গে দু/চার জন শিষ্য থাকতেন। অধিকাংশ সময় সাধক রোদের সময় বট গাছের নিচে বেতির তৈরি মাদুরের উপর বসে বিশ্রাম নিতেন। বিশ্রামের সময় শিষ্যরা এলাকার লোকজন হাজির থাকতেন তখন তিনি আপন মনে কিছু কথা বলতেন, শিষ্যরা সেগুলো হৃদয়ে ধারণ করে রাখতেন। যেমন :

বাঁকে বাঁকে বসরে হাট
নদী মরে জাগরে ঘাট।

হরিভজনের এই বাণীটি আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে সুন্দরবন সংলগ্ন বড়-ছোট সকল নদী প্রায়মৃত অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ ধারায় বাঁচিয়ে চলেছেন। শিবসা-পশুর এখানকার সবচাইতে বড় নদী, কিন্তু এই দুটি নদীতে বর্তমানে সামান্য স্রোত, নদীর মাঝে মাঝে বিশাল আকৃতির চর জেগেছে, নদীর দুই কূলে জেগেছে হাজার হাজার একর খাস জমি। পূর্বে এই এলাকায় হাট বাজারের সংখ্যা খুবই কম ছিল, বড় হাট বলতে রামপালের পেড়ীখালী হাট, দাকোপের বাজুয়ার হাট, শিবসা নদীর কুলের গড়াই খালীর হাট। বর্তমানে হরিভজন সাধুর বচন অনুসারে হাটের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি যেমন- শ্রীফলতলা হাট, বুজবুনিয়া হাট, রামপালের হাট, গোনার হাট, দোয়ানিয়া হাট, চিলার হাট, দিগরাজের হাট, মইদাড়ার হাট প্রমুখ। লোকসংখ্যা বাড়ার ফলেও এমন হতে পারে। ১৯৭১ সালে হরিভজন সাধু ভারতে পালিয়ে যাননি তার বার জন শিষ্যের

www.pathagar.com

এগারজন ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। কাঙ্গাল নামের একজন শিষ্য হরিভজন সাধুর সঙ্গে ছিল হরিভজন তার শিষ্য কাঙ্গালকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন, তখন রামপাল এলাকার অধিকাংশ হিন্দু গ্রামগুলো জনশূন্য, ঘরবাড়ি নেই, সব লুটপাট করে রাজাকাররা নিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে দুই একটি নাড়াও গোলপাতার ঘর দেখা যেত। হরিভজন তার শিষ্যকে নিয়ে সেই সকল ঘরে মাঝে মধ্যে রাত্রে বিশ্রাম নিতেন। একদিন দুপুরের সময় স্থানীয় রাজাকাররা হরিভজন ও তার শিষ্য কাঙ্গালকে শত্রু মনে করে দড়ি দিয়ে বেঁধে কুমারখালী নদীতে নিয়ে ফেলে। রাজাকাররা হরিভজন ও কাঙ্গালকে পানিতে চুবাতে থাকে, এক পর্যায়ে মৃত্যুর আগে সে কাঙ্গালকে উদ্দেশ্য করে বলে—

ভাবিসনে ওরে কাঙ্গাল
দেশ হবে স্বাধীন ন্যাড়ে মরে হবে জাঙ্গাল।
আসবে আবার সুদিন।

রামপাল এলাকার অনেক বৃদ্ধ লোকেরা এখনও হরিভজন সাধুর বাণী মনে রেখেছেন।

সুন্দরবন এলাকার চুটকি

মন গুনে ধন
বিচি গুনে কড়ি
কাঁঠাল খালাম হাতে
গু-খালাম পাতে।

একজন সহজ সরল মানুষ তরিতরকারি কেনার জন্য হাটে গেছেন। লোকটির কাছে টাকা কড়ি তেমন একটা নেই। এমন সময় হাটে কাঁঠাল বিক্রয় করার জায়গায় ভিড় দেখে লোকটি এগিয়ে গেলেন সেখানে। কাঁঠালের দোকানদার একটি বিশাল আকৃতির কাঁঠাল ভেঙে লোকজনকে বলছেন, মন গুনে ধন-বিচি গুনে কড়ি, অথ্যৎ যে যতগুলো কোষ কাঁঠাল খাবেন, পরবর্তীতে কাঁঠালের বিজ গুণে তার দাম পরিশোধ করতে হবে। লোকটির কাঁঠাল খাওয়ার খুব লোভ হলো, তিনি বিচিসহ কাঁঠাল খাওয়া শুরু করলেন, পরবর্তীতে তার কাছে বিচি পাওয়া না যাওয়ার তার আর দাম দিতে হলো না। লোকটি মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে আসলেন, গভীর রাতে তার পেটে ব্যথা শুরু হলো, তিনি পায়খানা করার জন্য বাড়ির পিছনের কলা বাগানের মধ্যে গেলেন। শেষ রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়াতে পায়খানা ধুয়ে গিয়ে, কাঁঠালের বিচি গুলি সেখানে পড়ে রইল। লোকটির স্ত্রী ভাবলেন, কে-যেন এখানে মনের ভুলে কিছু কাঁঠালের বিচি ফেলে গেছেন। বিচিগুলো সংগ্রহ করে মহিলা ডাটা, চিংড়ি মাছ ও কাঁঠালের আটি দিয়ে তরকারি রান্না করলেন। লোকটি দুপুরে খাবার গ্রহণের সময় তার থালায় তার স্ত্রী গরম ভাতের সঙ্গে তরকারি পরিবেশন করলেন। খাবার গ্রহণ শেষে লোকটি তার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি তরকারিতে যে কাঁঠালের বিচি দিয়েছ আচ্ছা তুমি বিচি পেলে কোথায়? মহিলা বললেন, সকালে কলাবাগানে বেড়াতে গিয়ে এই বিচিগুলো আমি পেয়েছি। লোকটি বুঝলেন তারই পায়খানা করা বিচিগুলো তার স্ত্রী সংগ্রহ করে এনে তরকারী

www.pathagar.com

রান্না করেছে। লোকটি বমি করতে শুরু করল, আর তার স্ত্রীকে বললেন ঐ তরকারী তুমি খেওনা ও গুলো বাগানে ফেলে দিয়ে এসো।

মনা দাশের বাঘ শিকার

মনা দাশের বড় ভাইয়ের নাম কিরণ দাশ। মনা ছোট বেলা থেকেই শিকারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করত, প্রথমে গুলতি দিয়ে কাক, বক, শালিখ, ঘুঘু, শিকার করে বেড়াত ঝোপ-ঝাড়ে, বন-বাদাড়ে। মনার বয়স যখন ১৯ বছর তখন দাদার একনলা পাকিস্তানি সেকেন্দার বন্ধুক নিয়ে বের হন বালিহাস শিকার করার জন্য; রামপাল উপজেলার গাজীখালীর বিলে প্রচুর পরিমাণে বালি হাস পড়তো। মনা দাশের পাখি শিকার করার এক অভিনব পন্থা ছিল, পাখিরা যখন ঝাক বেঁধে আকাশে উড়তো তখন মনা দাশ তরি বন্ধুক উঁচু করে পাখির ঠোঁট বরাবর নিশানা করে গুলি ছুড়ত, গুলি গিয়ে লাগত পাখির বুকে, পাখিরা আর্ত্মনাদ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। মনা দাশের হাতের অব্যর্থ নিশানা দেখে, তার বন্ধুরা তাকে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ শিকারের পরামর্শ দিল। মনা দাশ তার দুই বন্ধু কেনারাম মণ্ডল ও রেজোয়ান গাজীকে সাথে নিয়ে হলদিবুনিয়ার পথে বৈদ্য মারী হয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করল। একটি মানুষখেকো বাঘ দীর্ঘদিন ধরে রাতের বেলা বৈদ্যমারী এলাকায় যাতায়াত করছে, মাঝে মধ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার অনেকের গোয়াল গরু ও ছাগল শূন্য হতে লাগল। রাতের বেলা বাঘের ভয়ে লোকজন ঘরের বাহির হন না। মনা দাশ সামনে, মাঝে কেনারাম, তার হাতে একখানা ধারাল দা, রোজেয়ান গাজীর তাতে একটি দোনলা বন্দুক। কেরানাম বাঘের পায়ের ছাপ বিশেষজ্ঞ, বাঘের পায়ের ছাপ দেখে কেরানাম বলে দিতে পারে কতক্ষণ আগে বাঘটি এখান দিয়ে হেঁটে গেছে। কেনারাম পরীক্ষা করে বলল, মাত্র আধা ঘণ্টা আগে বাঘটি এই পথ দিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করছে। বাঘের পায়ের ছাপ ধরে তিনবন্ধু অগ্রসর হতে লাগল। আধা মাইল হাঁটার পর একটি উঁচু ঢিবি মতো জায়গায় এক হেতাল বনের মধ্যে বাঘটির সন্ধান পাওয়া গেল। মনা দাশ, বাঘের চিবানোর শব্দ শুনতে পেল। হেতাল বাগানের পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি খাল বয়ে গেছে, সেজন্য গাছাল দিল বাগানটির উত্তর ও দক্ষিণ পাশে। মনা ও কেনা একটি বাইন গাছে উঠে বসলো, রেজোয়ান উঠল একটি কেওয়া গাছে। অনেকক্ষণ হল বাঘ বের হয় না, সম্ভবত খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঘের ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যার ঠিক আগে, বাঘটি লম্বা হয়ে আলস্য ত্যাগ করল, দুটি ডাক দিল, তার পর হন হন করে বাইন গাছটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মনা দাশ তার বন্ধুক এল এম জি গুলি ভরল, ট্রিগারে আগুল রাখলো, এবং বাঘের কপাল লক্ষ্য কলে গুলি করল, বাঘ চিৎকার দিল, এবং ১০/১৫ হাত লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল, মনা সাথে সাথেই আরেকটি গুলি ভরে বাঘের কান বরাবর গুলি করল, বাঘটি নিস্তব্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে রইল, কেনারাম মেপে দেখল লম্বায় আট হাত। বাঘটিকে ফেলে রেখে তিনজনে বৈদ্যমারী বাঘের মৃত্যুর খবর লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পরদিন সকালে মনা, কেনা ও রেজোয়ান দুজন কসাই সাথে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করল বাঘটির চামড়া ছাড়িয়ে আনার জন্য। চামড়া ছাড়ানো হল, চামড়ায় লবণ মাখানো হলো ১০ কেজি। বাঘের চামড়া নিয়ে তিন বন্ধু কেনারামের

www.pathagar.com

বাড়িতে পৌঁছালো, কেনারাম তার মামার বাড়ির ছাদে যত্ন সহকারে চামড়াটি শুকালো, তারপর একদিন কিনর দাশের নির্দেশ মতো মনাদাশ চামড়াটি বাড়ি নিয়ে যায় এবং খড়-কুটা ও বাঁশের চটা দিয়ে বাঘের মূর্তি তৈরি করে চামড়াটি পড়িয়ে দেয়। দুটি কাঁচের মার্বেল দিয়ে বাঘের দুটি নকল চোখ তৈরি করা হয়। কিরণ ও মনাদাশের মৃত্যুর পর বাড়িটি বাংলাদেশে সরকার এস পি অফিস বানায়। বাঘের মূর্তিটি বর্তমানে বাঘেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে গচ্ছিত আছে।

খ. কিংবদন্তি

খাঞ্জেলি দিঘি

হযরত খানজাহান (রা.) এর মাজারের দক্ষিণ দিকে আয়তনে প্রায় ২০০ বিঘা জমি জুড়ে এ দিঘি অবস্থিত। এই দিঘির নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন বুদ্ধ ঠাকুরের মূর্তি প্রাপ্তির জন্য এর নাম হয় ঠাকুর দিঘি। অন্য মতে খানজাহানকে দেশীয় হিন্দুগণ ভক্তিভরে ঠাকুর বলত এবং তাঁরই বিশেষ তত্ত্বাবধানে এ দিঘি খনন করা হয় বলে তাদের ভক্তিভাজন ঠাকুরের নামানুসারে ঠাকুর দিঘি বলা হতো। আবার কেউ কেউ বলেন পির আলী মোহাম্মদ তাহের খাজাহানের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। তিনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিল শ্রী গোবিন্দ লাল রায়। খানজাহান তাঁকে আদর করে ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন। তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এ দীঘির নাম ঠাকুর দিঘি রেখেছিলেন। তাঁর মাজার খানজাহান (রা.) মাজার সংলগ্ন পশ্চিমে অবস্থিত।

দিঘির প্রধান ঘাটটি প্রশস্ত ও সুন্দর। মহিলাদের জন্য আলাদা ঘাট আছে। এ দিঘিতে কালা পাহাড় ও ধলা পাহাড় নামক কুমিরের বংশধররা আজও জীবিত এবং ডাকলে আসে। এ দিঘির পানি সুপেয়। অনেকে রোগপীড়া থেকে নিরাময়ের জন্য এ দিঘির পানি পান করেন এবং দিঘিতে গোসল করে।

মোরেলগঞ্জ এলাকার নদী, বিভিন্ন পুকুর নিয়ে কিংবদন্তি রয়েছে। মোরেলগঞ্জ শহর পানগুছি নদীর তীরে অবস্থিত। এছাড়া প্রধান প্রধান নদী হল, বলেশ্বর, বিশখালী, পয়লা হারা। বলেশ্বর নদীতে দুপুর বেলা যদি কেউ পাড়ি দেয় তবে তার মৃত্যু অনিবার্য এমন কথা প্রচলিত। মূলত এই নদীটি অত্যন্ত প্রসস্ত এবং খরস্রোতা তাই এমনটি প্রচলিত আছে,

দুহাররা হালে যে দ্যায় বলেশ্বর পারী,
হ্যার মাউগ অয় রাঢ়ী।

অর্থাৎ দুপুর বেলায় যে বলেশ্বর নদী পাড়ি দেয় তার মাউগ অর্থাৎ স্ত্রী বিধবা হয়।

লক্ষ্মীখালির বটতলার পুকুর, দোনা গ্রামের ছোট পুকুরের পানি সর্বদাই ঘোলা থাকে এবং অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। লোকবিশ্বাস ঐ পুকুরে জ্বিন গোসল করে তাই সর্বদা ঘোলা থাকে।

পাতাবাড়িয়া গ্রামে কাশির পুকুর আছে। সেখানে একটি নববধূ সংসারের দুঃখ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে এবং দেবী হয়ে গেছে- সে রাতে এসে বলে, "সোনার

www.pathagar.com

নৌকা পবনের বৈঠা তল যা, তল যা"। মোরেলগঞ্জ বাজার সম্পর্কে কিংবদন্তি আছে- বাজারে একটি বটগাছ ছিল। তার তলে এক পাগল থাকত। একদিন কিছু দুষ্টু লোকেরা তাকে অপমান ও মারধর করে। ঐ পাগল প্রকাশ্য দিবালোকে গলা পর্যন্ত নদীর মধ্যে নেমে যায় এবং ঐভাবে ভাসতে ভাসতে চলে যায়। সেই থেকে তার অভিশাপে মোরেলগঞ্জ বাজার পুরাটাই ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়। আর একটি লোক বিশ্বাস হল নদীতে একসময় অনেক কুমীর ছিল। বাজারে একটি মাজার ছিল, কুমিরগুলো সেখানে এসে ভেসে উঠত এবং ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যেতো। দূরে গিয়ে আবার ডুবে যেতো।

সম্রাট আকবরের আমলে হজরত খাজা খানজাহান আলী দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাংলায় আসেন। তিনি আসার পর হিন্দু রাজাদের দমনের জন্য যুদ্ধ করেন। বাগেরহাটের রণবিজয়পুর নামক স্থানে রাজা গোপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তার পর থেকে স্থানটির নাম হয় রনবিজয়পুর। রূপসা - বাগেরহাট রেল স্টেশনগুলির মধ্যে রণবিজয়পুর নামক স্থানটির নামে একটি স্টেশন চালু হয়। যুদ্ধে জয় লাভ করার পর হজরত খানজাহান আলী তার সৈন্যদের নিয়ে অলস সময় মনোনিবেশ করেন। হজরত খানজাহান আলীর সময়ে যে সকল দিঘি খনন করা হয়, তার মধ্যে খানজাহান আলী দিঘি (ঠাকুর দিঘি), ঘোড়া দিঘি, পঁচা দিঘি, কোদাল ধোয়া দিঘি, ফুল-পুকুর দিঘি, রাজনগর দিঘি, রামপাল দিঘি ও ঝলমলিয়া দিঘি প্রধান। ঝলমলিয়া দিঘি রামপাল উপজেলা হুড়কা ইউনিয়নের রামপাল নদীর পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এর জল ঝলমল করত বলে দিঘিটির নাম রয়েছে ঝলমলিয়া দিঘি বলে অনেকেই মনে করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ইতিহাস বিষয়ের ছাত্র চাড়াখালী গ্রামের সুশান্ত কুমার মন্ডল (৪৫) বলেন, দিঘিটির বয়স আনুমানিক ৫০০-৬০০ বছর। খান জাহান আলী পুকুরটি খনন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে দিঘিটির কিছু অংশ আবার খনন করা হয়। তখন দিঘির পূর্ব এবং দক্ষিণ পাড়ে দুটি বাঁধানো ঘাট পাওয়া যায়, যার ইট এর সাথে ষাটগুম্বুজ মসজিদের সামঞ্জস্য রয়েছে। ইট বা টালীগুলো তিন ইঞ্চি পুরু এবং এক ফুট দৈর্ঘ্য এবং এক ফুট প্রস্থ।

দিঘিটি মোট আট একর জমির উপর অবস্থিত। এর মধ্যে চার একর জলায়তন। দিঘিটির পাড়ে পাঁচশ বৎসরের পুরোনো কিছু গাছপালা এখন ও আছে, তার মধ্যে তেঁতুল, অশেকি,বট, গাব ও অশ্ব গাছ দেখা যায়। এককেটি গাছ ৪/৫ জন লোক বেড়ে পায় না। সন্ধ্যা হবার সাথে সাথে হাজার হাজার বক, শালিক, বাদুড় গাছগুলোর শাখা প্রশাখা ও ডালে আশ্রয় গ্রহণ করে। শত বৎসরে পুরোনো একটি বকুল ও একটি কদম গাছ সম্প্রতি মারা গেছে। সমগ্র দিঘিটি ১৬ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। দিঘিটির জলাশয় সাদা ও লাল পদ্মফুলে আবৃত। সিঙ্গড়া গাছ নামে একটি জলজ উদ্ভিদ পুকুরের জলে দেখা যায়। স্থানীয় লোকজন মাঝে মধ্যে দিঘির সিঙ্গড়া গাছগুলো পরিষ্কার করেন, তখন স্থানীয় লোকজনের মধ্যে সিঙ্গড়া ফল খোজার ধুম পড়ে যায়, সিঙ্গড়া ফলের মাঝে সাদা এক ধরণের নরম বিজ পাওয়া যায়, স্থানীয় লোকজন খুব আগ্রহ সহকারে খেয়ে থাকেন। তিন কোণা আকৃতির সিঙ্গড়া ফলগুলো স্থানীয় বিভিন্ন বাজারে ২০ থেকে ২৫

www.pathagar.com

টাকা কেজি দরে বিক্রয় হয়। দিঘির পাড়ে ২০০ বছরের পুরোনো কিছু গাছ রয়েছে। উত্তর পূর্ব দিকে ১টি গাব গাছ দুটি পূণ্যনাশা গাছ, উত্তর পশ্চিম কোণে আরো একটি পূণ্যনাসা গাছ রয়েছে। পকিস্তান সময়ের কিছু পুরোনো গাছ রয়েছে এই দিঘির পাড়ে। উত্তর পাড় ঘাটের দুপাশে দুটি বড় বটগাছ। পূর্ব পাড়ে একটি বটগাছ এবং দক্ষিণ পূর্ব পাড়ে একটি বড় বট গাছ রয়েছে।

দিঘিটির দক্ষিণ পাড় ব্যতিত অন্য তিন পাড়ের ঘাট শান বাঁধানো। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ কলসি, ড্রামে করে এই পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন, অনেকে আবার এই পানি প্রতি ড্রাম ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রয় করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেক দূর থেকে লোকজন এই দিঘির পানি পান করার জন্য নিয়ে যায়। সুমিষ্ট এই দিঘির পানি খেলে সব রোগ সেরে যায় বলে লোকজনের ধারণা রয়েছে। এর পাশ্ববর্তী মংলা উপজেলা এবং দাকোপ উপজেলার লোকজন আসে এই দিঘির পানি নেয়ার জন্য। সাধারণত নৌকা, ভ্যানে করে সবাই পানি নেয়। স্থানীয়রা কলসী করে পানি নেয়। পানি তোলার জন্য উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকে পাকা ঘাট রয়েছে। অনেকে রোগ নিরাময়ের জন্য পুকুর থেকে বোতলে করে পানি নিয়ে যায়। অনেক শ্রমজীবী মানুষ এখান থেকে ড্রামে করে পানি নিয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে। রামপাল, মংলা এবং দাকোপ উপজেলার সমুদ্রগামী (বঙ্গোপসাগর) মৎস্যজীবীরা তাদের নৌকায় এই দিঘির পানি নিয়ে যায়।

দিঘিতে প্রচুর পরিমাণে মাছ আছে, মাছগুলোর মধ্যে শিং, মাগুর, ভেটকী, রুই, কাতলা ও মৃগেল প্রধান। মাঝে মধ্যে দিঘিতে দু একটি বড় মাছ মরে ভেসে ওঠে, মাছগুলির ওজন একেকটি এক মনের বেশি। দিঘিটি বর্তমানে বাগেরহাট জেলা পরিষদের আওতাধীন। মাঝে মধ্যে জেলা প্রশাসক এর লোকজন ছিপ ফেলতে দিঘিতে আসেন, তখন এলাকাবাসী সঙ্গবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিহত করেন। দিঘিতে চার ফেললে পানি নষ্ট হবে, এই অজুহাতে লোকজন বর্শেলদের তাড়িয়ে দেন, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও জনগণের সাথে কথা বলেন। ঝলমলিয়া দিঘি নিয়ে জন শ্রুতির শেষ নেই, স্থানীয় আশি বৎসরের উর্ধ্বের বয়সী লোকজন এখনও সেই বিষয়গুলো নিয়ে গল্পে মেতে ওঠেন, গল্পটি হল:- দিঘির চারপার্শ্বে বসবাসরত লোকজনের বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠান বিশেষ করে বিয়ে, শ্রাদ্ধ, শিশুদের গালে ভাত, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে, বাড়ির লোকজন এসে দিঘির পাড়ে বসে কান্নাকাটি করতেন, লোকজনের আবেদন বাড়িতে আগত মেহমানদের খাবার পরিবেশন করার মতো উপযুক্ত পাত্র নেই, তখন বিশাল আকৃতির দুটি গজাল মাছ যাদের কপালে সাদা রাজটিপ, তারা ভেসে উঠত এবং মুখে করে পর্যাপ্ত পরিমাণে সোনার থালা, রূপার কাটি, রূপার চামচ দিয়ে যেত কুলে। লোকজন জিনিসপত্রগুলি নিয়ে বাড়িতে যেতেন এবং অতিথি আপ্যায়ন করে থালা বাসনগুলি আবার যথাস্থানে রেখে যেতেন। কিন্তু বর্তমানে জিনিসপত্র গুলি আর পুকুর থেকে ওঠে না, কারণ এক দুষ্টু বুড়ি নাকি পুকুর থেকে ওঠা একটি স্বর্ণের চামচ সেরে রেখেছিলেন, সেই থেকে জিনিষপত্র ওঠা বন্ধ। তবুও ঝলমলিয়া দিঘির পানি পান করে স্থানীয় লোকজন জীবনধারণ করছে।

www.pathagar.com

প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসে রাসপূর্ণিমার দিনে দিঘির পাড়ে বিশাল এক মেলা বসে, মেলায় ১০/২০ হাজার লোকের সমাগম হয়। দিঘির পাড়গুলো মিলন মেলায় পরিণত হয়। এছাড়া প্রতিনিয়ত এখানে দর্শনার্থীদের আসা-যাওয়া চলতে থাকে।

দিঘির পাড়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোও পালন করা হয়। যেমন:- বিজয় বিদস, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি।

বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে এখানে মানত করতে। এছাড়া পূজা-পার্বণের সময়েও লোকজন মানত করে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য। দুর্গাপূজার প্রত্যেক দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আরতি বন্দনা হয়। শেষদিন যাত্রা গান করে স্থানীয় বাসিন্দারা। এছাড়া কবিগানও অনুষ্ঠিত হয়। ছড়াগানেই একজন চারণ কবি রয়েছেন শ্যামল সরকার নামে। এছাড়া মংলা থেকে মীরা রানী, ভাগা থেকে শংকর সরকারও এগান কবিগান পরিবেশন করে থাকেন। পশ্চিমপাড়ে কালিমন্দিরে শ্যামা পূজা হয় শ্যামা পূজায় ও কবিগান হয়। মন্দিরে বালক ব্রহ্মচারীর জন্মদিনও পালন হয়। রাসমেলার সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়। সবই হয় এই দিঘিকে ঘিরে।

২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি বছর সনাতন মেলা হয়। সনাতন বিশ্বাস নামে চারুকলার একজন মেধাবী ছাত্র ২০০২ সালের ২৪ ডিসেম্বর মারা যায়। তারই নামে সনাতন মেলা। সনাতন বিশ্বাস এর বাড়ি ঝলমলিয়া দিঘির উত্তর পূর্বকোণে। মেলায় ঢাকা থেকে তার চারুকলার বন্ধুরা আসে এবং তাদের উদ্যোগে, পরিবার এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় তিন দিনের সনাতন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন স্মরণ র‍্যালী, বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বিকালে স্মরণ সভা, রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় দিন স্থাপনা শিল্পের প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

তৃতীয় দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রা, মাতুয়া সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

প্রতিদিনই প্রয়াত সনাতন বিশ্বাসের আঁকা পেইন্টিং এর প্রদর্শনার ব্যবস্থা থাকে। প্রতিদিন সকাল বিকাল ঝলমলিয়া দিঘির পাড়ে কাঁচামালের বাজার বসে।

বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার, লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান লেগে থাকে। প্রতি সপ্তাহে গীতা পাঠ হয়। শিবপূজা হয় তিন দিন ধরে, চৈত্র মাসে নামযঞ্জ হয় দুদিন ধরে। চৈত্র মাসের শেষ দিন কীর্তন হয়, কবিগান হয়। শ্যামাপূজা হয়। কার্তিক মাসে। রাসমেলা হয় অগ্রহায়ণ মাসে সাত দিনব্যাপী। চড়ক পূজা হয় চৈত্র মাসের দিন।

পূর্ব পাড়ে রয়েছে ঝলমলেশ্বরী মন্দির। একটি শহিদ মিনার রয়েছে। পশ্চিম পাড়ে একটি কালিমন্দির রয়েছে। দক্ষিণ এবং পূর্ব পাড়ে দিঘির জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা দোকান বসিয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পিকনিক করতেও এখানে লোকজন আসে।

পির মোছের শাহ্

বাগেরহাটের পির হযরত খাজা খান জাহান আলী (রা.) শিষ্য ছিলেন পির মোছের শাহ্। পির খাজা খানজাহান আলী যখন ধর্ম প্রচারের জন্য বাগেরহাট অঞ্চলে আসেন

www.pathagar.com

তখন তাঁর সাথে সাথেই থাকতেন শিশু মেছের শাহ্। একদিন শিশু মেছের শাহ্ হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন সুন্দরবনের কাছাকাছি। ক্লান্ত মেছের শাহ্ ক্ষুধার জ্বালায় একটি পাকুড় গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমন্ত অপরিচিত সোম্য সুদর্শন বালকের দেহ থেকে এক ধরনের জ্যোতি বের হতে থাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পাশ্ববর্তী এলাকার লোকজন ঘুমন্ত বালকের চারপাশে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। লোকজন একে অপরের দিকে তাকাতে থাকেন, কে ডেকে বালককে জাগিয়ে তুলবেন, কারো সাহস হয় না। হঠাৎ করে শিশু মেছের শাহের ঘুম ভেঙ্গে যায়। শিশু মেছের শাহ্ উঠে দাঁড়ান এবং সবাইকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, এই এলাকার কী নাম?

সবাই সমবেতভাবে বলে ওঠেন, এলাকার নাম মিঠেখালী। বাহ! সুন্দর নাম, মিঠে মানে মিষ্টি, আমাদের নবিজী খুব মিষ্টি পছন্দ করতেন, এই মিঠেখালীতেই আমি অবস্থান করব। মধ্য বয়সী একজন মুরুব্বি গোছের লোক বললেন বালক, তোমার তো খাওয়া-দাওয়া হয়নি, চলো, আমার সাথে আমাদের বাড়িতে। মেছের শাহ্ মুরুব্বির পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলেন। মুরুব্বির বাড়িতে মেছের শাহ্ খাওয়াদাওয়া করলেন, এবং সন্ধ্যা হলে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মেছের শাহ্ মনিবের গোয়াল থেকে গরু বের করলেন এবং মাঠে নিয়ে গেলেন। এভাবে কেটে গেল পাঁচটি বছর। বালক মেছের শাহ্ অন্য বালকদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন ও নদীতে সাঁতার কাটেন। একদিন নদীতে কুমির দেখা গেল, নদীতে নামতে কেউ সাহস পায় না, বালক মেছের শাহ্, নদীতে নামলেন, সাঁতার কাটতে লাগলেন, কিছু সময় পর একটি বড় কুমির তাঁর কাছে আসল, মেছের শাহ্ কুমিরের পিঠে উঠলেন এবং নদী পার হলেন। মেছের শাহ্ সঙ্গী সাথীরা অবাক হলো, পরে মেছের শাহ্ তাদের বললেন তোমরা এ কথা কাউকে বলোনা, তাহলে আমার ক্ষতি হবে। একদিন মেছের শাহ্ গরু চড়াতে অনেক দূরে গেলেন, এবং এক সময় সন্ধ্যা হলো, বাড়ি পৌছাতে ঘণ্টা খানেক লাগবে। মেছের শাহ্ গরুগুলোকে বকে পরিণত করলেন। বক পাখীরা যেই উড়ে মালিকের বাড়ির কাছে আসল তখন মেছের শাহ্ বক গুলিকে আবার গরুতে রূপান্তরিত করলেন। বাড়ির মালিক তার আঁটে দাড়িয়ে বিষয়টি অবলোকন করলেন। বাড়ির মালিক চিন্তা করলেন এই বালক সাধারণ মানুষ নন। এ অবশ্যই পীর, দরবেশ বা আউলিয়াগোছের লোক। মালিক মেছের শাহকে দশ বিঘা জমি দান করলেন। মেছের শাহ তার শিষ্যদের নিয়ে ঐ জায়গায় থেকে ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। মোছের শাহের মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা প্রতিবছর মেলার আয়োজন করেন, বহু দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার পূণার্থী আসেন, তিনদিন ধরে চলে মেলা।

পীর হযরত বাছের শাহ্

তিনশ পঞ্চাশ বছর আগের কথা। পদ্মার পাড়ে এক সাধক বাস করতেন, নাম তার মাগন ঠাকুর। মাগন ঠাকুরের এক সাগরেদের নাম বাছের আলী। বাছের আলীর বয়স তখন ১৫ বছর। একদিন বাছের তার ওস্তাদের সাথে দেখা করার মানসে আটটি নারকেল নিয়ে সুন্দরবন থেকে রওনা দেন উওরের দিকে। নারিকেলের ছোটায় জোড়ায় জোড়ায় বাধা ছিল নারিকেলগুলি। বাছের নারকেলগুলি দু ঘাড়ে ঝুলিয়ে রওনা দেন।

www.pathagar.com

আকাঁবাঁকা পথে প্রায় দুশো কিলোমিটার পথ। নারকেলের ছোবড়ার ঘষায় বাছেরের ঘাড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়, সেখান দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে। শিশু বাছের শাহের এই অবস্থা দেখে ওস্তাদ মাগন ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হন। ওস্তাদ, বাছের শাহ্‌কে আশীর্বাদ করেন। ধীরে ধীরে বাছের শাহ্‌ বাক্য সিদ্ধ মহাপুরুষে পরিণত হন। বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত-মণ্ডলি বাছের শাহের কাছে আসতে শুরু করেন। বাছের শাহের হাতে অনেক রোগি ভালো হয়ে যায়। তখন ইংরেজ আমল, সুন্দরবন সংলগ্ন আর একটি গঞ্জের নাম মোড়েলগঞ্জ। ফাদার মোড়েল তখন ঐ এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট। ফাদার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, ক্রনিক পেটে ব্যথা। ফাদার লোকমুখে হযরত বাছের শাহের অলৌকিক গুণের কথা জানতে পারেন। ফাদার কিছু সৈন্য সামন্ত পাঠান বাছের শাহ্‌কে আনতে। বাছের শাহ্‌ অপরাগতা প্রকাশ করেন। তারপর ফাদার বাছের শাহ্‌কে ধরে আনার জন্য ১৫০ জন সৈন্য প্রেরণ করেন। ফাদারের সৈন্যরা যখন বাছের শাহের এলাকা ঘিরে ফেলেন, তখন বাছের শাহের শিষ্যরা কান্নাকাটি শুরু করেন। বাছের শাহ্‌ তখন আল্লাহর কাছে ধ্যান করেন, বাছের শাহ্‌ ধ্যানে সকল বিষয় জানতে পারেন, এবং ধ্যানরত অবস্থায় এক মুষ্টি ধুলা মন্ত্র পূত করে প্রধান শিষ্যের হাতে দেন। বাছের শাহের প্রধান শিষ্য ধুলিমাটি সৈনিকদের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। মূহূর্তের মধ্যে ১৫০ জন সৈনিক ১৫০টি দাঁড়কাকে পরিণত হয়ে যান। ফাদার মোড়েল লোকমুখে তার সৈনিকদের এই করুণ পরিণতির কথা জানতে পারেন, তিনি পানসি নৌকা নিয়ে বাছের শাহের কাছে আসেন এবং ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে বাছের শাহের কাছে ক্ষমা প্রাথনা করেন। বাছের শাহের মন গলে যায়, তিনি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কাকগুলিকে মানুষে পরিণত করে, সঙ্গে সঙ্গে ফাদার মোড়েলের পেটে ব্যথা ও ভাল হয়ে যায়। ফাদার মোড়েল যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রতিবছর এক বার পানসি নৌকা বোঝাই করে তরি-তরকারি, ফল-ফলাদি নিয়ে বাছের শাহের দরবারে আসতেন। বাছের শাহের মাজার মংলার মিঠেখালী ইউনিয়নের সিদ্দিক চেয়ারম্যানের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। বাংলাদেশের আশির দশকের একজন প্রখ্যাত কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ঐ সিদ্দিক চেয়ারম্যানের বংশে জন্মে ছিলেন। কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এবং তার বন্ধু ইখতিয়ার উদ্দিন বাবলু বাছের শাহের মাজারে একটি বকুল ফুলের চারা লাগিয়ে ছিলেন, বর্তমানে গাছটি ডালপালায় প্রসারিত হয়ে অনেক বড় হয়েছে, স্থানীয় লোকজন প্রতি সপ্তাহে ছিন্নি দেন, বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসেন। তবে আশ্চার্যের বিষয় কবরটি পূর্ব পশ্চিম বরাবর শায়িত। কথিত আছে বাছের শাহের শিষ্যরা তার মৃত্যুর পর যথা নিয়মে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর কবর দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতেই কবরটি পূর্ব-পশ্চিম বরাবর হয়ে যায়।

জিন চালক হামেদ ঢালী

সুন্দরবন সংলগ্ন একটি বাজারের নাম চুলকাঠি। চুলকাঠি বাজারের পার্শ্বে ঘনবসতিপূর্ণ একটি বধিষ্ণু গ্রামের নাম সুগন্ধি। গ্রামটি সর্ব দক্ষিণে হামেদ ঢালীর বাড়ি। হামেদ জিন-পরি চালক দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। হামেদ ঢালীর বয়স যখন ১৪ বছর তখন তিনি তাঁর বাবা-মায়ের উপর রাগ করে ভারতে যান, সেখানে বশির হাটের

www.pathagar.com

এক পিরের আস্তানায় দীর্ঘ ৬ বছর অতিবাহিত করেন। বশির হাট থেকে বাংলাদেশে আসার সময় হামেদ ঢালীর ওস্তাদ তাঁকে একটি জিন ও একটি পরী উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

হামেদ ঢালী দেশ স্বাধীন এরপর দেশে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাড়িতে বসে জিন-পরি চালক দিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন।

হামেদ ঢালীর কাছে সব শ্রেণির পেশার লোকেরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আসেন। কুলি, মজুর, কামার, কুমার, থানা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসপি, ডিসি সাহেবরা ও আসেন। অনেক সময় তাঁর, তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়েও সমস্যা সমাধানের জন্য হামেদ ঢালীর কাছে আসেন। হামেদ ঢালীর বাড়ি দুটি বিশাল আকৃতির দোতলা টিনের ঘর। একটা ঘরে হামেদ তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিজন নিয়ে থাকেন, অন্য ঘরটিতে তিনি সন্ধ্যার পর জিন-পরি চালক দেন। জিন চালক দেবার পূর্বে হামেদ সবাইকে সতর্ক করেন, কারো হাতে টর্চ লাইট বা দিয়াশলাই রাখা যাবে না, কারণ জিন-পরিরা আগুন ও আলো পছন্দ করেন না, যদি কারো কাছে থাকে, তিনি দয়া করে ঐ সমস্ত জিনিস বাইরে রেখে আসেন, কারণ অনেক সময় জিন টের পেলে তাকে চড় ও লাথি মারতে পারেন, যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

হামেদ আরবিতে দোয়া পড়া শুরু করেন-

বিসমিল্লা রাসুলুল্লা
আল্লাহর যত পির আউলিয়া নেক বান্দাগণ
দোহাই খাজা বাবা, হযরত শাহাজালাল
আমার ওস্তাদ পীর বদরউদ্দিন আউলিয়ার দোহাই
এক্ষুণি ওস্তাদ হাজির কর কামরান নামের জিন।

দোয়া পড়ার পর পরই পত পত করে শব্দ ভেসে আসতে থাকে, যেন দূর থেকে কবুতর উড়ে আসছে। এবার দড়াম করে টিনের চালের উপর বিকট শব্দ যেন চাল ভেঙ্গে পড়ল। এবার দোতলার পাটাতনের উপর দড়াম দড়াম শব্দ, তারপর হামেদ ঢালীর সম্মুখ ভাড়ে চৌকি পিঁড়ার উপর এক শব্দ। এবার জিন বিকট গলায় শব্দ করে হামেদ ঢালীকে ভৎসনা শুরু করে, জানিস না হামেদ আমার বয়স নয়শ নিরানব্বই বছর, আমি মক্কার হাবিল পর্বতের চূড়ায় বসে নামাজ পড়ছিলাম, তুই কেন আমাকে স্মরণ করলি।

এবার হামেদ তাঁর নিজস্ব গলায় জিনকে কাকুতি-মিনতি করে বলে হুজুর বহু দূর দূরান্ত থেকে অনেক ভক্তবৃন্দ আমার কাছে এসেছে, তাদের সমস্যা নিয়ে, আপনি যদি দয়া করে, মেহেরবানী করে এদের সমস্যা সমাধান করে দেন তাহলে এরা বড় উপকৃত হয়। জিন এবার বিকট গলায় বলা শুরু করে বাবা অরুণ কেন এসেছো।

এবার অরুণ বলছে, হুজুর আমার ঘেরের মাছ মরে যাচ্ছে, আপনি ঘেরের মাছ মরা বন্ধ করেন না হলে আমি মারা পড়ব, আমার পাঁচ লক্ষ টাকা লোকসান হবে।

এবার জিন বলবে এই নাও আমার তাবিজ, লাঠিতে বেধে ঘেরের উত্তর পশ্চিম কোনায় ঝুলিয়ে দাও।

www.pathagar.com

অরুণ বলছে হুজুর হাদিয়া কত?

জিন বলছে আমি টাকা পয়সা নেই না, তবুও আমার অনেক খরচ, ফকির মিসকিনদের খাওয়াতে হয়, মাদ্রাসায় দান করতে হয়, দাও তুমি একটু কমই দাও, তোমার নজরানা একহাজার এক টাকা। অরুন অন্ধকারে টাকা বের করে জিনের হাতে দেন। এভাবে প্রতি রাতে হামেদ ১৫ থেকে ২০টি লোকের সমস্যার সমাধান দেন।

কোনদিন এস পি ডিসি সাহেবের স্ত্রীরা আসলে শুধুমাত্র তাদের জন্য জিন-পরি চালক দেন হামেদ। সেদিন সাধারণ লোকদের ঘরে প্রবেশাধিকার থাকে না। সেদিন হামেদ ঢালীর বাড়ি খাসী জবাই হয়, কোরমা পোলাও রান্না হয়, ঘটা করে তিনি তাদের মেহমানদারী করেন। হামেদ ঢালী হাদিয়াও পান অঢেল পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় হয়। হামেদ ঢালী এখন বৃদ্ধ, বয়স হয়েছে, সারা জীবন যা আয় করেছেন তা দিয়ে ষাট বিঘা ধানী জমি কিনেছেন, দুটি ছেলেকে এম এ পাশ করিয়ে সরকারি চাকরি করাচ্ছেন। তবুও হামেদ ঢালীর এ ব্যবসা তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলবে, যদি আরও কিছু সম্পদ করা যায়, তাহলে তার সন্তান নাতি পুতি আরাম আয়েশে থাকবে।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

জীবনযাপনের তাগিদেই সাধারণ মানুষ বাঁশ, বেত, লোহা, সোনা, তামা, কাঁসা, মাটি প্রভৃতি বস্তু দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে নানারকম সামগ্রী নির্মাণ করেছে। এর মাধ্যমে যেমন সাংসারিক প্রয়োজন মিটছে, তেমনি এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে লোকজীবনের শিল্পচেতনা। লোকসমাজের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে লোকশিল্প। এসব লোকশিল্প বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রমজীবী মানুষ লোকশিল্পের চর্চা করে থাকে। বাগেরহাট জেলার ঐতিহ্যবাহী কয়েক ধরণের লোকশিল্পের বিবরণ তুলে ধরা যায়।

১. মৃৎশিল্প

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের একটি গ্রাম ভাগা। এই ভাগা গ্রামে নির্মল পাল দীর্ঘদিন ধরে মৃৎশিল্পের কাজ করেন। তার বাবার নাম আত্মতোষ পাল, মায়ের নাম ননী বালা পাল। মা-বাবা মারা গেছেন। বর্তমানে সংসারে ৫জন সদস্য, নিজে, স্ত্রী, দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে তার সঙ্গে থাকেন। ছেলের স্ত্রী এবং তাদের চার মাস বয়সী একমাত্র ছেলে। বিমল পালের বয়স ৬৫ বৎসর। পাকিস্তান আমলে বিমল পালের বাবা মৃৎশিল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সবকিছু হারিয়ে সবাই ভারতে চলে যান। দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশে ফিরে এসে বিমল পাল নতুন করে মৃৎশিল্পের কাজ শুরু করেন। বিমল পালের আরো দুই ভাই আছেন যারা আলাদা সংসারে থাকেন এবং আলাদাভাবে মৃৎশিল্পের কাজ করে। বিমল পাল প্রধানত মালসা তৈরি করেন। দধি বিক্রির জন্য যে মালসা লাগে। ১২ মাস ধরেই মালসা তৈরির কাজ চলে। তবে বর্ষাকালে একটু কম কাজ হয়। বর্ষাকালে এবং শীতের কুয়াশা থেকে কাঁচা মালসা রক্ষা করার জন্য তাবুর ঢাকনা ব্যবহার করা হয়। বিমল পাল নিজে, তার স্ত্রী, ছেলের বৌ এবং ছেলে মিলে এই কাজ করেন। তবে ছেলে পাশাপাশি বাড়ির পাশে বাজারে মোবাইল সারানোর কাজও করে। মালসা তৈরির মাটি চার কি.মি. দূরের মিরাখালীর বিল থেকে আনা হয়। ভ্যানে করে। প্রতি ভ্যান মাটি ৬০ টাকা করে দাম পড়ে। সারা বছরের মাটি একসঙ্গে আনা হয় এবং বাড়িতে গাদা করে রাখা হয়। মাটি একদিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর বালি মিশিয়ে মালসা তৈরি করতে হয়। প্রতিভ্যান মাটিতে ১ বর্গফুট বালি দরকার হয়। বালি পাশের ভাগা বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রতি বর্গফুট বালির দাম ১০ টাকা। পানি আনা হয় পাশের বাড়ির পুকুর থেকে। মহিলারা আনে মহিলারাই মালসা তৈরি করে। পুরুষরা মাটি ছ্যানা, মাটি আনা, বিক্রির কাজ করে। একজনে প্রতিদিন ১৫০টি মালসা তৈরি করতে

www.pathagar.com

পারে। ১ ভ্যান মাটিতে ১৫০র মতো মালসা তৈরি হয়। মালসা তৈরি হয়ে গেলে একসঙ্গে ১৫০০টি মালসা পোড়ানো হয়। এর জন্য প্রয়োজন ১০০০টি গোবরের মুটে। সময় লাগে ৫/৬ ঘণ্টা। এই গোবরের মুটে ২০ কি.মি. দূরের বেতাগা বাজার থেকে আনা হয়। প্রতিটি মুটের দাম পড়ে এক টাকা। মালসা তৈরি হয়ে গেলে বিক্রি করা হয় মিটির দোকানে পাইকারি হারে। ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এই মালসার। সেই জন্য বিমল পাল শুধু মালসা তৈরি করেন। ছোট বড় মাঝারি চার সাইজের মালসা তৈরি হয় তার বাড়িতে। ২৫০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি এবং ২ কেজি সাইজের মালসা তৈরি হয়। যথাক্রমে ১.৫০ টাকা, ২.০০ টাকা, ৩.০০ টাকা এবং ৫.৫০ টাকা দামে মালসা বিক্রি হয়। ভ্যানে করে তিনি নিজেই পৌঁছে দেন মিষ্টির দোকানগুলিতে। রামপাল উপজেলার ভাগা বাজারের ফয়লা বাজারে এবং মংলা উপজেলার দিগরাজ বাজারে, মংলা শহরে এবং বৌদ্ধমারী বাজারের মিষ্টি দোকানদাররা তার স্থায়ী ক্রেতা। ৭ শতক জমির উপরই বিমল পালের বসত বাটি। এছাড়া তার আর কোন জমিজমা নেই। এই মৃৎশিল্পের আয় দিয়েই তার সংসার চলে। ইতোমধ্যে তিনি ৪ রুমের একটি বিল্ডিং এর কাজ শুরু করেছেন।

মোরেলগঞ্জ উপজেলায় মৃৎ শিল্পী, বাঁশ ও বেত শিল্পী আছে। মৃৎ শিল্পীরা সাধারণত এখানে পুতুল তৈরি করেন। হাঁড়ি পাতিল এই এলাকার মৃৎ শিল্পীরা কম বানিয়ে থাকেন। এদের হাতিয়ার বলতে তেমন কিছুই না। মূল উপকরণ মাটি, তুশ, পাট, রংতুলি এ সবই প্রধান। বাঁশ ও বেত শিল্পীরা ব্যবহার্য সামগ্রী বানায়। এদের হাতিয়ার দা, ধারালো ছুরি প্রভৃতি। এরা ঝুড়ি, ডালা, কুলা, ধামা ইত্যাদি তৈরি করেন। জনৈক মহিলা অভিনব হস্তশিল্প তৈরি করেন। বাজে কাগজ, গরম ভাতের মাড়ের (ফ্যানের) মধ্যে ফেলে গলিয়ে কাই বানিয়ে বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র তৈরি করেন। যেমন, টি-টেবিল, ফুলদানি, ডিম, ঝুড়ি, বাটি, থালা ইত্যাদি।

"পাতায় ছাউনি পাতায় রস

উপকার করে বার মাস"— গোলপাতা গাছ সুন্দর বনের অতি পরিচিত একটি বৃক্ষের নাম। গোল গাছের পাতা দেখতে অনেকটা নারিকেল পাতার মতো। গোলপাতার ছাউনিযুক্ত ঘর সব ঋতুতেই বসবাসের উপযোগী বলে অনেক অর্থবান ব্যক্তিরা তাদের বাড়িতে দুই একটি ঘরে গোলপাতার ছাউনি ব্যবহার করেন। রামপাল উপজেলার তিন হাজার আট শত পরিবারের আশি শতাংশ পরিবার গোলপাতার ছাউনিযুক্ত ঘর ব্যবহার করেন।

সুন্দরবন থেকে গোলপাতা সংগ্রহের মৌসুম ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত। রামপাল উপজেলার এক হাজার বাওয়ালি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা সুন্দরবন সংলগ্ন ফরেস্ট অফিস থেকে বি. এল. সি সংগ্রহ করেন গোলপাতা সংগ্রহের জন্য। এক সপ্তাহের জন্য বাওয়ালি প্রতি বি এল সি কাটতে খরচ হয় ১৫০ টাকা। অর্থাৎ একটি নৌকায় দশজন বাওয়ালি থাকলে এক সপ্তাহের জন্য সরকারকে দিতে হয় পনেরশ টাকা।

বাওয়ালিরা সুন্দরবনে প্রবেশের আগে নৌকা ভাড়া করেন, এক সপ্তাহের খাবারের জন্য হাট বাজার করেন। নৌকায় পানির ড্রামে পানি ভরে নেন; কারণ সুন্দরবনে খাল

www.pathagar.com

ও নদীর পানি অতিরিক্ত লবণ হওয়াতে পানের উপযোগি থাকে না। বাওয়ালিরা সুন্দরবনকে স্থানীয় ভাষায় বলেন জঙ্গল। বাওয়ালিরা জঙ্গলে প্রবেশ করার পর গোলপাতা গাছের ঘন ঝোপ খুঁজতে থাকেন, এ জন্য অনেক সময় গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয়। গোলপাতা গাছগুলো সাধারণত সুন্দরবনের নদী ও খাল গুলির কাছাকাছি জন্মে। বাওয়ালিদের প্রত্যেকের সাথে একখানা ধারালো দা থাকে গোলপাতা কাঁটার জন্য। বাওয়ালিরা নৌকা কূলে বেঁধে, লুঙ্গি, মালকাছা দিয়ে, মাথায় ও মাজায় গামছা বেঁধে যার যার ধর্মের দোহাই দিয়ে গোলপাতা কাটতে শুরু করেন।

মুসলমান বাওয়ালিরা যা বলে কাজে নামেন–

পাঁচ পির বদর গাজি
বাদায় আসে নামলাম মালে
কাঁটব পাতা দলে দলে।
আমরা তোমার ভক্ত গাজি পির
আপদ বালাই হোক সব দূর।
হিন্দু বাওয়ালিরা বলেন
জয় মা বনবিবির দোহাই তোমাকে মাগো প্রণাম জানাই।
মাগো তোমার চেলার যেন
না আসে কাছে
দূর করে দাও মা
সব আপদ বালাই।

একটি ঝাড়ের গোলপাতা কাটা শেষ হলে বাওয়ালিরা মালে ওঠেন, বিড়ি, তামাক ও পান খাওয়ার জন্য। এই সময়টাই বাওয়ালিদের জন্য খুবই বিপদজনক, কারণ সুন্দরবনের গোলপাতা গাছের বাগানে বাঘ এবং কুমিরের পালিয়ে থাকার একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থল। সেজন্য দেখা যায় প্রতি বছর সুন্দরবনে বাঘ এবং বিষাক্ত সরীসৃপ এর আক্রমণে যত লোকের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে ১০% লোক মারা যায় গোলপাতা আহরণের সময়। গোলপাতা আহরণের সময় বাওয়ালিদের উপর কিছু সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকে, তা হলো গোলপাতা কাটার সময় গোলপাতা গাছের ফল সংগ্রহ করা যাবে না, আর হল গোলপাতা গাছের মাইজ পাতা কাটা যাবে না। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অনেক বাওয়ালিরা গোলফল সংগ্রহ করে আনেন, এবং বর্তমানে বাওয়ালিদের একটি শ্রেণি গোলপাতা গাছ থেকে গুড় সংগ্রহের পায়তারায় মেতে উঠেছেন। গোলপাতা গাছ থেকে রস সংগ্রহের কৌশল খুবই চমকপ্রদ। প্রথমে বাওয়ালিরা গোল গাছের ফলগুলি ঝরিয়ে ফেলেন, তারপর সেই ফল ঝরানো মোথা সামান্য পরিমাণে কেঁটে, সেখানে পাত্র বসিয়ে দেন। পাত্রের ভিতর ফোঁটায় ফোঁটায় রস পড়তে থাকে, এক পর্যায়ে পাত্র ভরে গেলে বাওয়ালিরা রস সংগ্রহ করেন, তারপর সেই রস আগুনে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করেন।

গোলপাতা গাছের গুড় রামপাল এলাকার মানুষের কাছে ঔষধি গুড় হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। অনেক ডায়াবেটিকসে আক্রান্ত রুগিরা যারা খেজুরের গুড়, আখের গুড়, চিনি বর্জন করেছেন তারা গোলপাতা গাছের গুড় নির্বিঘ্নে খেয়ে চলেছেন।

www.pathagar.com

গোলপাতা গাছের গুড় স্বাদে খানিকটা লবণ ও মিষ্টি স্বাদযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এভাবে গোলফল নিধন করে গোলফল গাছ থেকে গুড় সংগ্রহের ধারা অব্যাহত থাকলে সুন্দরবনে গোলপাতা গাছের বংশবৃদ্ধি কমে যাবে।

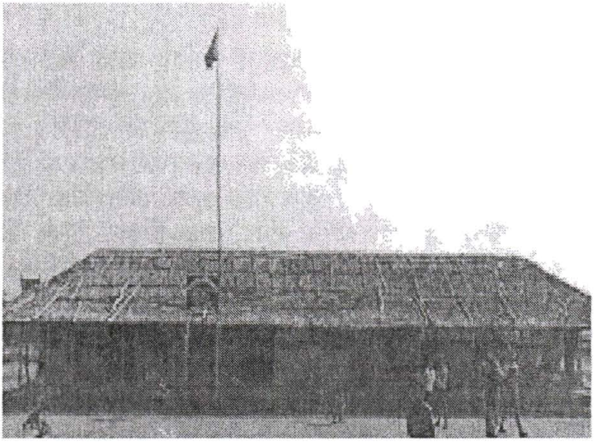

বাওয়ালিরা নৌকা বোঝাই করে গোলপাতা নিয়ে আসেন লোকালয়ে, তারপর বাজার সংলগ্ন এলাকায় সুন্দর করে সাজিয়ে স্তুপ করে রাখেন। সেখান থেকে জনগণ ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পোন দরে (এক পোনে ৮০ টি) কিনে নিয়ে ভ্যান, নছিমন বোঝাই করে বাড়ি ফেরেন, এবং ঘরের চালে গোলপাতার ছাউনি দিয়ে সন্তান পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন।

www.pathagar.com

২. শোলাশিল্প

বাগেরহাট জেলার চিতলমারি উপজেলার শোলাশিল্প মূলত লক্ষ্মীর ফুল। শ্রীপঞ্চমী তিথিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় প্রত্যেক পরিবারে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীর বিগ্রহ হিসেবে কলাবউয়ের (চারা কলাগাছে নতুন শাড়ি পরিয়ে তৈরি করা হয়) মাথার ওপর লক্ষ্মীর ফুল ঝুলিয়ে রাখা হয়। শোলা শিল্পীরা রঙিন সুদৃশ্য লক্ষ্মীর ফুল বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করেন। আকারভেদে এর দাম রাখা হয় ৪০ থেকে ৮০ টাকা। এর উপকরণ শোলা, সূচ-সুতা, আঠা, রং, ধারালো ক্ষুর প্রভৃতি। আশ্বিন মাসে পূজার ২০-২৫ দিন আগে থেকে শোলা শিল্পীরা শোলা সংগ্রহ শুরু করেন। প্রথমে মিঠাপানির বিলে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা শোলা সংগ্রহ করা হয়। পরে রোদে শুকিয়ে সেগুলো ক্ষুর জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে পাত বের করা হয়। পাতের ওপর রং করা হয়।

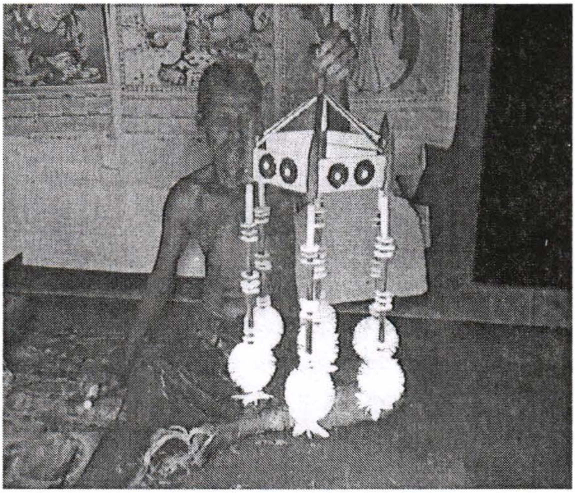

শোলাশিল্প

সাধারণত উজ্জ্বল এবং মৌলিক (লাল, নীল ও হলুদ) রং ব্যবহার করা হয়। হরিতাল, নীল, পুঁইশাকের বীচি, হাজার পাওয়ার দিয়ে রং তৈরি করা হয়। চৌকো কাঠামোর চার কোণে চারটি (কখনো পাঁচটি) ঝুরি ঝুলিয়ে লক্ষ্মীর ফুল তৈরি করা হয়। ঝুরির নিচে কদম ফুলের মতো বল ঝুলতে থাকে। লক্ষ্মীর ফুলের এই অংশ খুবই দৃষ্টিগ্রাহী। লক্ষ্মীর ফুল বিভিন্ন আকার ও ডিজাইনের হয়। শোলা শিল্পীরা উত্তরাধিকার সূত্রে এই কৌশল আয়ত্ত করে। এটি তাদের মৌসুমী আয়ের সুযোগ করে দেয়। হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ লক্ষ্মীর ফুল তৈরি করে। তবে এর উপযোগিতা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। শুধুমাত্র সৌন্দর্য চিন্তা থেকে কখনো-সখনো মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা লক্ষ্মীর ফুল কিনে থাকে। বাগেরহাট জেলাধীন চিতলমারী থানার চর বানিয়ারি পশ্চিমপাড়ার ষাটোর্ধ্ব শোলা শিল্পী কিরণ বিশ্বাস।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাগেরহাট জেলার লোক স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে ঘরবাড়ির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পললগঠিত নিম্নভূমির এলাকা বিশেষ করে সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চল হিসেবে এখাকার ঘরবাড়িতে বনাঞ্চলের প্রভাব দেখা যায়। একই সাথে দুর্বল অর্থনীতির মূর্ত হয়ে আছে নির্মাণ কাঠামোয়। ঝড়-বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হলেও তা মোকাবেলার কোনো নির্মাণ কৌশল উপাদানগত কারণে বেশ দুর্বল। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার ঘর ভাঙে আর অধিবাসীরা বারবার নতুন করে ঘর নির্মাণ করে। নরম মাটি আর বনের গাছই স্থাপত্যের প্রধান উপকরণ। ১৮০০ সালের দিকেও বাগেরহাটের দক্ষিণাঞ্চল সুন্দরবন ছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরবনে আবাদের চেষ্টা শুরু হয়। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে সীমানা নির্ধারণের আইন হয়। ওই রেগুলেশন অনুসারে সুন্দরবন জরিপ হয়ে খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করে 'লট' নম্বর দেওয়া হয়। প্রথম লট দেওয়া হয়েছিল বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ থানায়। ফলে ১৮২৮ সালের দিকেও বাগেরহাটের দক্ষিণাংশে সুন্দরবন কেটে বসতি নির্মাণ চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাগেরহাটে বসতি নির্মাণকারী অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। তারা বেশিরভাগ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত। নির্মাণ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি বলতে এদের কাছে ছিল দা-কুড়াল, হাতুড়ি-বাটাল, বাইশ ইত্যাদি। এমনকি করাতের ব্যবহারও তখন ছিল না। যার ফলে কাঠের অপচয় হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে বনের গাছ এবং গোলপাতার সরবরাহ থাকায় স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে কাঠ এবং পাতা। প্রথম দিকে সুন্দরী, গরান, বাইন ইত্যাদি সুন্দরবনের গাছ দিয়ে কাঠামো এবং ছাউনি হয়েছে গোলপাতায়। পরের দিকে আসাম থেকে আনা শাল-সেগুন কাঠের কিছু ব্যবহার দেখা গেছে।

গোলের ঘর : বাগেরহাটে গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরকে 'গোলের ঘর' নামে অভিহিত করা হয়। মাটির ভিতের উপরে কাঠের কাঠামো তৈরির পর গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া হলেই সম্পূর্ণ হয় গোলের ঘর। সাধারণত তক্তা, নলের পাটি, সুপারির চটা ইত্যাদি দিয়ে এই ঘরে বেড়া নির্মিত হয়ে থাকে। এই ঘরের কয়েকটি ধরণ আছে– দোচালা, চৌচালা, আটচালা ইত্যাদি। গোলের ঘরে অন্য যেসব কাঠ ব্যবহৃত হয় তা হলো তাল ও নারকেল। সাধারণত গাছের ভেতরের অংশ কিছুটা কালো রঙয়ের শক্ত বা 'সার'-এ পরিণত হয়। এই অংশই ব্যবহার করা হয় গৃহস্থালি কাজে। কিন্তু তাল, নারকেল ও সুপারি গাছের সার হয় বাইরের দিকে। ফলে সেই অংশ নানাবিধ কাজে লাগে গৃহস্থের।

www.pathagar.com

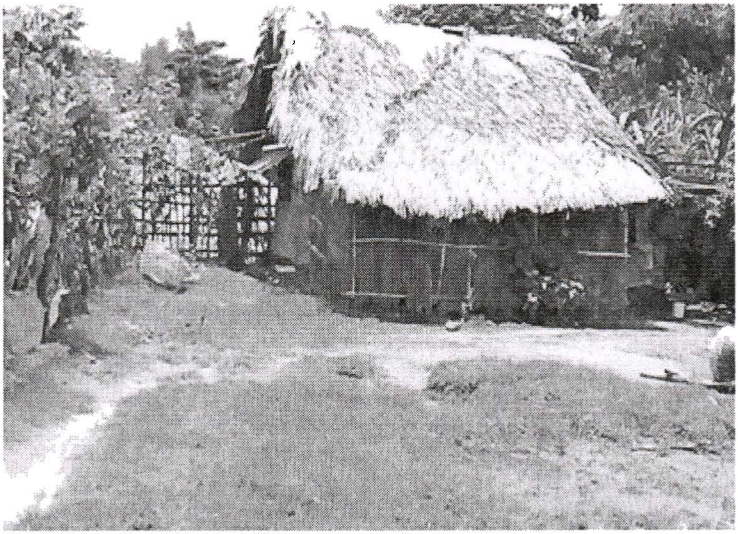

গোলপাতার দোচালা ঘর

চৌচালা টিনের ঘর

বাগেরহাটে দোচালা ঘর বেশি। দুই চাল বিশিষ্ট একটু লম্বা ঘরই দোচালা ঘর। চালের কাঠামোতে ছোট গরান গাছের বা হেঁতাল কাণ্ড এবং বাঁশের চটা বেশি ব্যবহৃত

www.pathagar.com

হতে দেখা যায়। উপরে নিচে করে লাগানো এই কাণ্ড 'রুয়া ব রুয়ো' নামে পরিচিত। ঢালু দুই চালে গোলপাতা পরপর গেঁথে তৈরি হয় ছাউনি। সাধারণত শুকনা নারকেলের খোসার আঁশ দিয়ে বানানো দড়ি দিয়ে সারা হয় বাঁধনের কাজ। হালকা হলুদ রঙয়ের এই দড়ির নাম 'কাতা।' সহজে পচে না বলে এটা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

একই ধরণের উপাদানে কিছুটা বর্গ আকৃতির ঘরে যখন দুই চালের পরিবর্তে চারটি চাল থাকে তাকে চৌচালা ঘর বলে। একে চৈরি বা চৌরি ঘরও বলা হয়। গোলপাতা উপুড় করে ছাওয়ার জন্য সাধারণ বাতাসে এটা উড়ে সমস্যার সৃষ্টি করে না। দোচালার চেয়ে চৌচালা কিছুটা অভিজাত। এটা তৈরিতে কিছু সময় এবং অর্থ বেশি লাগে।

আটচালা ঘর কদাচিত দেখা যায়। কাঠের দোতলা ঘরে আটটি চালের দরকার হয় বলে এর এমন নাম। এটা আবার চৌচালার চেয়ে অভিজাত ঘর। বাঙালি মধ্যবিত্তের নিদর্শন হিসেবে পরিচিত ছিল এই আটচালা ঘর। গরমের দিনে গোলের ঘর ঠান্ডা থাকে।

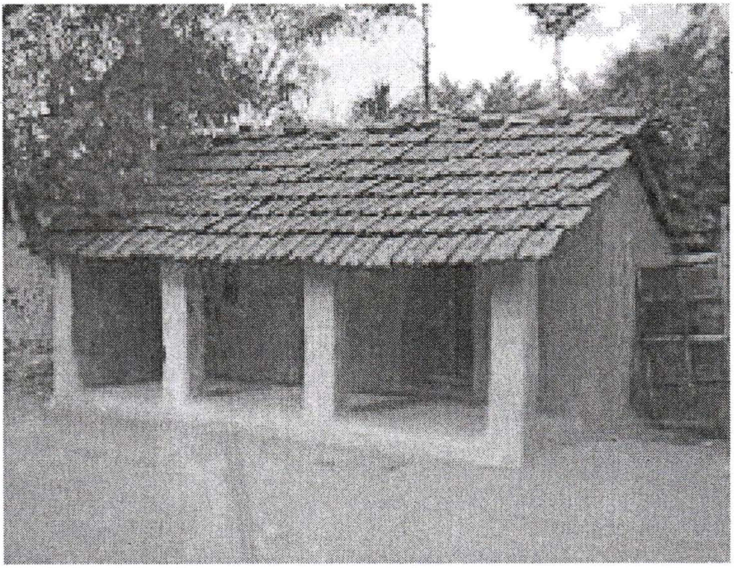

মাটির দেয়ালের টালির চালা ঘর

নাড়ার ঘর : গোলপাতার পরিবর্তে নাড়া দিয়ে ছাওয়া ঘর 'নাড়ার ঘর।' ধান কাটার পর গাছের নিচের অংশ জমিতে খাড়া থাকে। এই অংশই নাড়া নামে পরিচিত বাগেরহাট অঞ্চলে। নাড়া দিয়ে সুন্দর করে ঘর ছাওয়া যায়। অতি দরিদ্র পরিবারে বিনা পয়সায় সংগ্রহ করা নাড়া দিয়ে ঘর ছাওয়ার রেওয়াজ আছে এলাকায়। যে কারও জমি থেকে নাড়া সংগ্রহে কোন বাঁধা নেই।

www.pathagar.com

দেয়াল ঘর : কাঠের কাঠামোর পরিবর্তে এঁটেল মাটির দেয়াল দিয়ে করা ঘরই দেয়াল ঘর। মজবুত করার জন্য দেয়ালের মাটির ভিতরে অনেক সময় বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক দিন ধরে মাটি শুকিয়ে এবং পিটিয়ে দেয়াল করা লাগে। এতে দেয়াল শক্ত হয়। মাটি তাপ শোষণ করে কম বলে এ ঘরও যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকে গ্রীষ্মকালে। বাঙালির নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি দেয়াল ঘর এ এলাকার ঐতিহ্যের বাহক। দেয়াল ঘর গোলপাতা, টিন, টালি এবং নাড়া দিয়েও ছাওয়া যায়।

টিনের ঘর : গোলের ঘরের কাঠামোর সাথে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। শুধু গোলপাতার পরিবর্তে টিন দিয়ে ছাউনি করা। আর কাঠামোতে অপেক্ষাকৃত শক্ত ও দামি কাঠ ব্যবহার হয়ে থাকে। বৃটিশ আমলের শেষ দিক থেকে বাগেরহাট এলাকায় টিনের ঘর ছিল গৃহস্থের স্বস্তির প্রতিক। টিনের ঘরের চালে এবং বেড়ায় ঐতিহ্যগত কারুকাজ আমাদের লোক সংস্কৃতির ধারক।

টালির ঘর : ছাঁচে মাটি দিয়ে বানানো টালি দিয়ে ছাওয়া হলে সে ঘরকে টালির ঘর বলে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে টালির আমদানির উপর নির্ভর করে এর ব্যবহার শুরু হয় এলাকায়। নাড়া, গোলপাতার চেয়ে টালি ব্যয়বহুল। টালি খুব ভারী হয় বলে কাঠামো মজবুত করে তৈরি করা লাগে।

তথ্যসহায়ক

১. সাক্ষাৎকার, অনিলকৃষ্ণ দাম, মালগাজী; মংলা; বাগেরহাট, ৪ মার্চ ২০১৫
২. স্মৃতিসত্তার আলোয় মংলা, অঘোরচন্দ্র রায় মজুমদার, (রিয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০) পৃ. ১৩
৩. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশ চন্দ্র মিত্র, (রূপান্তর, খুলনা, ২০০১) পৃ. ৫১৩
সাক্ষাৎকার, সত্যজিৎ রায় মজুমদার, কাইনমারী; মংলা; বাগেরহাট, ৪ মার্চ ২০১৫

www.pathagar.com

লোকসংগীত

১. পটগান

এক সময় মংলা এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তি মেলার কয়েকদিন আগে থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, উঠানের মাটিতে পট চিত্রটি বিছিয়ে পট গান গাওয়া হতো। একজন প্রবীণ গায়ক একটি বাঁকা লাঠি দিয়ে পটের ছবির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই ছবির বিষয়ে গান গাইত। অন্যরা ধুয়া টানত। পটুয়ারা ছবি আঁকত পুরোনো কাপড় অথবা পুরু কাগজের উপর পোড়া মাটি আর তেতুলের বিজের আঠার সংমিশ্রণে রং তৈরি করে। এক একটি ছবি এক একটি বিষয়কে উল্লেখ করে।

সবাই মিলে বাড়ি বাড়ি পট গান পরিবেশন করলে বাড়ির মালিক চাল বা টাকা দিত। তাই দিয়ে সবাই চৈত্র সংক্রান্তির মেলা দেখত। নিচে পুরোনো দিনের পট গানের কিছু নমুনা দেয়া হলো

১.

পট গাই পট গাই
পটের পাইনে দিশা
ধান দেবা না চাল দেবা
কর পরামিশা।
সাত গ্রামের সাত ঘোড়া
পাল্লা বেঁধে গেল
অহিলদ্দির ঘোড়া এসে
কলসি নিয়ে গেল।
ধূয়া-ওরে সোনার চিকদানা
তোর লাগে পাগল হলো
দ্বিজবর বালা।

নড়াইলের হাতিরে ভাই
কুতকুতয়ে চায়
সামনে একটা কলা গাছ পালি
অমনি ভাঙ্গে খায়।

ধূয়া-ওদা যাসনে বিদেশে
কচু বেচে বিয়ে দেব
এই ফাগুন মাসে।

www.pathagar.com

এই বিলের কাছুমরে ভাই
ওই বিলে যায়
তাই দেখে মোল্লা সাহেব
কাছা খুলে দেয়।

ধূয়া-ওরে নাইয়ের সুখের মেয়ে
চাড়ে ভাত পালাম না চায়ে।

আড়ো মংলা দিয়েরে ভাই
কুমির ভাসে যায়
বুড়ো ধুড়ো মানুষ থুয়ে
জোয়ান ধরে খায়।

ধূয়া-ওরে ধার্মিক বিভীষণ
বিপদকালে ডাকিছে তোমায়
শ্রীরাম লক্ষণ

উদয়পুরের আমরে ভাই
এক পিঠ তার কালা
শিগ্গির শিগ্গির বিদায় করো
মাথার পরে বেলা।

২.

পট গাই পট গাই
পটের পাইনে দিশা
ধান দেবা না চাল দেবা
কর পরামিশা।

ওই বাড়ির বুড়িরে ভাই
কত কলবল জানে
বাশের চুঙ্গো দিয়ে বুড়ি
ইন্দুর বন্ধন করে।

ধূয়া-ওরে রসিকের লাঙ্গল
মাটির তলায় যায় না তাহা
পিতলের বন্ধন।

তিন সখি যায় জল আনিতে
মধ্যির সখি কালো
আগের সখির দাঁতে মাজন
ঘাট করিছে আলো।

www.pathagar.com

ধূয়া-ওরে রাবন রাজার মা
তোর সোনার লঙ্কা পুড়ে গেল
চায়ে দেখলি না।

এই বাড়ি ছিলরে এক
মাজা কুজো বুড়ি
ছাগল বানতি নিয়ে গেল
চৌদ্দ বোঝা দড়ি।

ধূয়া- ও যার পতি বিদেশে
সেই নারীর কি পরান জুড়ায়
পবন বাতাসে।

তামাক বনে খলসে মাছ
চালে বান্ধা ঠুসি
বৌদি গেছে বাপের বাড়ি
গাই ধোয়াব কিসি।

ধূয়া- ওরে ময়ূর পঙ্খীর নাও
যে দেশেতে সোনার কন্যা
সেই দেশেতে যাও।

উদয়পুরের আমারে ভাই
এক পিঠ তার কালা
শিন্নির শিন্নির বিদায় করো
মাথার পরে বেলা।

৩.

পট গাই পট গাই
পটের পাইনে দিশা
ধান দেবা না চাল দেবা
কর পরামিশা।

খাট্য খোট্য মিয়ারে ভাই
মুখে চাপা দাড়ি
পাকা ধানে গরু দিয়ে
হুক্কা টানে বাড়ি।

ধূয়া- ওরে ময়ূর পঙ্খীর নাও
যে দেশেতে সোনার কন্যা
সেই দেশেতে যাও।

www.pathagar.com

নিম গাছে টিম টিম
বরই গাছে বাসা
নিমই মুচির ছল হয়েছে
চিংড়ি মাছের খোসা।

ধূয়া- ও যার পতি বিদেশে
সেই নারীর কি পরান জুড়ায়
পবন বাতাসে।

উদয়পুরের আমরে ভাই
এক পিঠ তার কালা
শিগ্গির শিগ্গির বিদায় করো
মাথার পরে বেলা।

বর্তমানে পটগানের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এখন পটের পুরো ছবিগুলিই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তা গণজাগরণের জন্য। সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা আনয়নের জন্য। এখন আর পট গান বাড়ি বাড়ি যেয়ে গাওয়া হয় না। কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে বা যে বিষয়ে পট গান লেখা হয়েছে সে বিষয়টিকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মঞ্চে গাওয়া হয়। একজন মূল গায়েন ছবি দেখিয়ে দেখিয়ে তা ব্যাখ্যা করে গান করে। অন্যরা ধুয়া টানে। লেখার বিষয়কে সামনে রেখে কোনো শিল্পীকে নির্দেশনা দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নেয়া হয় নতুন কাপড়ে সুন্দর রং তুলি দিয়ে। একদল বাদ্যযন্ত্র পটের পেছনে থাকে। হারমোনিয়াম, ঢোল চাকি নিয়ে। এ ধরনের পট গানের পরিকল্পনা করেন চিলা ইউনিয়নের হলদিবুনিয়া গ্রামের সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি তার আয়োজিত বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ১৯৮৫ সালে তার বন্ধু কৃষ্ণদাস অধিকারী এবং অমল কৃষ্ণ সরকারকে বাগদা চাষের কুফল সম্পর্কে একটি পট গান লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে পুরোনো দিনের পটগানের সাথে নতুন আঙ্গিকের এই পট গানও গাওয়া হয়। পরবর্তিকালে এই ধরণের পট গানই চালু হয়ে যায়। রুপান্তর নামক এনজিওটি প্রথম তাদের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে এই পট গানকে ব্যবহার করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই বর্তমানে এই ধরনের পটগানকে ব্যবহার করছে তাদের সচেতনতামূলক কাজে। মংলা উপজেলার কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, রূপান্তর পট গান পরিবেশন করে থাকে।

নিম্নে বর্তমানে গাওয়া হয়ে থাকে এমন কিছু পট গান উল্লেখ করা হলো :

বাগদা চাষের ফলে পট গান

ধূয়া- হারে ও বাগদা চাষের কল
নোনা জলে ধ্বংস হইল সোনার ফসল

www.pathagar.com

১.
পুকুর ভরা মাছ ছিল, গোলা ভরা ধান
গোয়াল ভরা গরু ছিল, পূর্ণ গৃহ খান

২.
কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ছিল, জাম গাছে জাম
লিচু গাছে লিচু ছিল, আম গাছে আম

৩.
ঐ যে দেখ সারি সারি বাগদা ভেসে যায়
নোনা জলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়

৪.
মস্তান দিয়ে মেঝ সাহেব জমি কেড়ে নেয়
চাষীরা সব কেঁদে কেঁদে তার পায় লুটায়

৫.
ঐ যে দেখ বড় সাহেব বড় তাহার ভূড়ি
বাগদা চিংড়ির টাকা দিয়ে দিচ্ছে পাকা বাড়ি

৬.
ব্যাটা গেছে কাজের আশায়, বেটি আছে ঘরে
পোলা পানে খিদের জ্বালায় কেন্দে কেন্দে মরে

৭.
হারীর টাকা পায়না চাষী পায় নারে ফসল
টিপ সহি দিয়ে দিয়ে হারালো সম্বল

৮.
চাষীর ঘরে ভাত নেই করছে হাহাকার
ওয়াপদা দিয়ে রক্ষা করো বাংলাদেশ সরকার।

সুন্দরবনের পটগান

ক.

ওরে সাধের সুন্দরবন
কোন সাধে দয়াল বিধি তোরে করিল সৃজন

১.
ঐ যে দেখ দক্ষিণেতে সুনীলও সাগর
তার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সাধের সুন্দরবন।

২.
গোলপাতা, গেওয়া, গরান বাইন আর সুন্দরী
সাগরে ঢেউ রুখতে তারা অতন্দ্র প্রহরী।

www.pathagar.com

৩.
তরুলতার ডালে ডালে বানর পাখি রয়
মৌমাছিরা এদের সাথে আনন্দে গান গায়।

৪.
সুন্দরবনে জেলেরা সব মাছ ধরিতে যায়
হাঙ্গর কুমির কচ্ছপরা সব চারিপাশে রয়।

৫.
ঐ-যে দেখ দলে দলে হরিণও পালায়
বাঘ মামা গোফ ফুলায়ে তারি পাছে ধায়।

৬.
আর সুনামি, সিডর আইলা যত মরণ বান এলো
সুন্দরবন বুক পাতিয়া আমাদের বাঁচালো।

৭.
এবার দেখ কুড়াল লইয়া যমরাজ এল
সুন্দরী গাছ কেটে কেটে ছাপ করে দিল।

৮.
হরিণ, বানর, শুকর, বাঘ নেই কারো মাপ
শিকারিরা দলে দলে করতেছে সব ছাপ।

৯.
এবার দেখ সুন্দরী গাছের বহর লয়ে যায়
সরকারের নিষেধাজ্ঞা কোথায় পড়ে রয়।

১০.
ওরা নাকি চোর, ভাইরে, ওরা নাকি ডাকাত
ওদের পিছে আছে নাকি, মস্ত কালো হাত।

১১.
বন আমাদের মান, ভাইরে, বন আমাদের প্রাণ
সুন্দরবন ধ্বংস হলে, সবারই মরণ।

১২.
এসো, ভাইরে দলে দলে আন্দোলন গড়ি
সবই মিলে এক হয়ে এই বন রক্ষা করি।

১৩.
এই আসরে আছেন যত জ্ঞানী-গুণী ভাই
শিগ্গির শিগ্গির বিদায় করেন আমরা চলে যাই।

www.pathagar.com

খ.

১.

বি.টি.এন. এর সহায়তায় পট গান গাই
সুন্দরবনের কিছু কথা আমরা বলে যাই॥

২.

বন আমাদের মা ও ভাই, বন আমাদের প্রাণ
বন বাঁচলে আমরা বাঁচব এই করিব পণ॥

৩.

যেভাবেতে বনের ওপর চলছে অত্যাচার
এইভাবেতে চলতে থাকলে বাঁচবে না আর বন॥

৪.

ঝড়, বন্যা, সুনামি আসে যখন ধেয়ে
সুন্দরবন বুক পেতে বাঁচায় সবাইকে॥

৫.

মায়ের কোলে শিশু যেমন থাকে ঘুমিয়ে
সুন্দরবনের ছায়ায় তেমনি থাকি মহা সুখে॥

৬.

ফসল বাঁচনের লাগি বেড়া দেয় লোকে
সেই বেড়ায় খাইলে ফসল কী করিবে লোকে॥

৭.

সুন্দরবন এমনিভাবে ধ্বংস হওয়ার পথে
সচেতন না হলে সবাই যাবে রসাতলে॥

৮.

যাবার আগে সবাইকে এই মিনতি জানাই
সবাই মিলে সুন্দরবনকে ভোট দিন ভাই॥

গ.

সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর পটগান

ওরে সবুজ-শ্যামল সুন্দরবন আমার,
মানবরূপী দানবের থাবায় আজ হইলরে উজাড়।

১.

বাংলাদেশের দক্ষিণেতে বঙ্গোপসাগর,
তার কিনারায় দাঁড়িয়ে ঐ যে সাধের সুন্দরবন।

২.

ঝড়, ঝঞ্জা, বন্যা, প্লাবন যতই আঘাত হানে,
সুন্দরবন ভাই বুক পাতিয়া মোদের রক্ষা করে।

www.pathagar.com

৩.
সুন্দরী গাছ, গেউয়া, গরান, গোলপাতা ও বাইন,
নানা জাতের গাছ-গাছালি বিধাতারই দান।
৪.
প্রাণ বৈচিত্র্যে সৌন্দর্যতে সুন্দরবন অপার,
হরিণ, শুকর, শৃগাল আর ঐ রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
৫.
গাছের ডালে বানর নাচে, পাখি গান গায়,
ফুলে ফুলে মৌমাছিরা নাচিয়া বেড়ায়।
৬.
দলে দলে শুকর, হরিণ বনের মাঝে চরে,
গোঁফ ফুলাইয়া বাঘ মামা ঐ আপন শিকার ধরে।
৭.
বনের মাঝে কত জেলে মাছ ধরিতে যায়,
হাঙ্গরে, কুমির, সর্প, কচ্ছপ তার চারপাশেতে রয়।
৮.
এবার দেখ কুড়াল হাতে দানবেরা যায়,
নির্বিচারে গাছ কেটে ছয়লাব করে নেয়।
৯.
নৌকা ভর্তি সুন্দরী গাছ ঐ যে চালান হয়,
সরকারের নিষেধাজ্ঞা কোথায় পড়ে রয়।
১০.
কাঠ শ্রমজীবী হয়রে চোর ডাকাত,
তাদের পিছে মহাশক্তি গড ফাদারের হাত।
১১.
বন আমাদের ধন, ভাইরে বন আমাদের প্রাণ,
তাই সুন্দরবন আজ ধ্বংস হলে সকলেরই মরণ।
১২.
সবাই মিলে এসো আমরা আন্দোলন গড়ি,
দেশের সম্পদ সুন্দরবনের জীবন রক্ষা করি।

ফাদার রিগনের পট গান

ধূয়া-ও ওরে দেশের সর্বজন
সোনার মানুষ রিগনের কীর্তি শুনো দিয়ে মন

১.
ঐ যে দেখ রিগন জন্ম নিলেন ইটালিতে
বাবা রিচার্ড, মা মনিকা আছে তার পাশে

www.pathagar.com

২.
ঐ যে দেখ ৫৪ তে রিগন বাংলাদেশে
যাত্রার দল গড়লেন তিনি মালগাজীতে
৩.
ঐ যে দেখ, ফাদার রিগন স্কুল গড়েছেন
মহিলাদের জন্য শেলাইকেন্দ্র বানাইছেন
৪. ঐ যে দেখ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান
সেবা আর খাবার দিয়ে বাঁচাইছেন প্রাণ
৫.
ঐ যে দেখ, অনুবাদে নকশি কাঁথার মাঠ
রবী, নজরুল, শরৎ, লালন যায় নাই কেউ বাদ
৬.
ঐ যে দেখ, হলদিবুনিয়ার রবীন্দ্র ভবন
এমনি শত স্কুলে আছে তাঁর অবদান
৭.
ঐ যে দেখ, মানব সেবায় ফাদার রিগন
অন্ন, বস্ত্র, গৃহ দিয়ে বাঁচাইছেন প্রাণ।

এইডস এর পটগান

ওরে দেশের জনগণ
এইডস প্রতিরোধে সবাই হওরে সচেতন
১.
এইডস একটি মরণ ব্যাধি এইচ.আই.ভি নাম
মৃত্যুরূপী দৈত্য ঐ যে ভীষণ আর ভয়াল॥
২.
কারো দেহে এইডস ভাইরাস এলে কোন পথে
দশ বারো বছর পর রোগের প্রকাশ ঘটে॥
৩.
রোগ প্রতিরোধের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়
দেহ রুগ্ন হয়ে নিশ্চিত মরণ পথে ধায়॥
৪.
বিশ্বের শত বিজ্ঞানীদের চেষ্টার শেষ নাই
তবুও রোগটির চিকিৎসাতো আবিস্কার হয় নাই॥
৫.
আফ্রিকা মহাদেশ ছিল সুখেরও আবাস
গাছপালা পশু-পাখি সৌন্দর্য অপার॥

www.pathagar.com

৬.
নাচে গানে মুখর ছিল ঐ যে আফ্রিকা
মরণব্যাধি এইডস আজি ছড়ায় বিভীষিকা॥
৭.
ছেলেমেয়ে অনাথ হয়ে চোখের জলে ভাসে
বাবা মায়ের কবর তারা দিচ্ছে আপন হাতে॥
৮.
মানুষজন শূন্য প্রায় বসত বাড়ি ঘর
এইডস এর মৃত দেহ কে দিবে কবর॥
৯.
সংক্রামিত নর-নারী যৌন মিলন হলে
একজন থেকে অন্যের দেহে এইডস আসে চলে॥
১০.
সব থেকে ঝুঁকি হয়রে সমকামী যারা
এক থেকে অন্যের দেহে এইডস ছড়ায় তারা॥
১১.
আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নেয় যদি কেহ
রক্ত বিনিময়ে এইডস তার রক্তে ছড়াল॥
১২.
গর্ভবতী মা দেখুন ভাইরাসে আক্রান্ত
গর্ভের সন্তান হয়েছে তাই রোগে সংক্রামিত॥
১৩.
সংক্রামিত সুচ-সিরিঞ্জ ডাক্তারী যন্ত্র
অন্যের ব্যবহারে এ রোগ হয় যে সংক্রামিত॥
১৪.
মাদক নিচ্ছে ঐ যে সবাই একই সিরিঞ্জে
ওদেরইতো ঝুঁকি বেশি এইডস সংক্রমনে॥
১৫.
স্বামী-স্ত্রী ছাড়া মিলন করলে পরিহার
এইডস থেকে নিশ্চয় তারা পাইবে পরিত্রানে॥
১৬.
যৌন মিলনেতে কনডম বড়ই নিরাপদ
তার থেকে উত্তম হয় যে সংযমী জীবন॥
১৭.
পরীক্ষিত রক্ত নিলে এইডস নাহি হয়
পরীক্ষিত রক্ত নিলে নিরাপদ যে রয়॥

www.pathagar.com

১৮.
সূচ-সিরিঞ্জ, যন্ত্র-পাতি ব্যবহারের আগে
গরম জলে ফুটিয়ে নিলে এইডস নাহি হবে॥
১৯.
অন টাইম ডিসপোসজেবল সিরিঞ্জ দেখুন ঐ
ব্যবহারে রোগ মুক্ত থাকিবেন সবাই॥
২০.
শিরায় শিরায় মাদক নিতে বিরত থাকুন
সিরিঞ্জ-সূচে মাদক নেওয়া ঝুঁকি যে বহুল॥
২১.
যুব সমাজ মাদক ছাড়, সবার অনুরোধ
সুস্থ সমাজ গড়তে কর এইডস প্রতিরোধ॥
২২.
খেলাধুলা করমর্দন রুগীর সাথে করলে
এইডস কভু ছড়ায় নাতো এক থালায় ভাত খেলে॥
২৩.
হাঁচি কাশি দ্বারা কিংবা মশার কামড়ে
ছড়ায় না তো এই জীবাণু এক পায়খানায় গেলে ॥
২৪.
রোগীর সাথে ঘৃণা নয়, উচিৎ সেবা যত্ন
সেও নিশ্চয় পাবে যত্ন অন্য রুগীর মতো ॥
২৫.
এইডস রোগী সে তো মানুষ আমাদের মতোন
উপেক্ষা না করে তারে ভাবুন আপন জন ॥
২৬.
এইডস বিষয় জানব আর সবাইকে জানব
ভবিষ্যতের প্রজন্মকে এইডস মুক্ত করব ॥
২৭.
সভায় কিংবা এককভাবে পরামর্শ দিয়ে
এইডস মুক্ত সমাজ গড়বো সকলে মিলে ॥
২৮.
সুখী সুন্দর এইডস মুক্ত সমাজ তৈরি হবে
খেলাধূলা হাসি গান মুখরিত রবে ॥

পোলিওর উপর পট গান

ধূয়া : ওরে বাংলার ভাই, মা-বোন,
পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সবাই এগিয়ে আসুন

www.pathagar.com

১.
মায়ের কোলে শিশু যদি পঙ্গু হয়ে যায়
বাপ-মায়ের মন কেমন করে ধৈর্য ধরে রয় ॥
২.
সুস্থ-সবল শিশুরা সব খেলায় মেতে রয়,
পঙ্গু শিশুটি দুঃখে সেদিক চেয়ে রয় ॥
৩.
বিশ্বের যে কয়টি দেশ এখনও পোলিও মুক্ত নয়
দুর্ভাগা এই বাংলাদেশ তার মাঝে রয় ॥
৪.
ঢাক পিটিয়ে ভাইরে ৮টি জাতীয় টিকা দিবস গেল
২০ লক্ষ শিশু তবু পোলিও না খেলো ॥
৫.
আমরা যদি না ভাইরে হই সচেতন
কীভাবে করব দেশকে পোলিও মোচন ॥
৬.
সুন্দর ভবিষ্যৎ যদি সব শিশুর চাই
সময়মত সব শিশুর পোলিও খাওয়া চাই ॥
৭.
পোলিও হলে শিশু ভাইরে পঙ্গু হয়ে যায়
ভেবে দেখুন, বাপ-মায়ের তখন কী দুর্গতি হয় ॥
৮.
তাই ৮ই এপ্রিল আর ১৩ই মে নবম জাতীয় টিকা দিবসে
অসচেতন হয়ে আর কেউ রইবে না ভাই বসে ॥
৯.
৫ বছরের কম বয়সী যত শিশু আছে
নিকটস্থ টিকা কেন্দ্রে তাদের হাজির করবেন এসে ॥
১০.
প্রতি বারে দুই ফোঁটা করে পোলিও খাওয়ানো চাই
পোলিও নির্মূল করতে এর চেয়ে-ভাল উপায় নাই ॥
১১.
সারা দেশে হাজার হাজার কেন্দ্র যে রয়েছে
খুশিমতো খাওয়াতে পারেন সুবিধা বিশেষে ॥
১২.
সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা থাকবে খোলা
এর মাঝে খাওয়াতে হবে-যাবে, নাতো ভোলা ॥

www.pathagar.com

১৩.
শিশু পূর্বে যদি খেয়েও থাকে আবার হবে খেতে
এ কথাটি ভাই বোনদের ভুলে যাবে না কোন মতে ॥

সেন্ট পল্‌স হাই স্কুলের পট গান

১.
বাংলাদেশের দক্ষিণেতে মংলা নদীর বাঁকে,
শেলাবুনে নামে এক অজ পাড়াগাঁয়ে।

২.
দুই দিকে মনলোভা আছে সুন্দরবন,
ষাট মাইল দক্ষিণে ঐ বঙ্গোপসাগর।

৩.
পলি মাটি উর্বর জমিন ধানে মাছে ভরা,
স্কুল-কলেজ লেখা পড়ায় ছিল দৈন্য দশা।

৪.
সেদিন ডেকোরালি নামে ঐ যে ক্যাথলিক ফাদার
বড়ই আশা স্বপ্ন দেখেন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার।

৫.
বিশপ, দান্তে, ফাদার রিগন বড়ই মহৎ প্রাণ,
তাদের কল্যাণ হাতের ছোঁয়ায় বিদ্যালয় নির্মাণ।

৬.
উনিশ শত চুয়ান্নতে বিদ্যালয় সৃজন,
ফাদার ডেকোরালির স্বপ্ন হইল যে পূরণ।

৭.
বাঙ্গাল বাড়ির কুমুদ বাবু দানেতে মহান,
এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি জমি করলেন দান।

৮.
মহান দানে ধন্য ঐতো দেবেন্দ্রনাথ মন্ডল,
আরো একজন দাতাকর্ণ পাঁচুরাম মন্ডল।

৯.
ফাদার রিগন এই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার,
তারপরে ফ্রান্সিস, ব্রুনো, গুলিয়েত্তা আলদো, ম্যালনী ফাদার।

১০.
ব্রেন্নাক্কি, মাথোভি, কার্লো, দামেনিক ফাদার,
বিদেশি এই দশ জন ফাদার ছিলেন হেডমাস্টার।

১১.
মানব-প্রেমি শিক্ষা-ব্রতী ঐযে ফাদার রিগন,
পঞ্চাশ বছর এই দেশেতে সবার আপনজন।

www.pathagar.com

১২.
উনিশ শত আটাত্তরে ফ্রান্সিস সুদান হালদার,
নিয়োগ পেলেন প্রথম দেখুন বাঙ্গালি হেডমাস্টার।
১৩.
নীতি-নিষ্ঠায় দক্ষ হাতে সাতাশ বছর ধরে,
ফ্রান্সিস সুদান নিবেদিত বিদ্যালয়ের তরে।
১৪.
কত গুণি শিক্ষক হেথা শিক্ষকতায় এলেন,
আলোকিত মানুষ তারা উপহার দিলেন।
১৫.
সুকুমার, বনমালা, সুরঞ্জিৎ-জোসেফ
কৃতি ছাত্র-ছাত্রি তারা এই বিদ্যালয়ের।
১৬.
আরো দেখুন, এই স্কুলের গৌরব-সন্তান,
নাজমা, সুলতানা আর দীপঙ্কর, আদনান।
১৭.
সুবর্ণ জয়ন্তীর এই বর্ণময় দিনে,
সবাই আজি মাতোয়ারা পুণর্মিলনে।

কারেন্ট জালের পট গান

১.
হারে ও ওরে কারেন্টের জাল
কে তোরে বানালো ওরে মাছের ধ্বংস কল॥
২.
হাজারো মাছে ভরা এই দেশ ছিল।
রুই, কাতল, কই, পাঙ্গাস, চিতল ও বোয়াল॥
৩.
সাগর, নদী, পুকুর, ডোবা, আর যত খাল
মাছ, খেয়ে সুখে কাটে বাঙালিরও কাল॥
৪.
ঐ যে দেখ, ইলিশ মাছ মাছেরও সেরা
স্বাদে, গন্ধে, রূপ লাবণ্যে মাতালও ধরা।
৫.
নোনা জলে সোনার ফসল বাগদা যার নাম।
বিদেশ থেকে ডলার এনে বাড়ালো দেশের মান॥
৬.
কোথা হতে উড়ে এল কারেন্টের জাল।
নদী খালে ভরে গেল যেন মহাকাল॥

www.pathagar.com

৭.
ছোট পোনা মারে আর ডিমের দফা শেষ।
কারেন্ট জালের কারণে মাছের বংশ শেষ॥

৮.
নদী নালায় মাছ নেই, ক্ষেতে নেই ফসল
জেলে চাষী সকলের ভাঙ্গলরে কপাল॥

২. অষ্টকগান

বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্র মাস। চৈত্র মাসের শেষ দিন চিলা ইউনিয়নের গোড়া খাল গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বসে। এই চৈত্র সংক্রান্তি মেলার সপ্তাহখানেক আগে থেকে অষ্টক গানের দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে অষ্টক গান পরিবেশন করে দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আগে ছেলেমেয়েরা সেজে এই গানের সাথে নাচত। এখন মেয়েরাই অষ্টক গানে অংশ নেয়। সাধারণত ৪ থেকে ৫ জন মেয়ে সামনে থেকে গানের সাথে নাচ পরিবেশন করে। পেছনে একদল বাদ্যযন্ত্রী তাদের সহযোগিতা করে। সব মেয়ে শাড়ি দিয়ে ঘাগরার মতো করে পোশাক পরে। হাতে রুমাল থাকে। রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা নাচে। পায়ে নুপুর থাকে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম, ঢোল, চাকি, আড়বাঁশি ব্যবহৃত হয়। অষ্টক গান শুনে বাড়ির মালিক টাকা-পয়সা, কেউবা কিছু চাল দেয়। এই টাকা ভাগ করে নিয়ে তারা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা দেখতে যায়।

অষ্টক গানের বিষয়বস্তু ধর্মীয় আখ্যান সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই অষ্টক গান নববর্ষ অনুষ্ঠানে বা পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও পরিবেশিত হচ্ছে।

হলদিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘রিগন মেলায়’ হলদিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা অষ্টক গান পরিবেশন করে থাকে।

নিম্নে কয়েকটি অষ্টক গানের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

(১)
কুটিলা কয়, ও দাদা
তোমার গুণের বৌ রাধা
নিধুর বনে কালার সনে
কী কথা কয় ও দাদা।

আমি দেখে এলাম এখুনি
তোমার সেই রাধা রাণী
কালার হাতের বাঁশি লয়ে
করতেছে টানাটানি।

দাদা তোরতো কপাল পুড়েছে
ও বৌ কি আর তোর আছে

www.pathagar.com

আমি যে রকম যা দেখিশুনি
দাদা তোর কপালে যে কী আছে।

(২)

বসন্ত কালে কালা উদ্দ্যপকে পাঠায় গোকূলে
ব্রজের তথ্য জানবে বলে
দেখে বিপাশা ডেকে বলে।
আয়রে, উদ্দ্যপ, ব্রজের দশা দেখ নয়ন মেলে।
ওরে উদ্দ্যপরে ব্রজের শুষ্ক হলো তরুলতা
পশুপক্ষী কয় না কথা
পেয়ে মর্মে ব্যথা রাখালগণ
হ্যাঁ কৃষ্ণ হ্যাঁ কৃষ্ণ বলে করতেছে রোদন।
ওরে উদ্দ্যপরে ঐ দেখ, ধবলী সবলা গাভী
উর্ধ্বমুখে রয় সকলে
তারা হাম্বা রবে ডাকতেছে
যশমতী অচৈতন্য হয়ে ধরাতে আছে।

(৩)

আইছি হাটখোলার বাজারে
নতুন চুরি উঠেছে
বাছে বাছে কেনবো চুড়ি
আয়না বসানে।

চুড়ির মূল্য দশ আনা
গাটি আছে পাঁচ আনা
ওরে চুড়ি দেখে মন মজেছে
পয়সায় হলো না।

চুড়ি দিয়ে আমার হাতে
ও তুই চল আমার সাথে
বাড়ি যায়ে পয়সা দেব
মিনসের কাছের থো॥

(৪)

একদিন ব্রজ গোপীগণ তাড়া করিয়া মনন,
জল খেলিতে যমুনাতীরে সকলে করে গমণ।
তারা বসন খুলে রাখিল, তারা জলে নামিল
সুযোগ পেয়ে নন্দের কানু, বসন চুরি করিল
তারা কুলে উঠিল, বসন দেখতে না পেল

www.pathagar.com

লজ্জা পেয়ে সব গোপিনী বুকে হস্ত বাঁধিল
তারা ইতি উতি চায়, বসন ডালে দেখতে পায়
কদম ডালে নন্দের কানু রাই বলে বাঁশি বাজায়
তারা বিনয় করে কয়, ঠাকুর বসন দেও আমায়
বসন বিনে সব গোপিনীর প্রাণ বাহির হইয়ে যায়

(৫)

ও সই শোন, ললিতে ব্যথা পারি না কইতে।
কানু বিনে এ জীবন আর পারি না ধরিতে॥

কালা কাল আসবে বলে সেই যে গেল চলে
তার আশায় পথ চেয়ে চেয়ে কাল গেল চলে

সই তোরা বলিস কালা, সে যে আমার গলার মালা
ওর বিরহে জ্বলে জ্বলে হয়েছি কালা।

ও আমার জীবন ও যৌবন ও আমার স্বপন।
সে বিনে অভাগীর বাঁচে না জীবন॥

কাঁদে সুখ আর সারী ও তার সরস বিদারী
ধেনু বলে কেঁদে ফেরে বৃন্দাবন আধার হেরি

ঐ দেখ, কুসুমের হাসি বিনে কালার বাঁশি।
লুটায় ধূলা পরে সব হতেছে বাসী॥

ও সই, দোষ দিব কারে, সবই কপালে করে।
আমার কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল সে এল না ফিরে॥

এদিন অমলের নিবেদন ও রাই বিধির লিখন
শত বর্ষ পূর্ণ হলে পাবে নন্দের নন্দন।

(৬)

ও সখিরে, আমি ফুল তুলেছি রাশি রাশি
তোলা ফুল মোর হলো বাসী
আশা পথ চেয়ে মোর পোহালো নিশি।

ও সখিরে, আমি গেথে বনফুলের হার
সকলি বিফল আমার করি নিশিভরি উজগার
কালার মিষ্টি কথা শোনা হলো না আমার।

ও সখিরে আমার কানতে কানতে জনম গেল
না এলো শ্যাম চিকন কালো

www.pathagar.com

আমি কি করি সই তাই বলো
শ্যাম বিচ্ছেদে সখি আমার প্রাণ বাহির হলো॥

(৭)

বিষ্ণু প্রিয়া সুখ সয্যায় পালঙ্কেতে নিদ্রা যায়
ফুলের বিলাস বিছানায়॥
ওরে নিমার শোকে বিষ্ণু প্রিয়ার ঝরে অশ্রুপাত।
বিষ্ণু প্রিয়ার চোখের জল সদয় করে টলমল।
দুঃখে গেল চিরকাল।
আমায় এমন সময় ফেলে গেলি সচির দুলাল॥

৩. প্রধান প্রধান লোকসংগীত

বন্দনা

১.

বন্দি আমি কমলা সরস্বতী বিমলা
আর নমি মাতা গীতাঞ্জলি স্বর্ণবর্ণ অঞ্চলা

২.

তুমি বসো এসে রসনায়, বাজাও গীতি মনবীণায়
আর চিত্ত করো আলোড়িত ঝংকার দিয়ে সেতারায়॥

৩.

তুমি রসনাতে বাদিনী সংগীতে মা নাদিনী
আর কবি দিগের হও সাধিনী তুমি আমার জননী

বসন চুরি

১.

হয়ে হরষিত মন ব্রজের যত গোপীগণ,
তারা আনন্দেতে ধীরে সকলি করে গমণ,

২.

তারা জলে নামিল বসন খুলে রাখিল
আর বসন নিয়ে কৃষ্ণ অমনি কদমডালে উঠিল

৩.

আমরা ধরি তব পায়, প্রভু বসন দাও আমায়
ওই যে গগনেতে বেলা অধিক গৃহকাজের সময় যায়

৪.

যদি বসন নিতে চাও, প্রেমের মাধুর্য দেখাও
আরে সূর্যকে করিয়া প্রণাম বসন লয়ে গৃহে যাও।

www.pathagar.com

৫.
কোথায় ও মা দুঃখহরি, ডাকি তোমায় বারবার
অধমগণে করো দয়া দিয়ে অভয় পদছায়া
ও মা তোমা বিনে গতি নাহি আর॥

৬.
মোরা অতি অভাজন না জানি সাধন-ভজন
না জানি ভক্তি-স্তুতি কৃপা করো মোদের প্রতি
ও মা ঘোর পাষণ্ড তব এ সন্তান॥

৭.
মঙ্গলময়ী মা গো তোমার চরণে এই মিনতি
অসময়ে কোথায় র'লে ডাকি সদা মা মা বলে
ও মা মোরে রেখো ওই রাঙ্গা চরণে॥

৮.
চরণসেবা একদিনও মা করি নাই তোমার
দুষ্টু অতি তব ছেলে তাই বলে কি দিবা ফেলে
ও মা চরণের দাস করো হে তোমার॥

৯.
ভরতের এই বাসনা শোনো ও মা জননী
অন্তিমকালে হে জননী দিয়ো অভয় চরণখানি
আর কাঙাল বলে যেয়ো না ভুলে॥

জগাই-মাধাই উদ্ধার

১.
সত্য যুগে ছিলেন হরি যেথায় রাম ধনুকধারী
দ্বাপরেতে নন্দের ঘরে খেল মাখন চুরি করে
কলিতে গৌরাঙ্গ রূপ ধরে॥

২.
গৌর বলে নিত্যানন্দ নাম দিব সব ঘরে ঘরে।
নাম নিতে কারও নাইকো মানা, নাম দিব তায় দাম নিব না।
দিব পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের কানে।

৩.
হরি নামের ধ্বনি শুনে জগামাধা এল ধেয়ে
মারিল কলসির কাঁধা দুরন্ত সেই কঠোর মাধা
মারল দয়ার সাগর নিতাইর মাথা টেয়ে। >টেয়ে= বরাবর

৪.
নিতাই চাঁদ ঢলিয়া পড়ল গৌরাঙ্গের গলা ধরে।
ভাইরে, আমায় ধর ধর ব্যথায় আমার জীবন গেল,
আরে আর যন্ত্রণা সহিতে না পারি॥

www.pathagar.com

৫.
শ্রী গৌরাঙ্গ ক্রোধভরে বলে কোথায় সুদর্শন
নিতাইর অঙ্গে রুধির ধারা দেখে হলাম ধৈর্যহারা
আরে জগত আমি দিব ছারেখারো॥

৬.
নিতাই বলে ভাইরে, গৌর, শুধাই আমি তোমারে
কথা ছিল তোমার সাথে অস্ত্র না ধরিবে হাতে
আরে বিনা অস্ত্রে জীব করিবে উদ্ধার॥

৭.
নিতাই বলে ভাইরে, জগাই স্নান করে আয় গঙ্গাজলে
হরে কৃষ্ণ হরি বলে নাম দিব তোর কর্ণমূলে,
আরে জগাই মাধাই হইল উদ্ধার ॥

৮.
হনু বলে, মাগো, আমি করি পদে নিবেদন >হনু = হনুমান>
কোথায় তোমার রামধন, লক্ষণ, কোথায় ভরত শত্রুঘন >শত্রুঘ্ন
ও তারা কিসের বাণে হয়েছে নিধন॥

৯.
কী কথা শুনালি হনু আর বার বল শুনিরে
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মোর বুকে হানিল আঘাত
আমায় চলো লয়ে কোথায় রঘুমণি।

১০.
পুত্র হয়ে শত্রু হলি বিধবা করলি আমায়
হাতের কঙ্কন সিঁথির সিন্দুর বঞ্চিত করলি মোরে
আরে এই কীরে ছিল তোদের মনে।

১১.
রাক্ষস বংশ করে ধ্বংস ও রামরঘুমনি রে
শিশুর যুদ্ধে প্রাণ হারালি অনন্ত শয্যায় ঘুমালি
আরে এই কী ছিল আমারও কপালে॥

নিমাই সন্ন্যাস

১.
সুখের নিশি প্রভাতকালে কোকিল ডাকে অকালে,
ডাকে কোকিল কুহু বলে, বিষ্ণুপিয়ে মুখে বলে, > বিষ্ণুপিয়ে= বিষ্ণুপ্রিয়া
আরে সন্ন্যাসেতে চলিল নিমাই।

২.
ওঠ ওঠ ওগো প্রিয়ে, নয়ন মেলে চাও রে,
তোমায় ছেড়ে চল্লেম আমি, আমায় ভুলে যেয়ো তুমি,
আরে আমার মাকে করিয়ো যতন॥

www.pathagar.com

৩.
শচীর মন্দিরে গিয়ে বলে, ওগো জননী,
ঘরের আগুন বিষ্ণুপ্রিয়া রেখে যাই মা জ্বালাইয়া
আরে সেই আগুনে মরিবি পুড়িয়া॥
৪.
নিদ্রা ত্যাগি বিষ্ণুপ্রিয়া দুনয়ন মেলিল,
পালঙ্কেতে বুলায়ে হাত শিরে হানে করাঘাত,
প্রাণনাথ বলে কান্দিয়া উঠিল॥
৫.
এই যে প্রভুর পায়ের নূপুর আর গলের চন্দ্রহার,
প্রভু আমার যাবার কালে নূপুর কেন বাজিল নারে,
আরে ছিলি নারে প্রভুর যুগল পদে॥
৬.
ইন্দ্রজিৎ পড়িল রণে শুনে লংকার দশানন
পুত্র শোকানলে জ্বলে, শক্তিশেল বাণ হাত তুলে
আরে রণক্ষেত্রে করিল গমন
৭.
রণক্ষেত্রে রাবণ রাজা ক্রোধে চারদিকে চায়
লক্ষণকে করিয়া দৃষ্টি ময়দানরের শেল সৃষ্টি
আরে শক্তিশেল বাণ ধনুকে যোগায় ॥
৮.
রাবণ মারে শক্তিশেল লক্ষণের বক্ষেতে
হা দাদা হা দাদা বলে ভূমিতে পড়িল ঢলে,
আরে ছুটিয়া আসিল রঘুনাথ।
৯.
রঘুনাথ বিনয় করে শক্তিশেলকে কেন্দে কয়
লক্ষণকে করিয়া রক্ষে পড় এসে আমার বক্ষে,
আরে আমার ভাইয়ের জীবন ভিক্ষা দাও,
১০.
শক্তি বলে কাতর স্বরে, শুনো, প্রভু রঘুনাথ
আমি যাকে আনব লক্ষ্যে, পড়ব নারে অন্যের বক্ষে
আরে আজি আমি রাবণ আজ্ঞা পালন করি॥

কুঞ্জলীলা

১.
একদিনে শ্যাম কদমডালে রাই বলে বাঁশি বাজায়
শুনিয়া সেই বাঁশির ধ্বনি পাগল হলো বিনোদিনী,
আরে কলসি লয়ে ত্বরা চলে যায়॥

www.pathagar.com

২.

ছল করে যায় জল আনিতে কাখের কলসি লয়ে হাতে
সর ভাজিয়ে খোঁপায় গুজে বন্ধুর লাগি লয়ে যায় >সর= দুধের সর
ছল করে যায় জল আনিতে কাখের কলসি লয়ে হাতে
আরে কলসি থুয়ে কদম তলা যায়॥

৩.

কুটিলা যায় পিছু পিছু আড়াল হতে দেখতে পায়
ননী দিল কৃষ্ণের হাতে দেখিল সে আড়াল হতে,
আরে গৃহে আসি আয়ানকে শুধায়॥

৪.

শুনো শুনো আয়ান দাদা আজ আমি বলি তোমায়
রাইকে দিয়ো করে মানা একা যেন ঘাটে যায় না
আরে ননী নিয়ে কৃষ্ণকে খাওয়ায়॥

লক্ষণ শক্তিশেল

১.

ওরে লক্ষণ পড়ল শক্তি শেলে কেন্দে রাম বলে
ও তুই আয় রে, লক্ষণ করি কোলে একবার
ডাক রে দাদা বলে, হিয়া যায় জ্বলে
ভাই, তুই বিনে আর কারে করি কোলে

২.

ওঠ ওঠ ভাই রে লক্ষণ একবার কথা কও
ও তোমার অভাগা রাম দাদা ডাকে একবার
নয়ন মেলে চাও। আমার প্রাণ জুড়াও
ও ভাই রে, আমায় ফেলে একলা কোথা যাও।

৩.

ও তুই আর কান্দিস না উহু বলে ওরে
লক্ষণ ভাই, ও তোর কান্না দেখে তরুলতা
ভাই রে, সবাই ছাড়ে হাই, আমি কোথায় যাই॥

৪.

ওরে সীতা গেলে সীতা পাব সীতার
অভাব নাই, ওরে গুণের ভাই
লক্ষণ মরিলে আমি কারে বলব ভাই
সীতার কার্য নাই,
চলো আমরা দুভাই দেশে চলে যাই।

www.pathagar.com

১.
কেন্দে কেন্দে বিনোদিনী বৃন্দে দূতির কাছে কয়
শোন রে বৃন্দে, বলি তোরে, এনে দে মোর প্রাণ বন্ধুরে,
আরে বন্ধু বিনে জীবন আমার যায়॥
২.
আজ যাব কাল আসব বলে আশা দিয়ে চলে যায়
আশায় আশায় দিন ফুরাল প্রাণবন্ধু আর না আসিল
আরে আর কত দিন থাকব তার আশায়॥
৩.
সারা নিশি একাকিনী গেঁথেছি ফুলের মালা
কুঞ্জেতে এল না কালা বাসি হলো গাঁথা মালা
আরে গাঁথা মালা দিব কার গলায়॥

১.
কেন্দে বৃষকেতু কয়, কোথায় হরি দয়াময়
ওরে অতীত বেসে ব্রাহ্মণ এসে আমার মাংস খেতে চায়
২.
মাতা-পিতা দুই জনে আমার মুণ্ড ছেদনে,
ওরে করাত ধরে দাঁড়াইল, ধারা বয় দুনয়নে,
৩.
কোথায় খেলার সাথীগণ, আমার যায় বুঝি জীবন
ওরে অন্তিমকালে কর্ণমূলে দিয়ো সুধা-সংকীর্তন॥

১
একাকিনী সীতা সতী সুরুজ নদীর পাশ
লক্ষণেরে লক্ষ করে জানকী কয় ধীরে ধীরে
আরে লক্ষণ আমায় দিলি বনবাস॥
২.
এই করিবি লক্ষণ আমায় আগে যদি জানিতাম
বিদায় নিতাম প্রভুর পদে এ জনমের কান্না কেঁদে
আরে জন্মের মতো দেখে আসিতাম॥
৩.
তারে কত ভালোবাসি বলা তো আর হলো না
সে আমার প্রাণপাখি হৃদয়ের মাঝে রাখি
আরে সাধনের ধন আমার জীবন সাথী॥
৪.
জানকীরে রেখে লক্ষণ ফিরে এল অযোধ্যায়
কান্দে সীতা প্রভু বলে বাল্মীকির তপোবনে
আরে সাথের সাথী সঙ্গে কেহ নাই॥

www.pathagar.com

নৌকা বিলাস

১.

যমুনাতে নাবিক সেজে শ্রীকৃষ্ণ বংশিধারী
ব্রজের যত গোপনারী চলে তারা সারি সারি।
দুধের পসরা মাথায় করি॥

২.

শুনো, শুনো, ওগো নাবিক, বলি যে তোমারে
যাব আমরা মধুপুরি নায় করে দায় তাড়াতাড়ি। > মধুপুরি= মথুরা বোঝাতে
বেলা অধিক হইল গগনে।

৩.

নাবিক বলে শুনো ওগো, ব্রজের যত সখীগণ
যাবে তোমরা মধুপুরী বদলে দাও হে পারের কড়ি
তবে সখি এসো আমার নায়।

৪.

নৌকাতে উঠাইয়া নাবিক বৈঠা দেয় সখীর হাতে
নদীতে উঠিছে তুফান জোর করিয়া মারো হে টান
যাবে যদি নদীর ওপার॥

৫.

কালা বলে তুফান দেখে উড়িল রাধিকার প্রাণ
নীল শাড়ি আজ খুলতে হবে নইলে তরী ডুবে যাবে
মাঝ দরিয়ায় ডুবল তরীখান॥

৬.

শ্রীমতী কয়, কেন্দে কেন্দে শুনো হে বংশিধারী
হেরে যমুনার মাধুর্য তোমার মনে কী চাতুর্য
ইহা কিছু বুঝিতে না পারি॥

৭.

কৃষ্ণ বলে শুনো ওহে, প্রেমরূপা রাই কিশোরী
যমুনার জলতরঙ্গ আমার মনে প্রেমতরঙ্গ
এসো নৌকাতে বসিয়া বিহার করি॥

৮.

কেন্দে কেন্দে শ্রীমতি কয় শুন হে বংশীধারী
তোমায় দিব জাতি-কুল বেয়ে চলো নদীর কূল
এ যৌবন তোমায় করব দান॥

৯.

রাধা কৃষ্ণের মিলন হলো মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

www.pathagar.com

চণ্ডীদাস আর রজকিনী

১.

একদিন কাপড় হাতে রজকিনী যায় যমুনার তীরে
ধীরে ধীরে যাত্রা করে গুনগুন স্বরে কীর্তন করে
কাপড় কাঁচে ঘাটেতে বসিয়া

২.

তখন বড়শি হাতে চণ্ডীদাস যায় যমুনার কূলে
বড়শি ফেলে যমুনাতে চেয়ে থাকে অপর দিকে
রজকিনীর প্রথম দেখা হলো॥

৩.

শুনো শুনো ওগো ঠাকুর, নিবেদী চরণে
তোমার হাতে ছিপ আর বঁশি কি মাছ ধর দিবানিশি > বঁশিঃ=বড়শি
কও না কথা কিবা অভিমান॥

৪.

তুমি শুনো, ধনি রজকিনী রজকের মেয়ে
বার বৎসর বাইলাম বঁশি পেলাম মাত্র একটি খুঁটি
চণ্ডীদাসের প্রথম কথা হলো॥

৫.

তুমি শুনো, ধনি রজকিনী রজকের মেয়ে
তোমার লাগি বঁশি বাওয়া তোমার লাগি মালা গাঁথা
চণ্ডীদাসের যুগল মিলন হলো॥

১.

দেখলে পুতুল পুষ্করিনীর কূল মনের মানুষ মনোময়
সে মানুষের দরশনে পূর্ণ প্রেমের পরশ আনে,
পরশনে তাপিত প্রাণ জুড়ায়

২.

ভুবন মোহন রূপের ছবি জীবনে আর দেখিস নাই
দেখবি যদি আয় গো তোরা চির দুখির পূণ্য পায়
চল গো, আমরা চরণে লুটাই॥

৩.

দেখবি যদি আয় গো তোরা, পুকুর ঘাটে চল গো চল
যেতে হবে চুপে চুপে পায়ের নূপুর চেপে চেপে
আর ভরা কলসির ঢেলে ফেলাও জল।

১.

ও... বেলা দ্বিপ্রহর কালে বাঁশি বাজল রাই বলে
ওরে প্রাণ খুলিয়া শুনতে পাই না তখন আমি পাকশালে

www.pathagar.com

২.
একে ননদীর জ্বালা, তা তো বোঝে না কালা
ওরে নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি বসে ওই কদমতলা
৩.
ও কালার বাঁশির সুরে প্রাণ রয় না যে ঘরে,
ওরে ছল করে যাই জল আনিতে প্রেম যমুনার তীরে॥

১.
কেন্দে কয় সীতা, সতী শুনো, হে রঘুপতি
বিনা দোষে বনবাসে দিও না প্রাণপতি।
২.
আমি নারী অবলা প্রাণে সহে না জ্বালা
কেমন করে বেঁচে থাকব আমি একেলা
৩.
নব যৌবনের কালে বিধি এই কী লিখিলে
সুখের সময় সুখ হলো না বুঝি আমার কপালে
৪.
নারী অবলা জাতি করি এই মিনতি
যুগে যুগে তব পদে থাকে যেন আমার মতি॥

১.
রাধে বলে বৃন্দে সই মনের দুঃখ কারে কই
আমায় ফাঁকি দিয়ে গেছে চলে, চেয়ে দেখো কালা ওই।
২.
চূঁড়ায় ময়ূরের পাখা উড়ে যায় ভঙ্গি বাঁকা
আমি মনে ভাবি আমায় বুঝি দিবে না দেখা
৩.
সখী, দেখ চাহিয়ে দাঁড়িয়ে ওই যে কালিয়ে
হয়ে বাঁকা প্রাণ সখা মাথায় চূড়া লাগিয়ে
৪.
অধম কৈলাসের বাসনা চরণ দাও ফেলে সোনা
আমার মনের কষ্ট নষ্ট হবে যাবে মনের বেদনা।

১.
একদিন বসে বিকালে
মিলে পাড়ার মেয়ে সকলে,
তারা সবে করে কানাকানি কার কবে হবে বিয়ে।

www.pathagar.com

২.
একজন বলে দিদি লো
বুঝি তোর কপাল ভালো
আর তোর জন্য এক বর এসেছে বরণ তার চিকন কালো
৩.
যাবি শ্বশুর বাড়িতে, থাকবি নব যৌবন রসে,
ওরে দেওরা, ননদ এসে তোরে সাজাবে যতন করে
৪.
দিবে হাতে তাবিজ আর মল রূপে করিবে টলমল
ওরে কানে দিবে কান মাকড়ি, রূপে করবে ঝলমল।

১.
শ্রী গৌরাঙ্গ শচীর নন্দন করল লীলা অবসান
শ্রী চৈতন্য ভাগবতে সন্ন্যাস অধ্যায় মতে
যশোমন্ত সূত হলেন ভগবান॥
২.
মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি শেষ লীলা মোর চমৎকার
ঈশান কোনে জন্ম নিব পাপীতাপী উদ্ধারিব
কলির জীরের নাই ভাবনা আর॥
৩.
ওড়াকান্দি অবতীর্ণ শ্রী হরিচাঁদ মনোময়
সাঙ্গোপাঙ্গ করে সঙ্গে, প্রভু আমার প্রেমতরঙ্গে
পূর্ববঙ্গে হরি নাম বিলায়॥
৪.
গোলক তারক মহানন্দ মৃত্যুঞ্জয় আর হীরামন
এরা যদি মনে করে ব্রহ্মাণ্ড তরতে পারে
করতে পারে অসাধ্য সাধন
৫.
বর্তমানে প্রমথ চাঁদ ঠাকুর রূপে পাওয়া যায়
ছাড়িয়া ধাম ওড়াকান্দি প্রভু আমার কান্দি কান্দি
ঠাকুরনগর হইল উদয়॥

পাষাণ উদ্ধার

১.
গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণী হয়
এই অভিশাপ দিলাম আমি, পাষাণ হয়ে থাকবে তুমি।
আমার শাপও না হবে মোচন।

www.pathagar.com

২.
অহল্যা কয় কেন্দে কেন্দে ধরিয়া গৌতমের পায়
অভিশাপ দিলে তুমি পাষাণ হয়ে থাকব আমি
কত দিনে হইবে শাপ মোচন॥
৩.
ত্রেতা যুগে শ্রীরাম লক্ষণ দশরথের ঘরেতে।
বিশ্বামিত্র মুনির সাথে যাবে রাম মিথিলাতে
তব পাষাণ হইবে মানবী॥
৪.
অহল্যার পুত্র ছিল সদানন্দ নাম তাহার
করিতে শাপ মায়ের মোচন করিল সে কঠোর সাধন
যোগমায়াকে করিল সাক্ষাৎ॥
৫.
সতী নন্দের সাধনায় যোগমায়া হইল সদয়
একটি যোগ দাও হে, ভিক্ষা করো আমার জীবন রক্ষা
সত্যের পরে ত্রেতা যুগ হয়॥
৬.
ত্রেতা যুগে শ্রীরাম লক্ষণ দশরথের ঘরেতে
বিশ্বামিত্র মুনির সাথে চলিল রাম মিথিলাতে
মুনির সাথে করিল গমণ॥
৭.
মুনির সাথে শ্রীরাম লক্ষণ মিথিলাতে যায় ওরে,
নৃত্য করে পাষাণ ঘিরে চরণধূলা পড়ল শিরে
পাষাণ হইল মানবী॥

সীতার বনবাস

১.
লক্ষণ শ্রীরামের আজ্ঞায় অতি কঠিন হৃদয়
পঞ্চ মাসের গর্ভ সীতা লক্ষণ বনে দিতে যায়॥
২.
গিয়ে বাল্মীকির বন সীতা ঘুমে অচেতন
জাগো জাগো মা জানকী, ডাকিছে ঠাকুর লক্ষণ,
৩.
মাগো, শেষের দরশন পদে করি নিবেদন
মানব হয়ে এই করিলাম শুধু দাসত্বের বরণ
৪.
দেখা হয় কি না হয়, আর পদে মিনতি আমার
অভাগা লক্ষণের ভবে জনম যেন না হয় আর॥

www.pathagar.com

১.
ডেকে বড় কর্তা কয়, হরি রহিলে কোথায়
ওরে আখালের বড় গাভী অসুখে যে মারা যায়,
২.
শুনে হরি দয়াময় ইশারায় হীরামনকে কয়
ওরে, ওঠ বলে চাপড় মারে ওই না গাভীটির গায়। >চাপড়= থাপড় মারা
৩.
ঠাকুরের আদেশ পেয়ে হীরা চলিল ধেয়ে
ওরে মরা গাভী চাপড় মেরে দিল বাড়ি ফিরে গিয়ে
৪.
শুনে বড় কর্তা কয় হরিদাস বলি যে তোমায়
ওরে তোমার মতো ভাই যেন যুগে যুগে আসে ধরায়।

শিবের বিয়ের

১.
বীণা হাতে নারদ মুনি চলল গিরিরাজ ভবন
ধীরে ধীরে যাত্রা করে গুণগুণ করে কীর্তন করে
আর বীণাতে ধরে মধুর তান।
২.
শুনো, শুনো, দক্ষরাজা, বলি যে তোমারে রে
তোমার এক কন্যা আছে বিয়ে দিবা কার সনে,
আর কে হইবে গৌরীর বিয়ার বর॥
৩.
শুনো, শুনো, ওগো রাজা, নিবেদি চরণে
হর-পার্বতীর মিলন হবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে
আর শিব হইবে গৌরীর বিয়ার বর॥

অভিমন্যু বধ

১.
কুরুসনে পাণ্ডবগণে রণসাজে সাজিল
অর্জুন পুত্র অভিমন্যু ধর্মের অজ্ঞায় যুদ্ধে মগ্ন,
ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল।
২.
ঘিরেছে আজ সপ্তরথী ব্যূহচক্রের মধ্যেতে
ছাড়ে বাণ অবিরত আর বাণও সহিবে কত
দেহ জরজর বাণেরই আঘাতে॥

www.pathagar.com

৩.
বিপদে পড়িয়া অভি কাতরে ডাকে তারে,
দ্বার ছেড়ে দে, ওহে দ্বারি, দ্বারি রে, তোর পায়ে ধরি,
যাব আমি ব্যূহের বাহিরে॥
৪.
কোথায় আমার মধ্যম পাণ্ডব, কোথায় পিতা ধনঞ্জয়,
ব্যূহমধ্যে যায় বুঝি জীবন॥
৫.
আগম জেনে যুদ্ধে আসি নিগম নাহি জানি রে
কোথায় বলো প্রাণ উত্তরা, অস্ত গেল নয়নতারা
বিধি তোমায় বৈমুখ করিল॥
৬.
কোথায় মাতা, কোথায় পিতা, কোথায় খেলার সাথীগণ,
আমি চল্লেম নিজ দেশে মা বেড়াবে পাগল বেশে
তোমরা সবে করিও যতন॥

১.
শ্রীধাম ওড়াকন্দিতে তথা যায় ছত্রিশ জাতে
যার যেমন মন সে পায় তেমন
বঞ্চিত না হয় প্রসাদে॥
২.
যত ভক্ত শুকসারি সরে যায় সারি সারি
হরি বলে ডাঙ্কা মারে লাল নিশান করে ধরি॥ > ডাঙ্কা=ডঙ্কা
৩.
জগদীশ গুণনিধি করলেন কামনা নদী,
সেই নদীতে স্নান করিলে বাসনা পুরায় বিধি॥
৪.
গোঁসাই তারক চন্দ্র কয়, ধামে যাওয়া বড় দায়,
অশ্বিনী ভুলিল মায় ওই খেদেতে প্রাণ যায়॥

১.
চণ্ডীদাস আর রজকিনী তারা প্রেমের মহাজন
তারা প্রেমসাগরে সাঁতার খেলায় গো দেখায় প্রেমের নিদর্শন॥
২.
এ দিকেতে রজকিনী ও সে কাপড় কাচতেছে
চণ্ডী ঠাকুর মনের সাধে গো বঁশি দেয় জলে ফেলে॥
৩.
বারো বৎসর বাইলাম বঁশি আমি বসে নিরালায়
যদি প্রেম সাগরে মাছ থাকত গো তবে প্রেমের খোট দিত॥

www.pathagar.com

৪.
একে আমার নবযৌবন তাহে জোয়ারের জল
যদি প্রেমসাগরে বাঁধন পড়ে গো করে কল কল॥
৫.
সারা জীবন বাইলাম বঁশি আমি বসে নিরালায়,
আজি প্রেমসাগরের প্রেমের মাছে গো, প্রেমের খোট দিল আমায়॥
৬.
দীর্ঘ দিনের বঁশি-সুতায় আমায় অঙ্গে হানে বাণ
মোদের ভালোবাসা নির্মল হলো গো, পদে রাখবেন ভগবান॥

সিন্ধু বধ

১.
রজনী দ্বিপ্রহর কালে অন্ধ মুণি কেন্দে কয়,
কোথায় র'লে ও বাপ, সিন্ধু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচাও বিন্দু,
জল বিহনে আমার প্রাণ যায়॥
২.
অমনি পিতার আদেশ পেয়ে সিন্ধু যায় জল আনিতে
জল পুরিতে কলসিতে শব্দ পেয়ে দশরথে
শব্দভেদী করিল সন্ধান
৩.
বজ্রসম শব্দভেদী সিন্ধুর বুকে বিঁধিল
হা মাতা, হা পিতা বলে ধরাতে পড়িল ঢলে
ছুটিয়া আসিল দশরথ॥
৪.
সিন্ধু বলে কাতর স্বরে কে বাণ মারিলি আমায়
বাণাঘাতে জীবন গেল জল পিপাসায় পিতা ম'ল
জল খুঁজিয়া বাঁচাও পিতার প্রাণ॥
৫.
সিন্ধু মুণির বাক্য শুনি জল লয়ে যায় দশরথ
পায়ের শব্দ শনে মুনি, বলে আইছ বাপ সিন্ধুমনি,
জল দিয়া বাপ বাঁচাও জীবন॥
৬.
রাজা বলে, শুনো মুনি, আমি তোমার পুত্র নই,
অযোদ্ধাতে আমার বাড়ি দশরথ নামটি ধরি,
আমার বাণে সিন্ধু প্রাণ ত্যাজিল॥

www.pathagar.com

৭.
মুণি বলে দশরথ, কী কথা শুনালি রে,
পুত্রশোকে গেলাম মারা তুই হবি বাসি মরা
চারটি পুত্র থাকতে বর্তমানে॥
৮.
দশরথ বলে ওগো মুণি শাপ দিলে না দিলে বর,
আমি হলেম পুত্র ছাড়া কেমনে হব বাসি মরা
পুত্র সন্তান আমার যে নাই॥

বিশ্বনাথের প্রাণ ফিরে পাওয়া

১.
বিসূচিকায় বিশ্বনাথ ধূলায় গড়াগড়ি যায়
কান্দে বিশ্বের মা জননী শিরে করাঘাত হানি
রবি রতন ছাড়িল আমায়
২.
কোথা যাব, কী করিব, দাঁড়াইব কার ছায়ায়
কে ডাকিবে মা মা বলে, কারে তুলে লব কোলে > লব= নেব
কোথায় রইলে হরি দয়াময়॥
৩.
সংবাদ পেয়ে শ্রীহরি চাঁদ বিশ্বের বাড়ি ছুটে যায়
দেখে বিশ্বের মা-বাবা পাষাণে ভাঙে মাথা
দুনয়নে ধারা বয়ে যায়॥
৪.
দেখ না, হরি গেল ছাড়ি হরিবোলা পাখি তোর
ভেঙে গেল সুখের মেলা কারে লয়ে খেলবি খেলা
আর তো প্রাণে সহে নারে মোর॥
৫.
হরি বলে, হরি, তখন বিশ্বের করে ধরিল
কী ঘুমে তুই ঘুমাস রে ভাই, চল সবে গোষ্ঠেতে যাই,
গোঠের বেলা অধিক হয়ে গেল॥
৬.
বিশ্বনাথের হাতে ধরি গোঠে গেল শ্রীহরি চাঁদ
রাখালগণে সবে মিলি দিচ্ছে তারা করতালি
ওরা ফিরে পেল আকাশের চাঁদ॥

১.
পার করো, পার করো রে শ্যামরায়,
আমি যাইব সেই মথুরায়
দধি-দুগ্ধ বেচা-কেনার সময় বয়ে যায়॥

www.pathagar.com

২.
ওঠ ওঠ ওঠ রে সখীগণ, গাছের বাতা ধরে
আমি মাঝি পাছা নৌকায় বাই ধীরে ধীরে।
৩.
কতক দূরে যেয়ে রে শ্যামরায়
ও সে কেমন কেমন কথা কয়
আমায় পার করে না বিপদ ঘটায় আমার মনে সন্দ হয় > সন্দ= সন্দেহ
৪.
ধরো ধরো ধরো রে শ্যামরায়, আমার দেহতরী ডুবে যায়
মদন রাজার প্রেমতরঙ্গে আমার প্রাণ যায়॥

১.
কোকিল ডাকিস নারে আর, এল বসন্তের বাহার
সুখ-বসন্ত সুখের কালে প্রাণের বন্ধু নাই রে যার
২.
বন্ধু হইছে দেশান্তর, আমার ভাঙল আশার ঘর
আমার আশায় আশায় জনম গেল বন্ধু না আসিল আর
৩.
প্রাণের বন্ধু বিহনে নারীর নব যৌবনে
কত কথা ওঠে মনে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে॥
৪.
বন্ধু, মুক্তা মালার হার গলে পরলেম না রে আর
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল সুখ বুঝি হবে না আর॥

শিবের বিয়ে

১.
আমার শিব ঠাকুরের আগমণ
দেখতে এল ভক্তগণ
আসন লয়ে ফেরে বাড়ি বাড়ি
শিব বসিয়া আসন পরে আনন্দ বিরাজ করে
দেখে তুষ্ট যত নরনারী।
২.
শিব শিঙা ডুমুর লয়ে হাতে > ডুমুর= ডমরু
নাচিয়া গাহিয়া ফেরে
আরো মদ খেয়ে মাতালও ত্রিপুরারী।
শিবের শিঙায় বলে রাম, রাম,
মুখে বলে দুর্গা নাম
ডম্বুরাতে বলে হরি, হরি।

www.pathagar.com

৪.
শিবের নন্দী-ভৃগি তাল-বেতাল
ভূত-প্রেত মহাকাল
আরে দানব দৈত্য নাচে অগণন।
বাজে ঢাকঢোল তবলা কাঁসি
সারেগাম বীণা বাঁশি
বাদ্যযন্ত্র বাজিল বাজন।
৫.
আমার ক্ষেপা শিবের ভিক্ষা দাও
সকলেতে সুখে রও
বদন ভরে বলো, হরি, হরি।
ভবনদীর তুফান ভারি
বেয়ে চলো দেহতরী
আরে শ্রীগুরুকে করো কাণ্ডারী।

হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য দান

১.
শুনো সবে মন দিয়ে
হরিশ্চন্দ্রের দানের ক্রিয়ে
বিশ্বমাতার দৃশ্য রামায়ণ।
রাজা দান করে সেই বিশ্বামিত্রে
রাজ্য ছেয়ে ভার্জা-পুত্রে
বিক্রয় হলো দক্ষিণার কারণ।
২.
আযোধ্যার নরপতি
শুনো সবে তার দুর্গতি
দুঃখে অতি চণ্ডাল গৃহে থাকে।
রাজা নিশি জেগে নীরব রাতে
পাহারা দেয় শ্মশানেতে
অষ্ট কড়া মরার কড়ি রাখে।
৩.
কত সুখে রাজা-রানী
হয়ে পথের কাঙালিনী
পরগৃহিণী পর গৃহ বাসে।
যার শয্যা পালঙ্ক পরে
মৃত্তিকাতে শয়ন করে
কোলে করে পুত্র রোহিদাসে।

www.pathagar.com

৪.

এক দিন রানীর কোল হইতে
রোহিদাস যায় ফুল তুলিতে
ফুল বনেতে প্রভাতে প্রশিল। > প্রশিল= প্রবেশ করল
যখন হস্ত দিল ফুলের পরে
কালনাগিণী ফণা ধরে
ঘুরিয়ে হস্ত মস্তকে দংশিল।

৫.

যখন শিশুর কোমল অঙ্গে
দংশিলরে কাল ভুজঙ্গে
বিহঙ্গে পতঙ্গে দেখে কাঁদে।
শিশু ঢলে পড়ে বলে, উহু!
কোকিল কাঁদে কুহু কুহু
যেন রাহু গ্রাসিল চাঁদে।

৬.

পুত্রের বিলম্ব দেখে রানী
বলে হলো কীরে,
প্রভাতে মোর গেছে যাদুমনি।
যার কথা তার জাগে মনে
রোহিদাসের অন্বেষণে
চলল যেন বনপোড়া হরিণী।

৭.

রানি তখন অমনি ধেয়ে
পুত্রের বদন নীরক্ষিয়ে
মূর্ছা হয়ে পাষাণে দেয়া মাথা।
যা দেখিলাম নিশির শেষে
তাই হলো রে কপাল দোষে
করলি কীরে দারুণ বিধাতা।

৮.

ওরে অভাগিনীর শিশু
দেখে কান্দে বনের পশু
দুঃখিনী যে পথের কাঙালিনী।
তারে দংশিলি রে কোন পারাণে
আমি দিতাম বক্ষ পেতে
দেখে যা রে নিদারুণ ও ফণী।

www.pathagar.com

৯.

বেদের বিচার এমনি ধারা
রাজ্য হারা, পতি হারা
পুত্র হারা হলেম অবশেষে।
আমার কত দুঃখের রতনমণি
দংশিল রে কাল ভুজঙ্গিনী
তনুখানি জ্বর জ্বর বিষে।

১০.

বাপধন, তুই বল রে কথা,
আমি যে তোর দুখিনি মাতা
দুখের চিতা বুকে জ্বেলে দিলি।
আমার স্তনের দুধ রইল যত
চিতানলে দিয়ে ঘৃত
জন্মের মতো বিদায় হয়ে গেলি।

১১.

তুই মরলি বাপ কমল বনে
বাবা মরবে মরণ শুনে
আমি মরব তোদের শোকানলে।
আমার মনেতে মানে না ধৈর্য
আশু সূর্যকূল পূজ্য
কার্য কী হলো রাজ্য দানে।

১২.

কালী বলে মনে জ্বালা
অতুল রসে পুতুল খেলা
বাতুল ভিন্ন অন্য কে বা জানে।
হবে, খেলার শেষে সাবাস দৃশ্য
এই অভিনয় যার রহস্য
প্রণমি তার শ্রীপদ পঙ্কজে।

উত্তরা কাণ্ড

১.

বাল্মীকির উত্তরা কাণ্ড এ ভূখণ্ড চিত্ত পটে আঁকা, যিনি রাম অখিলের পিতা
বনবাসে তার সীতা নির্বাসিতা, গাছের বাকল পরা।

২.

সেই দুঃখিনী সীতার পুত্র শুনো, সবে তার চরিত্র,
পিতা-পুত্রে যুদ্ধ আরম্ভিল

www.pathagar.com

বাল্মীকির তপোবনে শিশু লব-কুশির সনে
ভাই শোকে রাম ধরাতে পড়িল।

৩.

অনন্ত শয়ানে হরি আছে ধরার শরণ করি
সারি সারি ভাই চার জন
রাজ অঙ্গে রাজ বসন পরা গজমতি মুক্তধারা
তুল্য নাই সে অমূল্য রতন।

৪.

বাম কর্ণহার শিরোভূষণ খুলে রামের পীত বসন
পুলকে বালক দুইজনে
চলে দুই ভাই মনানন্দে হনুমানকে তুলে স্কন্ধে
সন্ধি করে ব্রহ্মজালে বান্ধে।

৫.

লব বলে, ভাইরে কুশি বান্দরটিরে যদি পুষি
দেখলে খুশি হইবে জননী।
বামকর্ণহার শিরোভূষণ খুলে রামের পীত বসন
মুগ্ধ হয়ে দুগ্ধ দিবে খেতে।

৬.

কুশি বলে লব দাদা এই বানরটির চিত্ত সাদা
নিত্য কান্দে রামকে হারা হয়ে
রাম রাজার বড় সাধ্য বনের বানর করে বাধ্য
মরল যুদ্ধ করল কেমন ধারা।

৭.

দুখে হনুর তনু ফাটে জন্মেছি জানকীর পেটে
তাইতে বটে ধৈর্য ধরি মনে
যদি প্রাণে মারি, তোকে মা মরবে পুত্র শোকে
তাই তো চেয়ে আছি মায়ের পানে।

৮.

হনুমানকে রেখে পথে চলে দুই ভাই কুটিরেতে
দেখে সীতা পুত্র নিল কোলে
খেতে দেয় মা দুটি পুত্রে শাখ-অন্নে শালপত্রে
ভাসে গাত্র দুটি নেত্র জলে।

৯.

দুই ভাই ভজনে বসি মাকে কয় খুশি খুশি,
বনে বসে খেলছে নতুন খেলা
রণ করে রাম রাজার সনে, চারটি ভাইকে বধে প্রাণে
ওই দেখো, এনেছি কন্ঠের মালা।

www.pathagar.com

১০.
শুনিয়া শিশুর ভাষ্যি চমকে ওঠে রাম-প্রেয়সী > ভাষ্যি= ভাষ্য
যেন শশী রাহুতে গ্রাসিল
সীতার অন্তরে বাড়িল জ্বালা সিঁথির সিন্দুর হইল কালা
হস্তের স্পর্শ খসিয়া পড়িল।

১১.
সীতা বলে, কুপুত্র তোরা, আমার হলি শত্রু তোরা
সে রণক্ষেত্রে বল দেখি কোন দিকে
আমি দুগ্ধ দিয়ে কাল সর্পে পুষেছিলাম পুত্র রূপে
দংশিতে এই দুঃখিনীর
মস্তকে।

১২
তখন এলোকেশে পাগল বেসে সীতা যায় পতি অন্বেষে
দুই পাশেতে কুশি-লব চলিল
চেয়ে হনু সীতার পানে পায়ের বসন ধরল টেনে
গিয়ে মায়ের চরণে পড়িল।

১৩.
শুধায় সীতা হনুর কাছে প্রভু আমার কেমন আছে
কেমন আছে আমার আযোধ্যা ভূমি
হনু কয় মা, শিশু তোমার ভেঙে দিছে চাঁদের বাজার
মুছে ফেল সিঁথীর সিঁদুর তুমি।

১৪.
শুনে সীতা নাশিতে প্রাণ বক্ষে হানিলেন পাষাণ,
সীতার দুঃখের নাইরে সীমা
গিয়ে সীতা রণ ভূমিতে, পলকে হেরে গোলকনাথে
পড়ল যেন দশমীর প্রতিমা।

১৫.
অবনীতে সীতার দুঃখ দেখে কান্দে বনের পক্ষ
ছাড়ে পক্ষ নিজ নিজ বাসা
পাখি কান্দে বৃক্ষ ডালে, মৎস্য কান্দে সিন্ধুজলে,
জগৎলক্ষ্মী সীতার এই দশা।

১৬.
সীতা বলে, লব-কুশি, জ্বেলে দে অনল রাশি
যার দাসী তার সঙ্গে চলে যাব
তোরা পুত্র হয়ে শত্রু হলি সিঁথীর সিন্দুর ঘোচাইলি
চিতানলে জীবন ত্যাজিব।

www.pathagar.com

সতীর ধর্ম

১.

শুনো, সবে মন দিয়ে একটি ভদ্রলোকের মেয়ে
দিল বিয়ে, হইল বিধবা,
ও তার বাবা বলে ওগো বাছা, একে তোমার বয়স কাঁচা,
কপাল মন্দ, করো গোপাল সেবা।

২.

মাগো যৌবনে মরিলে পতি, হিন্দুর মেয়ের হবে যতি >যতি= যতিনী অর্থে
এই পদ্ধতি শাস্ত্র স্মৃতি মতে
মাগো, এ জীবন তো যাবে বৃথা, বুকে জ্বলে দুঃখের চিতা
কর্ম করো থেকে ধর্ম পথে।

৩.

যতি মেয়ের এই নিশানা মাছ খাবে না, তেল নেবে না
পরতে মানা রঙিন পেড়ে শাড়ি
পান সুপারি বন্ধ রাখি, খাও তো খাবে হরিতকী
পেলে কোনো বিস্বাদের বড়ি।

৪.

কেটে কেশ করিবে যজ্ঞ, অস্থ্য করিবে স্বাস্থ্য
মূলের কার্য ব্রহ্মচর্য বেশ
মাসে মাসে একাদশী, করতে হবে দেশে বসি
গয়া কাশি যেয়ো মাসে শেষ।

৫.

হবি অন্য খাবি আলা, গলেতে তুলসী মালা > আলা= আত্মপ অর্থে
সন্ধ্যা বেলা করিবে আরতি
ঠাকুর সেবায় রেখে মনটা, বাজাইবে শঙ্খ ঘণ্টা
পুণ্য পাবে জ্বেলে সন্ধ্যাবাতি।

৬.

বাবার কথার লাইন শুনে, বলছে খুকি আইন মেনে
শাস্ত্রখানি ঠেলে ফেলাও দূরে
আমার পতির মৃত্যুর পরে, তোমার পুত্রের বধূ মরে
দাদার বিয়ে দিলে কোন বিচারে।

সুবল মিলন

১.

একদিন বসিয়া নিকুঞ্জ বনে খেলা করে সুবল সনে, রাধা রূপ পড়ে গেল মনে।
শুনো, ওহে সুবল সখা, প্রাণ কিশোরী এনে দেখা, নইল প্রাণ ত্যাজিব কুঞ্জবনে।

www.pathagar.com

২.

দেখে কৃষ্ণের নয়নের জল দিব্য করে বলে সুবল, শোনো, উঠে যদু কুলমণি।
বসে থাকো ধৈর্য ধরে, যাত্রা করলেম ব্রজপুরে, এনে দিব রাধা বিনোদিনী।

৩.

সুবল চলিল আয়ান-ভবনে, দেখা হয় কুটিলার সনে, বল সুবল, বল সত্য করি। >
আয়ান= অভিমন্যু/ আইহন
তুই এইমাত্র গেলি বনে ফিরে এলি কী কারণে, কী ভাব তোর বুঝিতে না পারি।

৪.

সুবল বলে ছল করিয়ে এলেন বংশি হারা হয়ে, অন্বষীতে এলেম তব ঠাঁই।
আমার জল পিপাসা হলো ভারী, জল খেতে দাও তাড়াতাড়ি, জল খেয়ে মোর তাপিত প্রাণ জুড়াই।

৫.

কুটিলা কয়, সুবলরে যাও রাধিকার বন্ধন ঘরে, সেথায় গিয়ে খাও সুশীতল বারি।
কুটিলার আজ্ঞা পেয়ে অমনি সুবল চলল ধেয়ে, বলে গিয়ে ও রাই বিনোদিনী,

৬.

আমার বসন তুমি পরে যাত্রা করো কুঞ্জবনে, শ্যাম কালিয়ায় দিতে দরশন।
তোমায় না দেখিলে প্রাণ বাঁচে না, ঘটেছে ভীষণ যন্ত্রণা, দেখা দিয়ে রাখো কালার প্রাণ।

৭.

সুবলেরও বাণী শুনি বসন পরে বিনোদিনী কুঞ্জবনে করিল গমন।
রাধা-কৃষ্ণের মিলন হলো, মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হলো, বদন ভরে বলো হরি হরি।

নিমাই সন্ন্যাস

১.

একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসি কহিতেছে গৌর শশী
শুনো প্রিয়া বলি যে তোমারে,
আমি কলির জীব, উদ্ধারিব সুমধুর নাম বিলাইব
সন্ন্যাসী হইবো তোমায় ছেড়ে।

২.

আমি ছাড়িয়া এই রাজাভরণ পরিয়া গেরুয়া বসন
দণ্ড কমণ্ডলু নিব হাতে
আমি নদে-পুরীর দ্বারে দ্বারে বলব, হরে কৃষ্ণ, হরে
ঘুরব আমি কৃষ্ণ নাম বিলাইতে।

৩.

আমায় বিদায় দাও হে বিষ্ণুপ্রিয়া পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
কৃষ্ণ মন্ত্র যপো ঘরে বসি
আমার কথা যাও ভুলিয়া মায়ার বন্ধন দাও খুলিয়া
ওই মন্ত্রটি যপো ঘরে বসি।

www.pathagar.com

৪.
মিষ্টি বাক্যে বলে গোরা মায়ার বন্ধন যায় না ছেঁড়া
কালনিদ্রা করিল স্মরণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রাগত প্রভু খোঁজে নিজ-পথ
চলল যখন নিশি পোহাইয়া।

৫.
খুলে দিল রাজাভরণ ধীরে ধীরে করে গমন
ফিরে ধীর ডাকে ওঠো প্রিয়া,
আমি চললেম তোমায় ছেড়ে এ দেশে আসব না ফিরে
কেন্দো না আর আমারও লাগিয়া।

৬.
আমার কথা মনে হলে, মত্ত থেকো কৃষ্ণগানে
নিরক্ষিব বৈকুণ্ঠে বসিয়া
গোরা, কাটিয়া মায়ার বাঁধা মুখে বলে রাধা রাধা
বাহির হলো বিদায় ও লইয়া।

নেশাখোর

১.
আমি বন্দি, সকলের শ্রীচরণ করি আমি এই নিবেদন, শুনো রে দিয়ে মনযোগ,
ধন্য এই কলি-কালে আবাল বৃদ্ধ এক-যোগালে, বিড়ি খাওয়ার হয়েছে এক রোগ।
>এক-যোগালে= একসাথে আড্ডা দেয়, এমন তরুণরা।

২.
কিবা ছেমড়া কিবা ছিমড়ি সকলেতে খায় বিড়ি, বুড়া-বুড়ি নিষেধ করে তায়
বলে, ওলো ছিমড়ি খাসনে বিড়ি, নিসনে আলোতাকের গুঁড়ি, বিড়ির পয়সা কে বলো যোগায়?

৩.
তোর পানের উপর কেমন নেশা কাঁচা দাঁতে তামাক ঘষা, বিড়ির পয়সা কে যোগাতে পারে?
নাতি জামাই এলে বাড়ি কিনে দিবে কোস্তরি বিড়ি, ভালো বিড়ি আনতে কব তারে।

৪.
অতিশয় আদরের তনয় বারেবারে বিড়ি চায়, ছেলের কথায় কিনে দিল বিড়ি
অতিশয় আদরের তামাক প্যাকেটে পুরিয়া এক তাড়াতাড়ি চলে এল বাড়ি। >পুরিয়া= ঢুকিয়ে

৫.
তখন বিড়িটি হাতে তে করে বউদিদির নিকটে গিয়ে, বলে বিড়ি ধরি দাও মোরে
বৌদিদি কয়, ওরে খোকা, বিড়ি খাওয়ার আছে শিক্ষা, আনিস বিড়ি পয়সা দেব তোরে।

www.pathagar.com

৬.

দেবর আর ভাইবউ দুটি বিড়ি খায় ওই চুলার পিঠি, বুড়ো বিটি রাগেতে বাঁচে না
বলে, ওমা কী লজ্জার কথা! ঝি-বউয়ে খায় বিড়ির ছাতা, শালের পাতা বই তো কিছু নয়।

৭.

শুনিয়া শাশুড়ির উক্তি বউদিদি হইয়া বিরক্তি, আরক্ত লোচনে কিছু কয়
বলে, এই দেশের ভদ্র যারা বিড়ি মুখে দিয়ে তারা, রাস্তা দিয়া সাইকেলেতে যায়।

৮.

বধূ বলে ওরে বুড়ি, ছাড়তে পারব না বিড়ি, চোদ্দ বার নিষেধ করিলে

৯.

আমি ভাবি বিড়ি ভুলি, তবু যেন দেয় ঝুলি ঝুলি, নেশার ঝুলে কামটি যাচ্ছি ভুলে।

কলির কাণ্ড

১.

কলির কাণ্ড লণ্ডভণ্ড স্রষ্টার সৃষ্টি হইল পণ্ড
গণ্ড মূর্খের দাপটে ছেয়ে গেছে কপটে, ব্রহ্মাণ্ড।

২.

অসৎ লোকের কদর বেশি, সাধু সুজন বাদ দিয়া বদের আদর বেশি
লক্ষ্মীকে বনবাস দিয়া অলক্ষ্মী ভালোবাসিয়া
মত্ত সদা মিথ্যা নিয়া, সত্য তত্ত্বে পুড়ে যায় হিয়া।

৩.

কলিতে হয় কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাড়ি, ঝাটা তুলে কুলের বধূ শাশুড়িকে দেয় বাড়ি
চড়ে সিংহ-মহিষ একই মাঠে, বাঘের গাল ছাগলে চাটে
প্রেম বিকায় মদনের হাটে, অর্থ স্বার্থে অকপটে।

৪.

শিখলে কিছু এ-বি-সি-ডি দুই দিন স্কুলে গিয়ে বাপের চেয়ে বেশি বোঝে বালক ছেলেমেয়ে
তারা শিক্ষা করে কানন কালা গুরুজনকে দেখায় কলা
আপদ বিহীন কুলোকেরা বললে যায় চটে।

৫.

উল্লুক আর ভল্লুক মিলে মুল্লুক ছেয়ে ফেলেছে, মানুষ বেশি বাড়ে নাই, ভাই জনসংখ্যা বেড়েছে;
জ্ঞান বিজ্ঞানের বেড়েছে প্রভাব কাণ্ডজ্ঞানের পড়েছে অভাব
মানবের সেই আদিম স্বভাব দুই দিনের চিত্তপটে।

www.pathagar.com

৬.
কালী বলে আকুল হয়ে ঘোর কলিতে জনম লয়ে করেছি মহা ভুল
আমি মিলিয়া কুজনের সাথে হারালাম সব হাত হাতে
কোন দিন যাব অবেলাতে, কপালে মোর এই কি ঘটে?

সিন্ধুমুণি বধ

১.
পিপলি বনের ভিতরে বাস করে পর্ণ কুটিরে
প্রতিদিন নামে অন্ধমুনি
ও তার জন্ম অন্ধ ছিল দোহায় সিন্ধু নামে ছিল তনয়
বুকের রত্ন অন্ধের নয়নমনি।

২.
এক দিবসে অন্ধ পিতে কাতর হয়ে পিপাসাতে
কেন্দে কেন্দে সিন্ধুর কাছে কয়
আমার ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হলো, জল বিহনে এ প্রাণ গেল
জল দিয়ে বাপ বাঁচাও এ সময়।

৩.
ঘুমিয়ে ছিল সিন্ধুমণি, জেগে উঠল কান্না শুনি,
পিতার নিকট ছুটিয়া আসিল
ত্রস্ত হয়ে খোঁজে পাত্র বারি নাই তায় বিন্দুমাত্র
দেখে অমনি কান্দিয়া উঠিল।

৪.
বলে সিন্ধু দীনবন্ধু, তুমি হও কৃপাসিন্ধু,
করো মোরে কিঞ্চিত করুণা
প্রাণান্তে পিপাসাতে পিতার মুখে বারি দিতে
আমায় প্রভু বঞ্চিত করো না।

৫.
পড়ে সিন্ধু ঘোর বিপদে কেন্দে ধরে পিতার পদে
বলে, বারি মাত্র নাই
আশু সময় করো, পিতে যাব আমি সুরুজিতে
জল আনিয়া দেব তোমার ঠাঁই।

৬.
শুনিয়া সিন্ধুমুনি কেন্দে কেন্দে কয়, ব্রাহ্মণী,
কী বলিলে ওরে বাছাধন
একা একা দুপুর রাতে যাসনেরে বাপ সুরুজিতে
থাকুক পড়ে জলের দরকার নাই।

www.pathagar.com

৭.

কর্মদোষে অন্ধ হয়ে জনম গেল দুঃখ বয়ে
সুখ হলো না এ পোড়া কপালে
শুনিলে চাঁদমুখের কথা জুড়ায় দোহার বুকের ব্যথা
দুঃখ-কষ্ট সকল যাই গো ভুলে।

৮.

তুইরে আমার নয়নমনি, না দেখলে হই পাগলিনী
অভাগিনী ছেড়ে নাহি দেবে
একা যাবি বানের পথে নির্জনে এই ঘোর নিশীথে
হিংস্র জন্তু পেয়ে তোরে খাবে।

৯.

আমার অফুরন্ত মনের বেদন জানে শুধু সেই নারায়ণ
ব্যথীর ব্যথা অন্যে জানে না
পেয়ে কোলে তোমায় ধনে প্রাণ জুড়াই তোর মা বোল শুনে
মুখখানি তোর দেখিত পারি না।

১০.

বুকের ব্যথা দুঃখের অনল দাউ দাউ করে জ্বলছে কেবল
পুড়ে পুড়ে হলেম পাগল সারা
জনম গেল দুঃখের লাগি, হলো না কেউ দুঃখের ভাগি,
কেন্দে কেন্দে হলেম পাগল পারা।

১১.

সিন্ধু কয়, মা, পিপাসাতে কাতর হয়ে কান্দে পিতে
জল যদি মা না দেই এ সময়,
জগতে পুত্রের কামনা আজ হতে মা কেউ করবে না
এ কলঙ্ক রটিবে ধরায়।

১২.

মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে হাতে করে পাত্র নিয়ে
ত্বরা করে চলে সুরুজিতে
ছুটে গিয়ে নদীর ধারে জল তুলিতে নামল জলে
ডুবায় পাত্র ভরিতে ভরিতে।

১৩.

যখন পাত্র বকবক করে দশরথ শিহরে ওঠে
ভাবে করী বুঝি বারি খায়
ওমনি শব্দভেদী শরটি এনে মারে সিন্ধুর বুকের পরে
মা বলিয়া ধরাতে লুটায়।

www.pathagar.com

১৪.
কালী বলে সুধা সিন্ধু দীনের অদীন দীনবন্ধু
এবার তারে ডাকো প্রাণ খুলে
ও সে বাঁধা থাকে ভক্তিডোরে ডাকলে কিরে রইতে পারে
অন্তিমেতে তুলে নেবে কোলে।

ধরা সতী

১.
একদিন বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া হরি ধরায় এল, ধরার বাড়ি
ধরায় ধরা দিতে ধরার কাছে
অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ধরার গৃহতে এসে
বিনয় বাক্যে ধরাকে বলেছে।

২.
তুমি শুনো, ধরা আমার বাণী সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি
জানি তুমি অতিত সেবা করো > অতিত=অতিথি
আমি ব্রত করি একাদশী, তিন দিন আছি উপবাসী
ক্ষুধায় পরাণ হয়েছে কাতর।

৩.
দেখে ব্রাহ্মণ অতিথি দ্বারে বলে সতী বিনয় করে
পথ্য-অর্ঘ্য দিয়ো সযতনে
ঠাকুর বসে আছে দীনের দ্বারে অতিথি ইহবার তরে
তোমায় আমি পূজিব কী ধনে।

৪.
আমি রন্ধন করিতে যাই, বিশ্রাম করো হে গোঁসাই
রন্ধনশালায় গেল ধরার সতী
ধরার গৃহে চাউল শূন্য ভক্তি-রসে পরিপূর্ণ
চাউল আনতে চলে দ্রুত গতি।

৫.
অরা, নগর মাঝে সবার কাছে বিনয় বাক্যে ধার চাইছে
ব্রাহ্মণ অতিত এল আমার গৃহে
আমি পারি না ভোজন করাতে, চাউল বাকি দাও আমাকে
স্বামী এলে চাউল যাব দিয়ে।

৬.
দেখে অতি কাঙালিনী বিমুখ হলো সব রমণী
পাগল বেশে বাজারেতে চলে
বলে, বিনয় করে দোকানদারকে চাউল বাকি দাও আমাকে
দয়া করো কাঙালিনী বলে।

www.pathagar.com

৭.

মুদি বলে শুনো নারী, তোমায় বাকি দিতে পারি
বাকি দিলে ফাকি দিবে মোরে
তোমায় বাকি দিতে পারি সহস্তে ধরিয়া ছুড়ি
স্তন কেটে যদি দাও আমারে।

৮.

ধরা বলে ছুরি দেহ কেটে দেব মেটে দেহ >দেহ= দাও
পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন
বলে হরে কৃষ্ণ হরে অমনি ছুরি নিয়া করে
সহস্তে কেটে দিল স্তন।

৯.

দেখে মুদি এই আশ্চার্য ধরতে নাহি পারে ধৈর্য
সদয় হয়ে চাউল এনে দিল

১০.

সতী বলে, এসো চলে ভাসে সতী নয়ন জলে
রক্ত বস্ত্র হস্তে ঢাকে
অন্ন লয়ে এল সতী প্রভু বলে এ দুর্গতি
বলো, মা কে করেছে তোমাকে।

১১.

মা তোর অঙ্গে দেখি রুধির ধারা বুঝতে নারি মা তোর ধারা
ধরার মাঝে তুই মা ধরা সতী
আমায়, ধরার কেহ পায় না ধরা তোর কাছে মা পড়লেম ধরা
ধরার মাঝে রবে মা তোর কীর্তি।

১২.

সম্মুখে যেই গোলকের ধন বসেছে করিতে ভোজন
অমনি ধরা পড়িল চরণে
বলে ওঠ মাগো ওঠ ওঠ রবে না মা তোমার কষ্ট
শ্রেষ্ঠ তুমি ইষ্ট সেবার তরে।

১৩.

আয় মা তোরে করি কোলে দুগ্ধ খাই মা কৌতূহলে
এ ঋণ আমি পারিনি শোধ দিতে
বাধ্য হয়ে ভক্তির গুণে মুখ দিল তার কাটা স্তনে
দুগ্ধ পান করে আনন্দেতে।

www.pathagar.com

১৪.
তুই হবি মা নন্দরানী, আমি হব নিলমণি
ক্ষীর-ননী খাব কোলে বসে
কালী কয়, দীন দয়াময় আমার প্রতি হয়ো সদয়
বসে আছি ওই চরণের আশায়।

অভিমন্যু বধ

১.
অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ধর্মের আজ্ঞায় যুদ্ধে মগ্ন
ব্যূহমধ্যে প্রবেশও করিয়া
ও সেই বীরের মতো শিশু বালক করে রণ নাহি পলক
কুরুগণের ভিতরে বসিয়া।

২.
কুরুগণের ব্যূহপতি শক্র দ্বারে সপ্তরথী
অভিমন্যুর প্রতি বাণ মারে
কৌরবের বাণ বৃষ্টি অভিমন্যুর হলো দৃষ্টি
একা বালক সইতে না পারে।

৩.
ব্যূহমধ্যে অভিমন্যু বাণাঘাতে জ্ঞান শূন্য
পিতা বলে ডাকে উচ্চঃস্বরে
কোথায় মাতুল নারায়ণ দিয়ে তব শ্রীচরণ
এ বিপদে রক্ষা করো মোরে।

৪.
কোথায় বৃকোদর মহাবীর খুল্লতাত যুধিষ্ঠির
কোথায় মাতা জনম দুঃখিনী
আমার বিপৎকালে না দেখিলে বিমুখ হলে সবে মিলে
জনমের মতো ছেড়ে চলিলাম আমি।

৫.
তুমি কোথায় বলো প্রাণ উত্তরা, অস্ত গেল নয়ন তারা
যাবার কালে একবার না দেখিলে
শেষে স্বামী হারা পাগলিনী কেন্দে ফিরবে দিন-রজনী
বিধি এমন বিমুখও করিলে।

৬.
শিশু কৃষ্ণ বলে প্রাণ ত্যাজিল কৌরবেরই জয় হইল
পাণ্ডবেরা ভাসে নয়ন জলে
দীন কালীচরণ কেন্দে বলে কোথায় প্রভু দূর্বাদলে
অন্তিম কালে রেখো চরণ তলে।

www.pathagar.com

হরিচাঁদের অবির্ভাব

১.

শ্রী গৌরাঙ্গ শচীর নন্দন করল লীলা অবসান
শ্রী চৈতন্য ভাগবতে সন্ন্যাসের অধ্যায় মতে, যশোমন্ত সূত হবেন ভগবান।

২.

মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি শেষ হইবে সব দুর্গতি লীলা আমার চমৎকার
ঈশান কোনে জন্ম নিব, পাপী-তাপি উদ্ধারিব, কলির জীবের নাই ভাবনা আর।

৩.

ওড়াকান্দি অবতীর্ণ শীহরিচাঁদ মনোময়
সাঙ্গোপাঙ্গ করে সঙ্গে প্রভু আমার প্রেম তরঙ্গে পূর্ব বঙ্গে হরিনাম বিলায়।

৪.

গোলক তারক মহানন্দ মৃত্যুঞ্জয় আর হীরামণ
এরা যদি মনে করে ব্রহ্মাণ্ড ত্বরাতে পারে, করতে পারে অসাধ্য সাধন।

৫.

বর্তমানে প্রমথ চাঁদ ঠাকুর রূপে পাওয়া যায়
ছাড়িয়া ধাম ওড়াকান্দি, প্রভু আমার কান্দি কান্দি পশ্চিমবঙ্গ ঠাকুরনগর হয়েছে উদয়।

যৌবন জ্বালা

১.

আমার বসত উত্তরে বাড়ি কোব্রা গ্রামে
হাউস করে বিয়ে দিছে গোলার গ্রামে >হাউস= শখ

২.

আমার শ্বশুর তালুকদার, আমার ভাসুর তসুকদার
প্রাণের পতি চাকরি করে সাতক্ষীরার ওপর।

৩.

আমার পতি মরে যাক, দেবর বেঁচে থাক
দেবর লয়ে খেলব পাশা, পালঙ্কের উপর।

৪.

আমার আট গাছি মল পায়, উল্টো গোঠ মাজায়
হাঁটতে লাগলে পথ দেখি না যৌবনের জ্বালায়।

বিচ্ছেদ

১.

রাধে বলে বৃন্দে সই মনের দুঃখ কারে কই,
আমায় ফাঁকি দিয়ে গেছে বলে চেয়ে দেখ কালা ওই।

২.

চূড়ায় ময়ূরের পাখা উড়ে যায় ভঙ্গি বাঁকা
আরে মনে ভাবে আমায় বুঝি দিবে না দেখা।

www.pathagar.com

৩.
সখী দেখ, চাহিয়ে দাঁড়িয়ে ওই যে কালিয়ে
আরে হয়ে বাঁকা প্রাণে সখা মাথায় চূড়া লাগিয়ে।
৪.
কলীচান্দের এই বাসনা চরণ দাও কোলে সোনা
আমার মনের কষ্ট নষ্ট হবে যাবে মনের বেদনা।

মিনতি

১.
কোথায় ওমা দুঃখ হারা ডাকি তোমায় বারে বার
অধমগণে করো দয়া দিয়ে অভয় পদছায়া তোমা বিনে গতি নাহি আর।
২.
ওরা অতি অভাজন না জানি সাধন-ভজন, না জানি ভক্তি-স্তুতি কৃপা করো মোদের প্রতি
ও মা ঘোর পাষণ্ড তব এ সন্তান।
৩.
মঙ্গলময়ী মাগো আমার চরণে এই মিনতি, অসময়ে কোথায় রইলে ডাকি মোরা মা মা বলে
ওমা রেখো মোরে চরণে তোমার।
৪.
চরণসেবা এক দিন ও মা করি নাই তোমার দুষ্টমতি তব ছেলে তাই বলে কি দিবে ফেলে
ওমা চরণের দাস করো এবার।
৫.
কালীচাঁন্দের এই বাসনা শুনো ওগো মা, অন্তিম কালে হে জননী দিও অভয় চরণখানি
কাঙাল বলে ভুলে যেয়ো না।

চণ্ডীদাস রজকিনী

১.
একদিন কাপড় হাতে রজকিনী যায় যমুনার তীরে, ধীরে ধীরে যাত্রা করে গুণগুণ সুরে
কীর্তন করে
কাপড় কাচে ঘাটেতে বসিয়া।
২.
একদিন বঁশি হাতে চণ্ডিদাস যায় যমুনার তীরে, বঁশি ফেলে যমুনাতে চেয়ে থাকে অপর দিকে
রজকিনী প্রথম দেখা দিল।
৩.
তোমার হাতে ছিপ আর বঁশি, কী মাছ ধর দিবা-নিশি? কও না কথা কিবা অভিমানে।
৪.
বারো বৎসর বাইলাম বঁশি? পেলাম মাত্র একটি খুঁটি, চণ্ডিদাসের প্রথম কথা হলো।

www.pathagar.com

৫.

তুমি শুনো, ধনি রজকিনী রজুকের মেয়ে
আমার হাতে ছিপ আর বঁশি এই মাছ ধরি দিবানিশি, রজকিনীর প্রথম কথা হলো।

৬.

তুমি শুনো, ধনি রজকিনী রজকেরও মেয়ে
তোমার লাগি বঁশি বাওয়া, তোমার লাগি মালা গাঁথা, চণ্ডিদাসের যুগল মিলন হলো।

৭.

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি তারা প্রেমের মহাজন
তারা প্রেমসাগরে সাঁতার খেলে গো
তারা দেখায় প্রেমের নিদর্শণ।

৮.

এদিকেতে রজকিনী কাপড় কাস্তেছে >কাস্তেছে=কাচছে
ওদিকেতে চণ্ডীঠাকুর মনের সাধে গো
বঁশি দেয় জলে ফেলে গো।

৯.

বারো বৎসর বাইলাম বঁশি আমি নিরালায়
যদি প্রেম সাগরে মাছ থাকিতো গো...
তবে প্রেমের খোঁটা দিত।

১০.

একে আমার ভরা যৌবন গো তাহে জোয়ারের জল
যদি প্রেম সাগরে বাঁধন পড়ে গো
তবে ছুটে করে কলকল,

১১.

সারা জীবন বাইলাম বঁশি নিরালায়
আজ প্রেম সাগরে প্রেমের মাছে গো
আজি প্রেমের খোঁট দিল গোলায়

১২.

দীর্ঘ দিনের সহিষ্ণুতায় আমার অঙ্গে হানে বাঁধন
মোদের ভালোবাসা নির্মল হলো গো
পদে রাখলে ভগবান।

১৩.

কালীচরণ কয়, মনের খেদে গো আছে প্রেম, নাই ভাই
তোমার প্রেম হিল্লালে হৃদয় গলে গো
তোমার শ্রীচরণের দোহাই।

ধন্য সোনার বাংলাদেশ,
তাহে সুন্দর পরিবেশ

www.pathagar.com

আছে ক্ষেত ভরা ধান ভাটিয়াল গান
গাহি হয়ে সমাবেশ।

বৃক্ষে ধরেছে নানা ফল,
আছে নদী ভরা জল,
আসে ফুল হতে সুগন্ধ ভেসে
মানুষ কত সুনির্মল।

চাষী লাঙ্গল চালায়,
কত ফসল ফলায়
মোদের ভাষা বাংলা ভাষা
বিধাতা মুখে বলায়।

ফলে পাই যে নানা সাধ,
দোলে আকাশে চাঁদ
দিয়ে সূর্য মামা নতুন আলো
ঘুঁচায় সকলের বিষাধ।

দীন অন্ধ দাসে কয়,
এ দেশ মিলিবে কোথায়
এসো হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
সবে গাহি দেশের গান।

গুরু-শিষ্য

১.
আর হরিচাঁদের লীলাতরী ব্যাখ্যা করে যাই
গুরুচাঁদের দোহাই দিয়ে ভবপারে যাই॥

২.
আর মহানন্দ তারক লোচন গোলকচাঁদ গোঁসাই
বিচরণ আর বিপিন চন্দ্র এদের মতো নাই॥

৩.
অশ্বিনী কুমার প্রেমিক কবি ভক্ত চূড়ামণি
হীরামন ছিল ভক্ত হরির মাথার মণি॥

৪.
রামমহোন কার্তিক চরণ চণ্ডীদাস গোঁসাই
মানে-ধ্যানে ভক্ত বড় এদের মতো নাই॥

৫.
আর এক ছোট কর্তা বাঁশরিয়া গ্রাম
তাহার শিষ্য গোপালচন্দ্র বলিয়া ধাম॥

www.pathagar.com

৬.
কাশীকৃষ্ণ সভ্য-শান্ত বোয়ালিয়া ধাম
তাহার কৃপা পেতে মোরা বোয়ালিয়া যাই॥
৭.
অসীম গুরু সসীম হয়ে ভক্তে করল বাস
গুরু তুষ্ট হলে পরে কাটবে দেহের ফাঁস॥
৮.
গোঁসাই থাকে আগে আগে পাছে থাকে লোকে
আজকাল কার কাণ্ড দেখলে হৃদয় ফাটে রাগে॥

সাধুর জারি

১.
আজকাল দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় ভণ্ড সাধুর দলে
কত সাধু বেঁধে পড়ে মেয়েলোকের জালে॥
২.
ব্রহ্মচারী বিয়া করে দশ বৎসরের নারী
এমন সাধু দেখলে পরে খুলে দেবে চাড়ি॥ >চাড়ি=মাথার খুলি
৩.
বাংলাদেশে অনেক সাধু দেখতে পাওয়া যায়
শেষ বয়সে বিয়ে করে কাঁদাপানি খায়॥
৪.
তলে তলে কাজ চালাইয়া গায় হরে কৃষ্ণ
নারীর হাতের জল না খেলে মেটে না তার তৃষ্ণা॥
৫.
আসল সাধু হতে হলে ওই সমস্ত ছাড়ো
সকাল বেলা বিকাল বেলা ঠাকুরের নাম করো॥
৬.
পরের জমি জাল করে এমন সাধু আছে
সাধু হয়ে যেও না ভাই ওই সমস্ত কাজে॥
৭.
এবার দেশ-বিদেশে ঘুরে ফিরে রণেশ কান্ত বলে
কোনো চিন্তায় কাজ হবে না যেতে হবে চলে॥

জগন্নাথ হলের কথা

১.
শুনো বন্ধুগণ দিয়া মন করি নিবেদন
জগন্নাথ হলের কথা বলিব এখন॥

www.pathagar.com

২.
১৯৮৫ সালে রাতের অন্ধকারে
জগন্নাথ হলটি শুনি ভাঙ্গিয়া পড়ে॥
৩.
কী কারণে ভেঙে পড়ে সেই কথাটি বলি
সেই কথাটি বলতে গেলে চোখে আসে পানি॥
৪.
সেদিন রাতের বেলা টাপুরটুপুর বৃষ্টি পড়তে ছিল
সেই সমাতে হলটি শুনি ভাঙ্গিয়া পড়িল॥ >সমাতে=সময়ে
৫.
ভেঙে পড়ার সাথে সাথে অনেক শব্দ হয়
দরজার কাছে যারা তারা বাহির হয়ে যায়॥
৬.
কেহর পা ভাঙ্গা, হাত ভাঙ্গা আধা মরা হয়
ধারে-কাছে যারা তারা হাসপাতালে নেয়॥
৭.
হল ভাঙার পরে সেখানে লোকজন জমা হয়ে যায়
অবশেষে ৩৫ জনকে মৃত পাওয়া যায়॥
৮.
পরে রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়
বাংলাদেশের সরকার অনেক বক্তৃতা দেয়॥
৯.
বক্তৃতা দেবার সময় অনেক-ই বুঝায়
তবুও তো মাতা-পিতা অবুঝ হয়ে রয়॥

ভয়ের জারি

১.
শুনো বিশ্ববাসী, ধ্যানে বসি করিব বর্ণন
সারা দেশের ভয়ের কথা শুনো দিয়া মন॥
২.
চরবড় বাড়িয়া পূর্বের মাথায় আলা মোল্লা ছিল
চরেতে গিয়ে আলা মোল্লা ভূতের ঠাসা খাল।
৩.
খেয়ে আলা মোল্লা ভূতের ঠাসা বেঁহুশ হইয়া পড়ে
একটু খানি হুঁশ হইলে কলেমাও পড়ে॥

www.pathagar.com

৪.

তখন কলেমা পড়ে আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়ায়
এমন সময় ভূত আসিয়া ভুট করিয়া লয়॥ >ভুট= উপুড়

৫.

তখন হুঁশ হয় বেহুঁশ হয়ে জামাইকে ডাকে
এক বদনা জল নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি ধারে।

৬.

চোখে জল দিলে হুঁশ হয় একটু একটু করে
সবাই মিলে ধরে আনে আলা মোল্লার ঘরে॥

৭.

খবর শুনে সবাই মিলে ডাক্তার আনিল
এক ডাক্তার দেখেশুনে ভয় পেয়ে গেল॥

৮.

আরেক ডাক্তার দেখেশুনে ঔষধও করিল
সেই ঔষধ খেয়ে মোল্লা একটু ভালো হলো॥

৯.

তার একদিন পর আলা মোল্লা ফুলিয়া উঠিল
রমজান নামে এক ফকির বাড়িতে আসিল।

১০.

তখন ফকির দেখে আস্তে আস্তে ভালো হইয়া যায়
আলা মোল্লা বাড়ির পর দিয়া লাঠি ভর দিয়া যায়॥

সিগারেট-বিড়ি

১.

শুনো ভাইরে ভাই, বলে যাই সিগারেট-বিড়ির জারি
পশ্চিম দেশে বাস করিত মুকুল নামের বিধি।

২.

তাহার সাহেব ছিল অতি চমৎকার নাম ছিল তার বিবি
হাই স্কুলের মাস্টার ছিল খাইত সিগারেট-বিড়ি॥

৩.

সাহেব স্কুল থেকে বাড়ি এসে জামাটি খসায়
মুকুল বিধি ঘর থেকে এসে পকেটটি হাতায়॥

৪.

পকেটের মধ্যে থাকে টাকা-পয়সা বিড়ি
সব কিছু সে চুরি করে নেয় একা মুকুল বিধি॥

www.pathagar.com

৫.
পর দিন স্কুল থেকে বাড়ি এসে নিজে দেখতে পায়
পকেট থেকে নিচ্ছে বিড়ি তাহার মুকুল হায়॥
৬.
সাহেব মনে মনে চিন্তা করে একি কাণ্ডখানা
কেমনেতে বন্ধ করি বিধির বিড়ি খাওয়া॥
৭.
পর দিন স্কুল থেকে বাড়ি এসে বিবিজানকে বলে
তোমার জন্য এনেছি বিড়ি খেতে দাও আমাকে॥
৮.
বিবি মনে মনে চিন্তা করে খেতে নাহি দিব
পরদিন সাহেবের অনাহারে গেল॥

নয়া সাধু

১.
শুনো পল্লিবাসী, জলদাবাসী নয়া সাধুর কথা,
কলিযুগের সাধুর কথা হৃদয় আছে গাঁথা॥
২.
একে ধর্মপূর্ণ দীনেদৈন্য, ভাবের চৈতন্য
দিনের বেলা হয় বৈরাগী, রাতে হয় সৈন্য॥
৩.
লোক সমাজে তিলক কেটে হয় যে চিতাগোড়া
রাতের বেলা চুরি করে পড়ে শেষে ধরা॥
৪.
আবার দাড়ি রেখে কৌপিন পরে হয় ব্রহ্মচারী
ঘরে-বাইরে লাগে তার চোদ্দ গণ্ডা নারী॥
৫.
অন্ন ছাড়া তেল নেয় না ভাবে জড়াজড়ি
উপরেতে সুন্দরী ভাই ভিতর ময়লা ভারি॥
৬.
গেরো দিয়ে কাপড় পরে দেখতে মাকাল ফল
ভিতরে ভাই রঙ দেখা যায় পুরান হুক্কার কল॥
৭.
ধর্মের নামে ভণ্ডামি করতে যেয়ো না
পরপারে যাবার কালে কেউ রক্ষা পাবে না ॥
৮.
গুরু দয়াময় সব জাগায় সমানভাবে রয়
রবিন যেন রেণু মাখা চরণ দুখান পায়॥

www.pathagar.com

কাজলরেখা

১.

শুনো বন্ধুগণ দিয়া মন, করি নিবেদন
দুঃখিনী কাজলের কথা করিব বর্ণন।

২.

ভাটির দেশে বাস করিত ধনেশ্বর রাজা
তাহার ছেলেটির নাম রত্নেশ্বর আর মেয়ে কাজলরেখা॥

৩.

সম্পদ হারায় জুয়া খেলায় ধনেশ্বর রাজার
মনে মনে চিন্তা করে সুখ হবে না আর॥

৪.

বাণিজ্যতে গিয়ে রাজা কিনল একটি পাখি
বাড়িতে আসিয়া তাহার নাম রাখে শুকপাখি।

৫.

তখন সবাই বলে ওগো রাজা শুকের কথায় চলো
সুখের কথা আইলে তুমি ফিরে সম্পদ পাবে।

৬.

তখন শুক বলে ওগো রাজা আমার কথা বলি
জনম দুঃখী কাজলরেখাকে বনবাস দাও আজি॥

৭.

তখন কাঁদতে কাঁদতে রওনা দিয়া ফিরে আসে বাড়ি।
পথের মাঝে বলে কাজল জল পিপাসাতে মরি।

৮.

তারা বনের মাঝে দালান দেখে সেই দিকেতে যায়
সেই দালানে ছিল কুমার সূচরাজা ঘুমায়।

কলিযুগ

১.

শুনো বন্ধুগণ, দিয়া মন আমারই বচন
কলিযুগের কথা আমি বলিব এখন॥

২.

কলি উল্টে গেছে সম্মান গেছে কেউ মানে না কারে
কেউ একবার বলতে গেলে উল্টে বলে তারে॥

৩.

অধর্ম করিয়া লোকে বড় লোক হইল
ধর্মের পথে যারা তারা গরিব হইয়া গেল।

www.pathagar.com

৪.
ছোটমোট যত তারা বিড়ির পাছা টানে
কেউ কিছু বললে তারা শোনে না তা কানে॥
৫.
অকাজ করে কলির লোক খেতে নাহি পায়
ক্ষুধার জ্বালায় ঘুইরা বেড়ায় কী করি উপায়।
৬.
ছোট ছোট ছেলেরা কিষাণ বেচে মরে > কিষাণ=কামলা খাটা
এখন যারা কষ্ট করে শান্তি তাদের পরে॥
৭.
কলির শেষে ধর্ম রাজা এটা সবাই জানে
যত কষ্ট আছে সব করে নাও এখনো॥
৮.
এই পর্যন্ত করি ক্ষান্ত রণেশ কান্ত রচনা তাহার
সারা জীবন মনে রাখবেন মিনতি আমার॥

সুখী সংসার

১.
শোনেন, বন্ধুগণ দিয়া মন করি নিবেদন
সুখী সংসারের কথা আমরা বলিব এখন॥
২.
সুখী সংসার গড়তে যদি তোমরা সবে চাও
দুটি সন্তান নিয়ে সবে হাসি-খুশি রও।
৩.
অধিক সন্তান হইলে পরে দুঃখের সীমা নাই
নুন আনতে পান্তা ফুরায় মরার সময় নাই।
৪.
আর স্কুলে দেওয়ার ক্ষমতা পিতার নাহি হয়
ছেলেমেয়ে যত তারা অশিক্ষিত রয়॥
৫.
রেডিওতে আছে ভাইরে অনেক পদ্ধতি
তাহার থেকে একটি বেছে নাও বলি॥
৬.
আমি যাহা বলি ভাইরে শুনে নাও তো তাই
আর নয়তো শেষের বেলায় দুঃখের সীমা নাই॥
৭.
জনসংখ্যা বাংলাদেশে বাড়ছে যত ভাই
ততই তো স্বদেশের শান্তি চলে যায়॥

www.pathagar.com

৮.
বাংলাদেশের সরকার কত সহজ করেছে
গ্রামে গঞ্জে পরিকল্পনার চাকরি দিয়েছে॥

মেয়ের মেলা

১.
শোনেন বন্ধুগণ, দিয়া মন করি নিবেদন
বাংলাদেশের মেলার কথা শুনো দিয়া মন॥
২.
শুনো বন্ধুগণ দিয়া মন দুরন্ত এক ঘটনা
বাংলাদেশের ঘরে-বাইরে মিলছে মেয়ের মেলা।
৩.
মিলছে মেয়ের মেলা, বাঁধায় জ্বালা একি হলো দায়
সরল সত্য পুরুষগুলো চোখ ইশারা দেয়॥
৪.
পরে চোচ প্যান্ট টেরি জামা দেখতে সুন্দরী >চোচ প্যান্ট=চোস্ত পাজামা
ওড়না উড়াইয়া চলে দেখে লজ্জায় মরি॥
৫.
চলে মুখ ফুলাইয়া বুক ঝুলাইয়া কাজলমাখা আঁখি
যুবকদের মন ভুলাইয়া দিয়ে যায়রে ফাঁকি॥
৬.
মেলায় যায় ঠেলা খায় লজ্জা নাহি হয়
কোলের বালিশ জড়ায় ধরে কাঁদিয়া ভাষায়॥
৭.
শুনো মুণিঋষি জ্ঞানী-গুণি তোমাদের জানাই
ভণ্ড কথা লিখি যেন ক্ষমা একবার পাই।
৮.
কবি রবিন বলে ভাবলে কেন সংসার জহর বাজি
আসল সংসার ছেড়ে আমরা হয়ে গেলাম পাজি।

রাজাকার

১.
শুনো, বন্ধুগণ দিয়া মন রাজাকারের কথা
রাজাকারে কথা কিছু করিব বর্ণনা।
২.
রাজাকার বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি করে
গ্রাম-গায়ের ছেলেমেয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারে॥

www.pathagar.com

৩.

রাজাকারের গুলিগোল্লা হয়ে ড্যাম
মোল্লাহাট বাজারে তারা করে গেল ক্যাম॥ >ক্যাম=ক্যাম্প

৪.

শুনো ভাইরে ভাই বলে যাই মুক্তিযুদ্ধের কথা
মুক্তিযুদ্ধের কথা কিছু করিব বর্ণনা।

৫.

মুক্তিযোদ্ধা এ দেশেতে ছিল না আগে
বঙ্গবন্ধু এনে দিল এ দেশেরই বুকে।

৬.

এনে দিল বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র দেশ
অবশেষে শালার বেটা পালাইছে বিদেশ॥

৭.

স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা কী বলিব ভাই
সব শেষে সবাই মিলে প্রণাম জানাই॥

৮.

এই পর্যন্ত করি ক্ষান্ত রণেশ কান্ত রচনা তাহার
সারা জীবন মনে রাখবেন মিনতি আমার॥

মেয়ে

১.

শুনো বাংলাদেশটা ভরে গেছে জনসংখ্যা দিয়ে
এক পুরুষের সঙ্গে লেখা তিন তিনটি মেয়ে॥

২.

জনসংখ্যা এ দেশেরই প্রধান সমস্যা
হিসাব করে দেখা গেল পা দিতে নাই পাসা।

৩.

মেয়েদের ভাই চাকরি হচ্ছে ছেলেদের হয় না
যে মেয়েদের চাকরি হচ্ছে বিয়া করবে না॥

৪.

হালকা-পাতলা মেয়েগুলো চাকরি নাহি পায়
যুবক যুবক ছেলেপেলে বিয়া করতে চায়।

৫.

গায়ে হালকা পোশাক পাগলা হাসি কেমন কেমন চায়
দুই-চার দিনের ছেলেপেলে খারাপ হইয়া যায়।

৬.

চলে ঘটঘটাইয়া হাত ঝুলাইয়া কাজলমাখা আঁখি
কত ছেলের টাকা খাইয়া দিয়ে গেল ফাঁকি।

www.pathagar.com

৭.
ভিজা বিড়াল বলে কিছু মেয়েছেলে আছে
উপরেতে সুন্দরী ভাই তল দিয়া গানা খোচে। >গানা=গর্ত
৮.
ক্যানক্যানাইয়া কথা বলে তাহার কথা বলি
চোদ্দ গণ্ডা লাইন করে যুগের সেরা কলি। >লাইন=সম্পর্ক
৯.
ছোট ভাইটি তাকে দেখে লাইন করতে চায়
চেহারা-ছবি ভালো আছে কাছে টেনে নেয়।

ছেলে

১.
এ দেশেরই জনগণ পাতলা হয়ে যাবে
আর বেশি হয়ে যাবে নারী লোকের ভাবে॥
২.
কলেজ ফিল্ডে যাচ্ছে সব যুবক ছেলের দলে
কাকে এখন ধরা যাবে এই সমস্ত বলো॥
৩.
মানে চিঠিপত্র টাকাপয়সা মানিব্যাগের খেলা
ভিতরটাকে খুঁজে দেখলে দেখবে প্রেমের মেলা॥
৪.
প্রেমের মেলা বাঁধায় জ্বালা একি হলো দায়
কত প্রেমিক যাবার বেলা আরও আরও চায়॥
৫.
আরে চেয়ে গেছে এখন চাচ্ছে আরও কত চাবে
কয়জনই বা এই বয়সে কয় মেয়েকে পাবে॥ >কয়=কত
৬.
শুনছি কত প্রেমিক চিঠির মধ্য ফকুর কথা লেখে >ফকু=ছল
তা-ও দেখলাম দুমাস আগে পড়ে গেছে ফাঁকে।
৭.
ছাত্রসংখ্যা লাইন করে চাকরির দিকে ধায়
একজনকে কষ্ট দিলে নিজে কষ্ট পায়॥
৮.
কষ্ট পেয়ে ছাত্র ভাইটি করে আশীর্বাদ
আমার মনে কষ্ট দিয়া চির সুখে থাক।
৯.
কবি বর্ণিক বলে রং মেখে দিলাম এবার আড়ি
একটি কথার জবাব পেলে উঠে যাব বাড়ি॥

www.pathagar.com

ছেলেদের জারি

১.

শুনো, বন্ধুগণ দিয়া মন করি নিবেদন
ভাইবোনদের জারি আমরা বলিব এখন।

২.

ছোট ছোট ভাইবোনদের কোমল মুখের হাসি
তারা যখন খেলতে ছিল দূর্বা ঘাসে বসি॥

৩.

সন্ধ্যাকালে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে যখন পড়ে
রাতের বেলা ঘুমের ঘরে দেও না সাড়া মনে॥

৪.

ভোরবেলাতে রবি মামার যখন উৎস আসে
ঘুম থেকে উঠে তারা ভাবে মনে মনে॥

৫.

ঠিক করিয়া দৌড় দেয় যায় রান্নাঘরে
তারা তখন মনের সুখে যায় পেট ভরে॥

৬.

ধীরে ধীরে হেঁটে হেঁটে স্কুলেতে যায়
স্কুলেতে যেয়ে তারা নানা কথা কয়।

৭.

স্কুল থেকে বাড়ি এসে মায়ের কাছে যায়
মা তখন বুঝতে পেরে খাবার এনে দেয়॥

৮.

স্কুলের কাজ সেরে তারা মাঠে খেলতে যায়
রবি মামা সন্ধ্যাকালে অস্ত চলে যায়।

৯.

এরই মধ্য খেলতে তারা কত কিছু করে
সবে মিলে দল বেঁধে মারামারি করে॥

সাধুর জারি

১.

শুনো, ভাইরে ভাই বলে যাই আমারই বচন
কলি যুগের সাধুর কথা করিব বর্ণন।

২.

কলিযুগের সাধুর সংখ্যা বাড়ছে যত ভাই
ততই তো অসৎ লোকের অভাব তো নাই।

www.pathagar.com

৩.

কলিযুগের সাধগুলো এমনই সাধক
সকাল বেলা বিকাল বেলা কাটে যে তিলক॥

৪.

রাখে লম্বা দাড়ি মাথায় পাগড়ি হাতে পরে বয়লা >বয়লা=ধাতব চুড়ি
এমন সাধু দেখলে পরে কে না বলে শালা॥

৫.

জপে কৃষ্ণ নাম হরি নাম পরে শতনামা
অবশেষে পেটের দায়ে শিষ্য করে জমা।

৬.

হয়ে পেটুক সাধক ভণ্ড সাধক গোপি হাতে ভাই > গোপি=গুপিযন্ত্র
এমন সাধু দেখলে পরে ছিলুম খাওন চাই। >ছিলুম=হুকা

৭.

মেয়ার মধ্য মোল্লা ভাইরে নমোর মধ্যে সাধু> মেয়া=মুসলমান অর্থে, নমো= হিন্দু অর্থে (নমঃশূদ্র)
উস্তে আলু থুয়ে কেন কিনে খাওরে কদু॥ >উস্তে=উচ্ছে

৮.

কলিযুগের সাধুগুলো পালে নারী বুড়ি
অবশেষে তাদের সম্পদ করে নেয়রে চুরি॥

ময়না

ডিগি ডিগি ময়না তোমার পরানে

১.

এসো এসো প্রাণের বন্ধু বইসো আমার পাশে
তোমার লাইগা অভাগিনী প্রেমের কপাট খোলারে॥

২.

জল ভরো জল ভরো কন্যা জলে দিয়ো ঢেউ
ঘোমটা খুলে কও না কথা ঘাটে নাইরে কেউ॥

৩.

কেমন তোমার মাতা-পিতা কেমন তোমার হিয়া
কত বড় হইছ রে ময়না না দিয়েছে বিয়া॥

৪.

ভালো আমার মাতা-পিতা, ভালো আমার হিয়া
তোমার মতো নাগর পেলে আমায় দিত বিয়া॥

৫.

বড়ই গাছে নাইকো রে বড়ই ঢিলা কেন মার >ঢিলা=ঢিল
তোমার নাইকো রে পিরিত নয়ন কেন ছাড় ॥

www.pathagar.com

৬.
এত বড় হইছ রে ময়না দেয় না তোমায় বিয়া
আমি যদি হইতাম ময়না আমায় দিত বিয়া॥
৭.
মায়ে বলে ছোট ছোট বাপে দেয় না বিয়া
আর কতকাল রাখব রে যৌবন আঁচলে বাঁধিয়া॥
৮.
তুমি হইয়ো বটবৃক্ষ আমি হইব লতা
তোমাকে জড়াইয়া ধরে কইব মনের কথা॥
৯.
তুমি হইয়ো ঘাটের তরী আমি হব মাঝি
দুই জনেতে একই সঙ্গে সাগর দিব পাড়ি॥
১০.
কাঁঠালগাছে নাইকো রে কাঁঠাল পাতায় আছে মুচী> মুচী=মোচা বা মুকুল
খাইলাম না ছুঁইলাম না হইলাম বড় দোষী॥
১১.
নিমগাছে টিম টিম বেগুন গাছে বাসা
ময়নার একটি ছেলে হইছে চিংড়ি মাছের খোসা॥
১২.
কাঁঠাল গাছে নাইকো রে কাঁঠাল পাতায় আছে মুচী
তোমার সঙ্গে নাইকো পিরিত কেন কর দোষী॥
১৩.
বাড়ির পাশে নারকেলগাছ চিকুন চিকুন পাতা > চিকুন=সরু
তোমার কথা মনে পড়লে ধরে আমার মাথা॥

পাঁচালি

বেহুলা ভাসল গাঙরিজলে মরা পতি লয়ে>গাঙরি=গাঙুড়
১.
এক বাঁক বাইয়া বেহুলা আর এক বাঁকে যায়
ধোনা-মোনার ঘাটে বেহুলা বাইয়া নাগুল পায়॥ >নাগুল পাওয়া= পৌছানো অর্থে
ধোনা বলে মোনা ভাইরে দেখো চাহিয়া
আকাশেরই চন্দ্র বুঝি গাঙ দিয়া যায় ভাসিয়া॥
মোনা বলে ধোনা ভাইরে আমি আগে দেখি
তুমি কিছু বলো না ভাই আমি বিয়া করি॥
নৌকা যখন ডুবে গেল ধোনা-মোনার ঘাটে
মা মা বা বলে ধোনা-মোনা ওঠে বেহুলার কোলে॥

www.pathagar.com

২.

এত বলি বেহুলা সতী অন্য বাঁকে যায়
দস্যু গোদার ঘাটে বেহুলা বাইয়া নাগুল পায়॥
বাইশ মণ লোহার বঁশি বয়রা বাঁশের ছিপ
বেহুলারে দেখিয়া গোদা ঘন মারে টিপ॥
এসো এসো বেহুলা সতী এসো আমার ঘরে
ঘরে এসে বস তুমি রাজ সিংহাসনে॥
মনের দুঃখে গোদার পানে ফিরে নাহি চায়
এক বাঁক বাইয়া বেহুলা আর এক বাঁকে যায়॥
মনে মনে ভাবছে বেহুলা গোদার নাইকো কিছু
মাচার তলে পড়ে আছে চোদ্দ ডোল ঘেঁচু॥ >ডোল=ডুলি, ঘেঁচু=তুচ্ছ বস্তু

৩.

এত বলি বেহুলা সতী অন্য বাঁকে যায়
ধোনা-মোনা দুই ভাই পাছে পাছে যায়।
মনে মনে ভাবছে বেহুলা গোদার এমন ঘটা
মাছখান খাইয়া তুমি তারে দিও কাঁটা॥
মনে মনে ভাবছে বেহুলা গোদার নাইকো ধন
মাচার তলে পড়ে আছে কড়ি চৌদ্দ পোন॥ >পোন= ৮০ টাকায় ১ পোন হিসাব করা হয়
কড়ি চৌদ্দ পোন নহে আছে এক ভাঁজ
তাহা দিয়া গড়ে দিব শিলামতী কাচ॥
শিলামতী কাচে বেহুলা সাজে সতী ভালো
এত বলি বেহুলা সতী আমার সাথে চল॥
শেষ পর্যন্ত বেহুলার কাছে এই মিনতি করি
বছর শেষে মা মনসা তোমার পূজা করি॥

নুতন মেলা

১.

শুনো বিশ্ববাসী, ধ্যানে বসি করিব বর্ণন
বাংলাদেশের মেলার কথা শুনো দিয়া মন।

২.

একি মেলার ঠেলা বাঁধায় জ্বালা করি কী উপায়
বাংলাদেশের মেয়ে যত মেলার দিকে ধায়॥

৩.

পরে হ্যাফপ্যান্ট, টেডি জামা মেলার দিকে যায়
মনের মানুষ পাইলে পরে কাছে টেনে নেয়॥

৪.

যখন মেলায় যায় ঠেলা খায়, লজ্জা নাহি হয়
মনের মানুষ পাইলে পরে বুজে জড়ায় লয়।

www.pathagar.com

৫.
কিনবে আলতা, চুড়ি, স্নো, পাউডার আরও রেশমি চুড়ি
এমন সময় মনের মানুষ চলে যায় বাড়ি॥
৬.
তখন মেলায় বসে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়
তবুও তাদের বাড়ির কথা মনে নাহি হয়॥
৭.
যখন রাত হয় বাড়ি যায় মায়েতে বকায়
নাইয়াগুগি তুই এত রাতে ছিলেরে কোথায়॥ > নাইয়াগুগি=লজ্জাহীন অর্থে মেয়েদের প্রতি আঞ্চলিক গালি
৮.
তখন রাগ হয়ে খোপে যায় ভাত নাহি খায় >খোপ=কক্ষ
কোলের বালিশ জড়ায় ধরে কাঁদিয়া ভাষায়।
৯.
তখন মনের দুঃখে চিঠি লেখে মনমানুষের কাছে
এমন সময় মনের মানুষ কাছে এসে বসে॥

দেশের ঘটনা

১.
শুন, ভাইরে ভাই বলে যাই দেশেরও ঘটনা
হিন্দু-মুসলিম বিচ্ছেদ হচ্ছে হিংসায় পড়িয়া॥
২.
সবেমাত্র অরাজকতায় দেশ গেল ছেয়ে
সুখী সংসার দূরের কথা দেশ গেল উল্টে॥
৩.
হিন্দু ভাইদের মা-বোনদের দুর্গতির কথা
চিন্তা করলে এ দেশেতে যায় না আর থাকা॥
৪.
শিক্ষিত সমাজে ভাই চাকুরি মেলা দায়
নমো বলে নাম শুনিলে ঘুষি পাওয়া দায়॥
৫.
জমির দলিল কন্যা হরণ অন্যায়ের কথা
প্রতিবাদ জানাইলে তাহা পায় না যে রক্ষা॥
৬.
অত্যাচারের কথা আজি কী বলিব ভাই
শাসকদের কুশাসনে জর্জরিত ভাই॥

www.pathagar.com

৭.
ইতোমধ্য মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণা হইল
হিন্দুরা তাই আতঙ্কে পশ্চিমে ভিড়াইল॥
৮.
ভীরুতায় মাথা নত করিয়ে না ভাই
এই বলে ময়নার জারির সমাপ্ত ঘটাই॥
৯.
ভদ্রতার খাতিরে আর নাহি গাই
এই বাড়ি ছাড়িয়া আমরা অন্য বাড়ি যাই॥

ডিস্কো

১.
শুন, বন্ধুগণ দিয়া মন ডিস্কোরও ঘটনা
শহর-বন্দর ঘুরে আইলাম ডিস্কো ছাড়া দেখলাম না॥
২.
ডিস্কো দেখতে ভালো, শুনতে খারাপ সর্ব লোকে কয়
ডিস্কো নিয়ে হাইস্কুলে মারামারি হয়॥
৩.
কলিযুগের ডিস্কোগুলো স্কুলেতে যায়
ইশারাতে কথা বলে বোঝা নাহি যায়॥
৪.
বর্তমানে চলছে ভাইরে ডিস্কো যুগের খেল
যুগের তরে উল্টে গেছে পূর্বেরই সকাল॥
৫.
ধর্ম-কর্ম বর্তমানে বিলীন হয়ে যায়
অধর্মের যুগ চলছে ভাইরে শুন মহাশয়॥
৬.
মা-বাপের যত্ন নাইরে বর্তমান যুগেতে
আদর-যত্ন হচ্ছে সব শালা-শুবিন্দিতে॥ > শুবিন্দি=সুম্বন্ধি

তরমুজ

১.
শুন বিশ্ববাসী, ধ্যানে বসি করিব বর্ণন,
বাংলাদেশের তরমুজের কথা শুনো দিয়া মন।
২.
যখন তরমুজ রোয় মনে করে অনেক তরমুজ হবে> রোয়=রোপন করে
এবার বুঝি বড় মেয়ের বিয়া দেয়া যাবে॥

www.pathagar.com

৩.
যখন গাছ হয় মনে কয় সার দিতে হয়
টাকার জ্বালায় কানের সোনা বিক্রি দিতে হয়॥
৪.
যখন রাত হয় খোপে শোয় কথা নাহি কয়
স্বামী তখন স্ত্রীকে সব কথা বুঝায়।
৫.
দিনে দিনে গাছে যখন ফল ধরিয়া যায়
এমন সময় আকাশেতে মেঘ দেখা যায়॥
৬.
মনে দুঃখ পায় বাড়ি যায় ভাত নাহি খায়
এমন সময় মেয়ে এসে বাবার কাছে দাঁড়ায়॥
৭.
তখন বাবা বলে মেয়ের কাছে কী করি উপায়
মনে মনে আশা ছিল বিয়া দিব তোমায়॥

নতুন কলি

১.
শুনো বন্ধুগণ, দিয়া মন কলিরও ঘটনা
কলিকালের মেয়েগুলো মোটে ভালো না॥
২.
কলিকালের মেয়েগুলি রাস্তা দিয়া যায়
সুন্দর সুন্দর যুবক দেখলে বিয়া করতে চায়॥
৩.
হায় রহিম বাদশার একটি মেয়ে স্কুলেতে যায়
স্কুলেতে যাবার পথে দুইখান চিঠি পায়॥
৪.
তখন চিঠি পায় দৌড় দেয় যায় রান্নাঘরে
মনের সুখে খেয়েদেয়ে বন্ধুর কাছে আসে॥
৫.
যখন বন্ধুর কাছে আসে কেহ নাহি দেখে
অবশেষে একটি ছেলে হঠাৎ এসে পড়ে॥
৬.
তখন ছেলেটি বলে আরে ব্যাটা কী করিস এখন
ঘর থেকে মেয়েটি এসে বলে বিবরণ॥

www.pathagar.com

চিংড়িমাছ

১.

শুনো বর্গ যুবকবৃন্দ, তোমাদের জানাই
ভণ্ড কথা লিখি যদি ক্ষমা একবার পাই॥

২.

আস্তে আস্তে লিচির চাষ এসে গেল ভাই >লিচ=চিংড়ির ঘের
গরিব লোকে চিন্তা করে কী করি উপায়॥

৩.

চর বড়বাডিয়ার মন্টু বাবু লিচিও কাটিল
দশ থেকে বারো বিঘায় চিংড়ি মাছ ছাড়িল॥

৪.

ধীরে ধীরে মন্টু বাবু শামুক দিতে লাগে
খাবার খেয়ে মাছগুলো বাড়িয়া ওঠে॥

৫.

আস্তে আস্তে মাছগুলো মাতিয়া ওঠে
আট থেকে পাঁচ পর্যন্ত গ্রেডে আসে॥

৬.

গ্রেডে আসে মাছ বেচে টাকা অনেক পায়
টাকাগুলো নিয়ে মন্টু ঘরে রেখে দেয়॥

৭.

ঘরে রেখে মনে কয় বড়লোক হয়ে যাব
এমন সময় ঘরের বউয়ে টাকা চুরি করল॥

৮.

টাকা দেখে পাড়ার লোকে জ্বলিয়া ওঠে
ইরি ধান বাদ দিয়া সবে লিচি কাটিতে লাগে॥

৯.

এই পর্যন্ত করি ক্ষান্ত অনাদিকান্ত রচনা তাহার
সারা জীবন মনে রাখবেন মিনতি আমার॥

চিতলমারীর জারি

১.

শুনো বন্ধুবর্গ যুবকবৃন্দ, তোমাদের জানাই
উচিত কথা কয়ে যেন ক্ষমা এবার পাই।

২.

এই যে জারি চিতলমারী যাইয়া দেখ ভাই
মাস্টার একটি মেয়ে নিল খোঁজ তো তাহার নাই।

www.pathagar.com

৩.
কলি যুগের মাস্টারেরা ছাত্রীদের পড়ায়
ছাত্রীদের পড়াইয়া তারা প্রেমের শিক্ষা দেয়।
৪.
হায় চিতলমারী উপজেলায় পরীক্ষার জ্বালায়>জ্বালায়=কারণ অর্থে
দলে দলে ছেলেমেয়ে ভ্যান-সাইকেলে যায়।
৫.
একটি ছেলে একটি মেয়ে ভ্যানের উপর যায়
ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ রাখিয়া প্রেমের কথা কয়।
৬.
কয় তারা প্রেমের কথা গোপন কথা বোঝা নাহি যায়
অবশেষে ছেলেটারে রেস্টারি করে নেয়।> রেস্টারি= রেজিস্ট্রি/আদালতে বিয়ে অর্থে
৭.
রেস্টারি করে তর্ক করে বাপ-মা নাহি জানে
অবশেষে স্বামী ছাড়া কিছু নাহে চেনে।
৮.
এত বলি গুরুজনদের শিক্ষা নাহি হয়
তবুও তো ছেলেমেয়ে চিতলমারী যায়।

ময়নামতী

১.
ময়নামতী সুন্দর অতি চুয়াডাঙ্গা বাড়ি।
লাল কুচকুচ বেলাউজ তার টিয়া রঙের শাড়ি॥
২.
নামে শহরভানু সোনার তনু লম্বা মাথার চুল।
নাকে আছে নাক ফুরফুরি, দুলছে কানের দুল॥
৩.
আজ-কালের মেয়েদের ভাই এমনই ভাব হয়।
বেরাশিয়ার গায় দিয়া বৈদ্য'র মেলায় যায়॥ >বেরাশিয়ার=ব্রা, বৈদ্য'র মেলা=
স্থানীয়ভাবে প্রসিদ্ধ মেলা
৪.
এমন সুন্দর মেয়ে যদি বাড়ির পাশে থাকে।
ছেলেদের দোহাই দিয়া বড় লোকে ঢোকে
৫.
লোকটি যেমন ভালো ছিল বউটিও তার ভালো
তবুও তো পরের বউটি লাগে কত ভালো॥

www.pathagar.com

৬.

প্রেম করা ভালোবাসা কত যে মধুর
যে করছে প্রেম ভাই সে বড় চতুর॥

৭.

প্রেম করিয়া লাইলি-মজনু পাগল হইয়া যায়
প্রেম করিয়া সিরি-ফরাদ প্রেমের মজা পায়॥

জোছনা

১.

জোছনা রাত্রে আকাশ যেন মিটির মিটির হাসে
তবু আমি রই আমার প্রাণপ্রিয়ার কাছে॥

২.

ভালো যখন বেসেছি প্রিয়া আশ্বাস দিয়া যাই।
জীবনযুদ্ধে জয় করিব মনে রেখো তা-ই॥

৩.

আবার শিশুকাল গেল আমার মায়ের ভালোবাসাতে
যৌবনকাল গেল আমার প্রিয়ার রসেতে॥

৪.

আকাশেতে লক্ষ তারা মিটির মিটির হাসে
গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখি প্রিয়া আমার পাশে॥

৫.

আমরা সবাই প্রেম করি কাচের চুড়ি দিয়া
খটকা কথায় প্রেম ভাঙিল যা তা কেড়ে নিয়া॥

বাংলাদেশের কথা

১.

শুনো সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন
বাংলাদেশের ইতিকথা শুনো দিয়া মন॥

২.

যত যুবতী নারী সারি সারি বুক ফুলিয়া ধায়
টেডির জ্বালায় দেশটা আজ রসাতলে যায়॥

৩.

যায় রসাতলে ছেলে বলে টেডি মেয়ের দলে।
রাস্তাঘাটে সবে তারা দলে দলে চলে॥

৪.

চলে দলে দলে হেসেখেলে পাড়ার পরে দায়
বিকালবেলা পড়লে পরে মেয়ের মেলা মিলায়॥

www.pathagar.com

৫.
মেলে মেয়ের মেলা বাঁধায় জ্বালা পুরুষকে বলে
বাড়ি ছেড়ে কানাচ দিয়া বেঁকিয়া চলে॥

৬.
যায় কলেজ দিয়া পিছন দিকে ফিরে নাহি চায়
মেয়ের দলে মন খুশিতে গড়াগড়ি যায়॥

৭.
মুখে হরি বলে কলম তুলে লইলামও হাতে
বাসনা হইল দুঃখে কবিতা লিখিতে॥

৮.
কবি বর্ণিক বলে রং মেখে দিলাম এবার আড়ি
একটি কথার জবাব পেলে উঠে যেতে পারি॥

ব্যাঙ্গ গান

১.
শোনো ভাইরে ভাই, বলে যাই করি নিবেদন
বাংলাদের মেয়ের কথা শুনো দিয়া মন॥

২.
চোচ-পায়জামা পরে ভাইরে, টাইট ফিটিং জামা গায়
রানাঘাটের মেলের মতো ধাপ্পা মেরে যায়॥

৩.
কাজলটানা আঁখি মেয়ের বডিজ বান্ধা বুকে> বডিজ= মেয়েদের বক্ষবন্ধনী
তবু বলে এসো বন্ধু বাঁচি না লজ্জাতে॥

৪.
সেদিন ঢোকলাম বাজারেতে তিনটি মেয়ে ঢোকে
বয়স তাদের পুরাপুরি হালকা পোশাক পরে॥

৫.
আর এক কাণ্ড লণ্ডভণ্ড শুনো দিয়া মন
তাস খেলার কথা বলিব এখন॥

৬.
যে খেলিবে তাস তার গুদি যাবে বাঁশ
যে করবে মানা তার চোখ হবে কানা॥

৭.
বাবু কাজ করে না কাম করে না
রাত দুপুরে এসে বলে ভাত দে আমারে॥

www.pathagar.com

৪. ময়নাগান

চৈত্র মাসের শেষ দিকে ৮ থেকে ১০ জন গায়ক, বাদক, ও পারফর্মার দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি এই গান গায়। সাথে ঢোল, হারমোনিয়াম, করতাল, বাঁশি বাজানোর জন্য অভিজ্ঞ লোক। গান শেষে বাড়ির মালিক খুশি হয়ে গানের দলকে চাল বা টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করেন। প্রাপ্ত অর্থ চৈত্র সংক্রান্তির আড়ং এবং বৈশাখী মেলায় অর্থ এক সাথে খরচ করা হয়। শখে এ গান গাওয়া হয়। মূলত সামাজিক অসংগতি তুলে ধরা এ গানের লক্ষ্য। কেউ টেডি মহিলা সাজে, কেউ মোল্লা, কেউ বাবু, ছেঁড়া লুঙ্গি, প্যান্ট পরে সমাজের পুরুষ চরিত্রের ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপন করা হয়। কারও হাতে ব্যাটারি দিয়ে তাবিজ বাঁধা হয়। কারও হাতে বাঁকা লাঠি, হুকা, খালুই ইত্যাদি থাকে।

মুখে হরি বলে কলম তুলে
লহিলামও হাতে
বাসনা হইলো দুখের
কবিতা লিখিতেরে ময়না।

আমি বলে যাই শুনো ভাই
এ যুগের রীতি
সংসারের অভাব ঘুঁচাতে
এই কার্যে হও ব্রতী।

মাত্র একটি ছেলে একটি মেয়ে
ইহার বেশি নয়
জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানিলে
সকল অভাব যায়।

হবে সুশিক্ষিত রবে না তো
আর কোনো অভাব
স্কুল-কলেজ গড়ে তোল
বিদ্যার হোক প্রভাব।

তবে থাকবে ভালো, জ্বলবে আলো
প্রতি ঘরে ঘরে
ক্ষেত-খামার করিও সবে
অতি যতন করে।

অন্ধ দাসে বলে এমনি হলে
সবাই রবে সুখে
ধন্য হবে সোনার বাংলা
প্রাণ জুড়াবে দেখে।

www.pathagar.com

১.
আর এক কাণ্ড লণ্ডভণ্ড শুনো দিয়া মন
পলাশ ও টেক্সির কথা বলিব এখন॥
২.
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে টেক্সি দেখতে যায়
চলার গতি দেখে তারা পেয়ে গেল ভয়॥
৩.
পলাশ বাবু টেক্সির পাছে ছোটে খালিখালি
আনিতে পারে না তাকে হাতের পালি পালি। > পালি
পালি= উপযুক্ত অবস্থান
৪.
টেক্সি বললে ভুল হবে ভাই একটি মেয়ের কথা
অনেক চেষ্টা করে ও পরে সব হয়ে যায় বৃথা
৫.
যাব বৃন্দাবন বাধাঁয় গোল একি হলো জ্বালা
কিছু ছেলে তাহার গলায় পরাতে চায় মালা॥
৬। বেল পাকিল আম পাকিল পাকিল গাছের কলা
এ দেশের এই মাস্তান ছাড়া ধরব কাদের গলা
৭.
স্কুল-কলেজে একদল আছে বড় কথা কয়
বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া মাস্তানি দেখায়॥
৮.
সামনা-সামনি বেশি কিছু বলতে চাই না ভাই
এই কবিতা এখানেই শেষ করিয়া যাই॥

৫. হাচিয়াগান

পৌষ মাসের শেষ দিকে রাতের বেলায় ৮ থেকে ১০ জন দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি এই গান গায়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে ঢোল, হারমোনিয়াম, করতাল, বাঁশি। সন্ধ্যা থেকে শুরু করে শীতের মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এ গান। একজন হ্যাজাক বাতি নিয়ে দলের সাথে সাথে চলে। গান শেষে চাল জোগাড় করার দায়িত্বও তার ওপর থাকে। বাস্তুঠাকুরের পূজার আয়োজন করতে এ গান গাওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির রাতে মাটির কুমির তৈরি করে বাস্তুপূজা সম্পন্ন করা হয়। গান শেষে বাড়ির গৃহিণী খুশী হয়ে চাল বা টাকা দিয়ে গানের দলটিকে বিদায় করেন। চিতলমারীর উত্তর অংশে (গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া) একে হালুই গাওয়া বলে।

হায়-হায় ওরে, শুনো সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন,
মহিন বাবুর শেষ জীবনী করিব বর্ণন।

www.pathagar.com

হায়-হায় ওরে তাহার একটি পুত্র ছিল মদন তাহার নাম,
সুশিক্ষিত হয়ে শেষে এই তার পরিণাম।

হায়-হায় ওরে যুগের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বুদ্ধি হলো ক্ষীণ,
পিতা মাতা না মানিয়ে নিজে হয় প্রবীণ।

হায়-হায় ওরে অর্থের জোরে অহংকারে কুকর্মেতে মাতি,
অমতে করিল বিয়া সুন্দর এক যুবতী।

হায়-হায় ওরে স্ত্রী-বাধ্য সব বিরুদ্ধ করে আচরণ, > স্ত্রী-বাধ্য= স্ত্রৈণ
মাতা-পিতার প্রাণে ব্যথা দিচ্ছে সর্বক্ষণ।

হায়-হায় ওরে সেই শোকেতে পিতা মরে, মাতা হলো বুড়ি,
অনাহারে রাখত তারে দিয়ে ঝাটার বাড়ি।

হায়-হায় ওরে কর্ম ফলে হস্ত পদ পড়িল তাহার,
সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা লীলা চমৎকার।

হায়-হায় ওরে দীন অন্ধ দাসে বলে চল সুপথ ধরে,
কুকর্ম ছাড়িয়া ধর্ম করো একত্তরে। >একত্তরে=একত্র

৬. বারাশিয়া গান

ভাদ্র মাসে কৃষকেরা জমিতে ধান নিড়াতে গিয়ে এ গান গেয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

ওরে তিন সখী যায় জল আনিতে রে
ও তার মধ্যের সখী কালো,
ওরে আগের সখীর দাঁতে মাজন
ঘাট করেছে আলো। ও সখীরে...

ওরে দাঁড়াও দাঁড়াও ও কমলারে
শুনো মনের দুটো কথা,
তোমায় দেখলে জাগে ভালোবাসা
ওরে বাড়ে আশা লতা। ও সখীরে...

শুনে কমলা কয় ও বিদেশি গো
আমি শুনে লাজে মরি
তুমি কী কথা কহিলে
সঙ্গে আরও দুই নাগরী রে। ও বিদেশি গো...

www.pathagar.com

তুমি মন বাঁধিয়ে যাও ফিরিয়ে রে
বন্ধু কাল আসিয়ো একা,
আমি আসব নতুন কলসি লইয়া
যখন হবে ফাঁকারে। ও বিদেশি...

চলিলাম চলিলাম কমলা গো
তোমার মুখের কথা লইয়ো,
কাল এসে না পেলে দেখা
আমি যাইব মরিয়ারে। ও সখী...

ওরে কমলা কয়ে দিলাম তোমারে
বন্ধু আমার মাথার কিরা,
আসবা মাত্র পাবে দেখা
আমি না যাব ছাড়িয়ারে। ও বিদেশি...

আমার সনে করে আড়ি, বন্ধু কোলকাতায় করেছে বাড়ি রে,
আমি নারী একলা মরি কেঁদে।
আমার মনে বাড়ে চাওয়া পাওয়ারে,
শুধু বিরহের গান গাওয়া হলো সেধে।

আমার মতো কাকে পেয়ে, ও সে আমাকে গেছে ভুলিয়া রে,
থাকি কাকে লয়ে এ বসন্ত কালে।
থোকায় থোকায় আমের গুটি
ওরে ঝুলছে ডালে পরিপাটি রে,
দেখে বক্ষ ফাটে ভাসি আঁখি জলে।

যদি বন্ধু আসতো ফিরে, তারে বসাইতাম আদর করে রে,
দিতাম হাতে করে এই আম্র তার মুখে।
রাত্রি যখন হয় গো নিঝুম,
দুচোখেতে না আসে ঘুম রে।
কান্দে বনের কুসুম আমার সাথে জেগে।

৭. দেহতত্ত্ব গান

ভাঙন কূলে ঘর বাঁধিয়ে রবি কাল,
একদিন বৈশাখীর ভীষণ ঝড়ে
উড়বেরে তোর ঘরের চাল৷৷

চোদ্দ পোয়া ঘরের মাটি,
তাতে মাত্র দুটি খুঁটি,

www.pathagar.com

অসাবধানে রয়েছে তোর মাল।
ঘরে ঢুকেছে চোর জন কয়েকজন
দিনে সব করবে পয়মাল॥

ষোল জনে দল বাঁধিয়ে
তোরে মাতব্বর সাজিয়ে
দড়ি দিয়ে ঘুরায় চিরকাল।
একদিন লেগে ভাঙন সব আয়োজন
হয়ে যাবে তোর গোলমাল॥

৮. মেয়েলি গীত

মেয়েদের ফুল ভাসানো গান

ফাল্গুন মাসে এ গান গাওয়া হয়। হিন্দু ঘরের অনূঢ়া মেয়েরা মাটি দিয়ে 'দোল পিঁড়ি' তৈরি করে। ভোরে শিশির শুকানোর আগে সবাই মিলে বিভিন্ন ফুল তুলে দোল পিঁড়ি সাজায়। এর সামনে বিভিন্ন গান পরিবেশন করে, পরে ফুল নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। কথিত আছে যে, ভালো স্বামী পাওয়ার আশায় ফাল্গুন মাস জুড়ে প্রতিদিন ভোরে কুমারী মেয়েরা ফুল সংগ্রহ করে এ পূজা করে। এটা এক ধরণের মাসব্যাপী বসন্ত উদ্‌যাপন। পাড়ার যত মেয়েরা সবাই সমবেত হয়ে ফুল কুড়িয়ে দোল পিঁড়ি ঘিরে বসে এ গান গায়।

কুমড়োর ফুল ভাসাইয়া জলে,
আমরা কাঁদি বসে কূলে
আঁখি জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।

ফুল গো মোদের কথা নিয়ো
গিয়ে বন্ধুর পা'য় পড়িও
পরান প্রিয় রয়েছে যে দেশে।

যাচ্ছ নদী উজান বেয়ে
তোমার কাছে দেই করিয়ে
সব সখীদের মনের নিমন্ত্রণ।

জল ভরা তোমারি বুকে
আমরা কাঁদি বন্ধুর শোকে
কইয়ো গিয়া তাহারি শোধন।

আমরা হলাম কুল নারী
বনফুলে পূজা করি
স্মরি কেবল বন্ধুর চরণ।

www.pathagar.com

ভালো পতি পাবার আশে
আমরা কাঁদি ঘাটে বসে
পাইয়া এই ফাগুনের লগন।

৯. বিয়ের গান

বিয়ের দিনে প্রতিবেশি নারীরা এই গান গায়। বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না।

ঝটো-পটো ওঠোরে নীলা
আমার নৌকার মাঝেরে, নীলা শুনো হে।
নীলা বলে বসে কূলেরে মাঝি
একটু দাঁড়াও দেখি, ও বিদেশিরে।
ঘরে আছে আমার মা ধনরে মাঝি
জল ভরা তার আঁখি, ও বিদেশিরে।
মাকে বলে আসব চলেরে মাঝি
যাবো তোমার সাথেরে, ও বিদেশিরে।
না বলিলে মরবে জ্বলেরে মা ধন
বাহির হবে পথেরে, ও বিদেশিরে।
মাঝি কহে আর না সহেরে নীলা
খুলে দেব তরী, নীলা শুনোহে।
দাড়ি-মাঝির আটক হবেরে নীলা
জোয়ার গেলে সরিরে, নীলা শুনোহে।
ঘরে আছে সুন্দর শাড়িরে নীলা
তাইতে লিখে এসোরে, নীলা শুনোহে।
ধরে শাড়ি দেখবে পড়িরে নীলা
বলা হবে শেষরে নীলা শুনোহে।

গায়ে গলুদ এর পরবর্তী মজার ও আনন্দঘন অনুষ্ঠান বিয়ের মূল অনুষ্ঠান। মজার মজার আলোর বাতি, গান, নাচ এর পাশাপাশি আনন্দ উল্লাস-বিয়ের গানের মধ্যে-

বেলা দুই প্রহরের কালে
লতিফ যায় মরিচ বনে
বেছে বেছে তুলবো মরিচ
যাব সাহেব বাজারে
যাব গাবতলীর হাটে
নতুন চুড়ি উঠেছে
বেছে বেছে কিনব চুড়ি আয়না বসানো
চুড়ির মূল্য দশ আনা
গাটে আছে পাঁচ আনা,

www.pathagar.com

চুড়ি কেনা হলো না
আমার শ্বশুর তালুকদার
ভাসুর আমার দফাদার
নিজ পতি চাকুরি করে হুগলী জেলার পর
আমার চুড়ি কেনা হলো না।

১০. গাজির গান

এটি দক্ষিণ বাংলার একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। সাধারণত স্থানীয় গ্রামের জনপ্রতিনিধিরা এটি আয়োজন করে থাকে। আবার অনেকে আছে মানত করেন এমন একটি গাজীর গীতের আয়োজন করবে। এটি অনেকটা যাত্রা-পালার মতো কিন্তু অতটা সুসজ্জিত নয়। শীতকালে যখন মাঠ-ঘাট শুকিয়ে যায় তখন সাধারণত এই পালার আয়োজন করা হয়। এই পালায় ৭ থেকে ৮ জন সদস্য থাকে। তবে সকলেই ছেলে। ছেলেরাই মেয়েদের চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। পালার শুরুতে গাজী-কালুর স্মরণে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয় এবং তারপর শুরু হয় পালা। পালার শেষে আকর্ষণীয় নাচ গানের ব্যবস্থা থাকে সারা রাত চলে এ অনুষ্ঠান। এক রাতে ২-৩টি পালাও অভিনয় করে থাকেন শিল্পীরা। এদেরকে সাধারণত ভাড়া করে আনা হয়। যেমন- অরুণ বালার পালা, দিদার বাদশার পালা, গাজী-কালু-চম্পাবতির পালা ইত্যাদি লৌকিক কাহিনি অভিনীত হয় এই গাজীর গীতে। আলো মতির পালা খুবই জনপ্রিয় একটি পালা।

আমি আলো একা বাড়ি থাকি
জল খাইতে গিয়েছিলাম দিনভিখারির বাড়ি
কে আনিয়া দিল জল,
মানুষ কিবা পরী
আমি আলো একা বাড়ি থাকি।

কমলার বনবাস একটি জনপ্রিয় পালা গান–

কমলার বয়স ষোল
হাতে ছিল প্লাস্টিকের চুড়ি
গলায় ছিল পুতির মালা, পরনে
লাল শাড়ি কমলার বয়স-
ছোবানের বয়সের কুড়ি
বেচে মুড়ি
কি কহিব হায়
তার ভিতরে কমলার দিকে
আড়ে আড়ে চায়
ছোবানের বয়স কুড়ি ॥

www.pathagar.com

এ সকল পালা গানে গ্রামের মা, বোন পরিবারের সকলে একত্র বসেই দেখত। আগের দিনের মানুষেরা খুবই সংস্কৃতমনা ও আনন্দপ্রিয় লোক ছিল। এখন আর এসব গাজীর গীত খুব একটা দেখা যায় না। কালের বিবর্তনে ও যুগের চাহিদায় এখন আর মানুষের মধ্যে এমন উৎসাহ দেখা যায় না। এ সকল অনুষ্ঠান ধরে না রাখলে আমাদের সংস্কৃতি থেকে এগুলো হারিয়ে যাবে।

১১. রয়ানিগান

বিধবা মীরা রানী বিশ্বাস প্রায় ৩০ বছর যাবত রয়ানী গান করে জীবিকার্জন করছেন। দলের নাম মীরা সম্প্রদায়। বর্তমানে তার দলে ৭ জন সদস্য আছে। মীরা নিজে মূল গায়িকা, অন্যরা যন্ত্রশিল্পী এবং দোহার বা সহযোগী। দলের একজন মাস্টার আছে তার নাম মনোরঞ্জন ডাকুয়া। এদের ঠিকানা হলো বড় হরিপুর, শৈলখালী, মোরেলগঞ্জ থানা, বাগেরহাট জেলা।

কবি বিজয় গুপ্তকে রয়ানী গানের জনক বলা হয়। ভাষ্য মতে ১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে নিরক্ষর কবি বিজয় গুপ্তকে স্বপ্নে গান লিখতে আদেশ করেন মা মনসা। মনসা হিন্দুদের সাপের দেবী। প্রকৃতপক্ষে পদ্ম পুরাণের উপর ভিত্তি করে মনসামঙ্গল লেখা হয় আর মনসা মঙ্গলের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে রয়ানী গান। এই গানে মোট ২২টি পালা আছে। সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিন ধরে একনাগাড়ে এই গান এক বাড়িতেই গাওয়া হয়। সন্ধ্যা বেলায় শুরু হয়ে রাত ১১-১২ টা পর্যন্ত চলে। সাপের ভয় বা সাপে কামড়ালে এমনকি সাপ দেখলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো কোনো লোক এই রয়ানী মানত করতেন। এখন কিছু কমলেও মোরেলগঞ্জ উপজেলায় এর যথেষ্ট প্রচলন আজও আছে। উঠানে চারপাশে শ্রোতা বসেন এবং মাঝখানে গায়েনরা বসেন। মূল গায়েন উঠে দাঁড়িয়ে গান পরিবেশন করেন। কখনও কখনও দোহাররাও উঠে দাঁড়িয়ে গান করে থাকেন।

বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রধাণত হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল এবং করতাল প্রধান। গানের মাঝে মাঝে কৌতুক পরিবেশিত হয়। দর্শক-শ্রোতারা তা বেশ উপভোগ করেন। রয়ানীতে এমনই এক কৌতুক পালার নাম নাপিত-নাপিতানীর বিসম্বাদ। ২২টি পালার মধ্যে স্বপ্ন অধ্যায়, পদ্মার জন্ম, মনসার জন্ম, পদ্মার বনবাস, পদ্মার বিবাহ, রাখাল বাড়ি পালা, ঝালুবাড়ির পালা, লক্ষ্মীন্দরের জন্ম, বিবাহ, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি পালা প্রধান। পালাগুলির মধ্যে সব থেকে ছোট পালা স্বপ্ন অধ্যায় আর সব থেকে বড় পালা হলো ভাসান পালা। স্বপ্নঅধ্যায়ে সময় লাগে সর্বোচ্চ ২০ মিনিট আর ভাসান পালায় সময় নেয় কমপক্ষে ৬/৭ ঘণ্টা।

রয়ানীর কাহিনি হলো কশ্যপ মুনীর দুই স্ত্রী কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর সহস্র সন্তান-নাগলোক, সবাই সর্প। বিনতার ২ সন্তান অরুণ ও গরুঢ়। গরুঢ়ের সাথে সর্পরাজদের বিরোধ। এসব বিরোধ নিয়ে বিরাট একখানি পুরাণ আছে যার নাম পদ্মপুরাণ।

এই কদ্রুই হলেন পরবর্তী জন্মে মনসা। চাঁদ সওদাগর শিবের উপাসক। তাই তিনি মনসার পূজা দিতে রাজি নন। মনসার জেদ তারও চাঁদের পূজা চাই। চাঁদ সওদাগরের ৬টি পুত্র সাপের কামড়ে মারা গেলে সপ্তম সন্তান লক্ষ্মীন্দরকে মনসা হত্যা

www.pathagar.com

করলে, তার স্ত্রী বেহুলা সুন্দরী কলার ভেলায় স্বামীকে ভাসিয়ে নিয়ে দেশ দেশান্তর পেরিয়ে শেষে স্বর্গে জমরাজাকে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনেন। এদিকে চাঁদ সওদাগর বা হাত দিয়ে মনসাকে ফুল দিলেন, সেই থেকে মর্তলোকে মনসার পূজা শুরু। এই কাহিনীই ২২টি পালায় রয়ানী গানে বর্ণনা হয়।

বর্তমানে মোরেলগঞ্জের ১টি মাত্র রয়ানীর দল মীরা সম্প্রদায়ে যে ৭ জন শিল্পী আছেন তারা হলেন–

১।	মনোরঞ্জন ডাকুয়া	শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাস
২।	মীরা রানী বিশ্বাস	শিক্ষাগত যোগ্যতা : সপ্তম শ্রেণি পাস
৩।	নমীতা রানী দেবনাথ	শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণি পাস
৪।	কানন বালা মৌলঙ্গী	শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি পাস
৫।	কেশব দেবনাথ	শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি পাস
৬।	সুমন মিস্ত্রী	শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণি পাস
৭।	জয়ন্ত মৃধা	শিক্ষাগত যোগ্যতা : চতুর্থ শ্রেণি পাস

কবি বিজয় গুপ্তের পাণ্ডুলিপি থেকে সংযোজিত হলো রয়ানী গান :

রাত্রিতে বিপুলাসহ লক্ষীন্দরের
লোহার বাসরে গমন

দিশা : প্রাণে নিষেধ মানে না ও সজনী।
বিপিনে শুনিয়া বাঁশির ধ্বনি।

নবীন নাগর যত বণিক্য নন্দন।
মনোহর অশ্বে তারা করিলা গমন॥
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী বাজে শুনিতে রসাল।
ঢাক ঢোল ভেরী বাজে সুললিত তাল॥
মল্লে মল্লে খেলা করে পথের উপর।
বাজিকরগণে বাজিকরে নিরন্তর॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে কীর্ত্তী গায় ভাটে।
বিদ্যাধরী নৃত্য করে তাল বায় নটে।

আগে দুষাদুরগণ (১) চলে শতে শতে।
নাগর-নাগরীগণ চাহে চারিভিতে (২)॥
পুত্রবধু সঙ্গে চান্দে পরম সন্তোষ।
বেলা অবসানে গিয়া পুরীতে প্রবেশো॥
চম্পক নগরে মতো নর নারী আছে।
অনুব্রজে (৩) নিতে আসে চন্দ্রধরের কাছে॥
সনকা প্রদান করি যত নারীগণ।

www.pathagar.com

জয় জয় জোকার পুরিল সর্বজন॥
সুধাময়ী সহিতে সতেক বিদ্যাধরী।
সবাকার সঙ্গেতে আসিলা পাটেশ্বরী॥
দেখিয়া বধূর রূপ সনকা সুন্দরী।
কোলে বসাইল তুলি বধূরে আদরি (৪)।

বিপুলা বধূর সঙ্গে চান্দের কুমার।
পায়ে পড়ি জননীরে করে নমস্কার॥
পুত্রবধু কোলে করি বসি হরষিতে।
সুমিষ্ট সন্দেশ দিলা দু'য়েরে (৫) খাইতে॥
লজ্জায় কাতর কন্যা রহে মাথা হেঁটে।
কিছু খেয়ে লক্ষীন্দর কোল হতে উঠে॥

বধূরে আশীষ দিলা বিশেষ প্রকার।
গলে দিলা সাত ছড়া মানিক্যের হার॥
সঙ্গেতে ছিলেন যত বরষাত্রিগণ।
সদাগরে সকলেরে করে সম্ভাষণ॥

শব্দার্থ : ১। পাইকগণ। ২। চারিদিকে। ৩। প্রত্যুদগমন করিয়া।
৪। আদর করিয়া। ৫। দুইজনকে।

ঘরে গিয়া সনকায়ে করিলা রন্ধন।
ইষ্টমিত্র লয়ে সাধু করিলা ভোজন॥

দিবা অবসান হইল রজনি আসিল।
সনকারে সদাগর তখন বলিল।
বিপুলা বধূর সঙ্গে পুত্র লক্ষীন্দরে।
অদ্য রজনীতে রাখ লোহার বাসরে॥
যামিনী যাপন যদি হয়ত কুশালে।
তবে আর প্রমাদ না হবে কোনো কালে॥

সনকায়ে কহে নাথ কী বলিব তোমা।
নাগ সনে বাদ কেন নাহি দেও ক্ষমা (১)॥
চান্দ বলে নাগে মোরে কী করিতে পারে।
ব্রাম্মণী যে দিছে গালি শঙ্কা করি তারে॥

এত শুনি সনকায়ে চান্দের বচন।
মন্দির ভিতরে গেল সখিগণ॥
সখিরা বাসর ঘর সাজাতে লাগিল।
হীরামনি মাণিক্যাদি স্তরে স্তরে দিলা॥
সুবর্ণ পালঙ্কে শোভে নেটের মশারি।

www.pathagar.com

নানাবিধ পট্ট বস্ত্র রাখে সারি সারি॥
গৃহের চৌদিকে নানা চিত্র আরোপিল (২)।
কত বা কহিল সংক্ষেপে রচিল॥

ব্রহ্মা চিত্র আছে তাহে সহিতে ব্রহ্মাণী।
বৃষভ বাহনে শিব সহিতে ভবানী॥
গরুর বাহনে চিত্র দেব নারায়ণ।
বাণী কমলার চিত্র অতি সুশোভন॥
ঐরাবত পৃষ্ঠে চিত্র দেব পুরন্দর।
শচী চিত্র সহ আছে জয়ন্ত কোঙর (৩)॥
চন্দ্র সূর্য্য চিত্র শোভে অনল পবন।
যম শনি চিত্র তাহে রুদ্র হুতাশন॥
রামচন্দ্র কার্ত্তিক চিত্রিত গণপতি।
একে একে চিত্র তাহে যত দেব ইতি॥
বলভদ্র মদন চিত্রিত দুইজন।
যশোদা রোহিনী আর নক্ষত্র গগন॥

শব্দার্থ : ১। ক্ষান্ত। ২। আঁকিল। ৩। পুত্র।

কাত্যায়নী চিত্রিত বশিষ্ঠ অরুন্ধতী
অহলা দ্রৌপদী গীতা তারা বসুমতী॥

নবগ্রহ বেষ্টিত চিত্রিত দেবরাজ।
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মুনির সমাজ॥
বৃহস্পতি শুক্র আর গন্ধর্ব সকল।
অপ্সর কিন্নর যত যক্ষ রক্ষ দল॥

চিত্রসনে আদি করি যত বিদ্যাধর।
হিমালয় বিন্ধ্য আর যতেরু ভূধর॥
লবণ সমুদ্র করি যতেক সাগর।
নদ-নদী আছে তাহে যত চরাচর॥

ভূবন উপরে চিত্র সাজে বৃন্দাবন।
নানা পক্ষী ক্রীড়া করে তাহার সদন॥
কোন স্থানে পক্ষী সব যোগায় আহার।
দীর্ঘ সরোবর যত শোভিছে অপার॥

চাঁপা নাগেশ্বর আর লবঙ্গ মালতী।
কমল উৎপল চিত্র কুন্দ আর যুথী॥
কাঙ্কুল মহিষ আর ভল্লুক বানর।
যত চিত্র গড়িয়াছে অতি মনোহর॥

www.pathagar.com

সনকায়ে বলে তবে প্রিয় সহচরী।
ভক্ষ্য দ্রব্য বাসরেতে রাখ যত্ন করি॥
এত শুনি সখিগণে যোগান ধরিল।
নানাবিধ দ্রব্য আনি ঘরেতে রাখিল॥
দধি, দুগ্ধ, গুড়, চিনি, মিষ্ট, নারিকেল।
দাড়িম্ব, কদলী, আয়, আম্র, আত্মা, শশা, বেল॥

এইরূপে নানা দ্রব্য রাখে কৌতুহলে।
ভৃঙ্গার রাখিল ভরি সুবাসিত জলে॥
বাটা ভরি রাখিলেক কর্পুর তাম্বুল।
লবঙ্গ এলাচী যত রাখিল বহুল॥
নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য রাখিল বিস্তর।
খাইবারে পুত্রবধু মঞ্জুস (৪) ভিতর॥

শব্দার্থ : ৪। লোহার ঘর।

দিশা ও-ও রসের ভ্রমরারে
মধুলোভে মত্ত হয়ে উড়ে পদ্মবনে রে।
রক্ষা বিধান করি চন্দ্রধর সাধু।
লোহার মন্দিরে নিয়া রাখে পুত্র বধূ॥
পুত্রবধূ ঘরে রাখি চান্দ অধিকারী।
মন্দির বেড়িয়া দিল কটক প্রহরী॥
অস্ত্রহাতে সাবধানে থাকিবা সবায়।
খাড়া জাগরণে যেন রজনী পোহায়॥
এক গোটা সর্প আজি যেবা দিবে ধরে।
পঞ্চশত তঙ্কা (১) আমি দিবাম (২) তাহারে॥
উপরে সাঁচান পক্ষী রাখিল প্রচুর।
শত শত সর্প গ্রাসে কঙ্ক (৩) বাহাদুর॥
শত শত নকুল রাখিল চারিপাশে।
যাহার প্রভাবে তথা সর্প নাহি আসে॥

কাটোয়াল সঙ্গে দিলা বিংশতি নফর।
আজিকে সকলে তোরা জাগরণ কর॥
মুনসী করিয়া দিলা মামা সাত্রাজিতে।
মন্দির প্রহরী মামা থাক সাবহিতে॥
কটক প্রহরী দিয়ে রাজা চন্দ্রধরে।
পাটা (৪) হেন বুকে চান্দে রঙ্গরস করে॥

পুত্রবধূ রাখি চান্দ লোহার মন্দিরে।
মনসা শগুল বাদ্য করে ঘরে ঘরে॥

www.pathagar.com

হেমতাল কান্ধে নিয়া নাচে উবা ফলে।
চান্দ বড় ইতর জানকী নাথে বলে ॥
নিদ্রা যায় লক্ষীন্দর মন্দির ভিতরে।
জাগিয়া উঠিল তবে কতক্ষণ পরে॥
নিদ্রায় কাতর অতি হেরি বিপুলারে।
প্রিয়া প্রিয়া বলিয়া জানায় লক্ষীন্দরে॥
মুখেতে চুম্বন দিল চান্দের নন্দন।
চমকিত হয়ে কন্যা-উঠিল তখন॥

শব্দার্থ : ১। টাকা ২। দিব। ৩।
সর্পভুক বিশাল পাখি। ৪। অচঞ্চল, দৃঢ়।

একে অন্যের ভক্ষণ করে দোহে।
কামভাবে লক্ষীন্দর বিপুলাকে কহে॥
লক্ষীন্দর বলে যদি আমি পাশা হারি।
শতেক মাণিক্য দিব শুনহ সুন্দরী॥
তুমি যদি হার মোরে দিবা আলিঙ্গন।
দুজনে করিলেক হেন যত পণ॥

মাথা হেঁট করি কন্যা রহিল তখন।
চুম্বন দিয়া লক্ষীন্দরে তুলিল বদন॥
পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার দাগ।
অমৃত পুরান বাণী করিল প্রকাশ॥

লাচাড়ী

না বল না বল প্রভু রে, কালরাত্রি দিনে।
শুনিলে হাসিবে ইহা, ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥
আমি ত অবলা প্রভু রে, অকুমারী নারী।
চিত্তে ক্ষমা দিয়া থাক, দিন দুই চারি॥
কমলা কলিকা পুষ্প রে, (প্রভু) মকরন্দহীন (১)।
তাহাতে ভ্রমরা নাহি, বসে কোন দিন॥
যদি পুষ্প বিকশিত হয় কাল পাইয়া।
মধুকরে মধু খায় তাহাতে বসিয়া॥
অপক্ক দাড়িম্ব প্রভু রে, স্বাদ বিবর্জিত।
পাকায়ে খাইলে প্রভু তাহে হৈবে প্রীত॥
বিপুলা লখাইরে কহে কত মিষ্টভাবে।
পণ্ডিত জানকী গায়, মন অভিলাষে॥

শান্ত হৈলা লক্ষীন্দর, বিপুলার বোলে।
বিধির লিখন যা খন্ডে না কোনো কালে॥

www.pathagar.com

আর বার বলে শুন, ওহে সুবদনী।
ক্ষুধায়ে শরীর পুড়ে, অন্ন দেহ আনি॥

উঠিয়া রন্ধন কর সায়ের কুমারী।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ, সহিতে না পারি॥
উজানী নগরে যাই, শ্বশুর আবাসে।
লজ্জায় না খাই ভাত, যদি মন্দ বাসে (২)।

শব্দার্থ : ১। মধুহীন। ২। বলে।

তোমার ভ্রাতার বধূ তারকা সুন্দরী।
শুধু জল ঢালি দিল, ঘৃত দেয় করি॥
তোমার বাপের বাড়ি, একশত দাসী।
লাজে না খাইনু দেখে, গৃহছিদ্রে আসি॥

শুনিয়া স্বামীর বাণী, বলে সুহাসিনী।
ধীরে ধীরে কহে কথা, শুখপাখি যিনি॥
মন্দিরে নাহি যে অগ্নি নাহি আছে জল।
কেমনে রান্ধিব অন্ন না দেখি সম্বল॥

প্রদীপ অনল আছে, কাটিয়া চন্দন।
উপহার দ্রব্য যোগে, করহ রন্ধন॥
জানকীনাথের বাণী, শুনোগো সুন্দরী।
কাল ক্ষুধা নিবারণ, কর শীঘ্র করি॥

পয়ার

লক্ষীন্দর বাক্যে কন্যা অন্যথা না করি।
উদ্যোগ করিতে খায় রান্ধিতে সুন্দরী॥

কন্যা বলে রন্ধনের দ্রব্য কিছু নাই।
করিব রন্ধন কিসে ভাবিয়া না পাই॥

শিয়রে মঙ্গল ঘট আছে তাহে জল।
নারিকেল ফল আছে প্রদীপে অনল॥

রন্ধন করিয়া কন্যা এই দ্রব্য যোগে।
নিবারণ কর প্রিয়া কালক্ষুধা রোগে॥

লাচাড়ী

নারিকেল তিন ঘোটে, পাখাল(৩) করিল ঝাটে,
নেত বস্ত্রে অনল জালিল।
নৈবেদ্য ভণ্ডুল দিয়া, ঘটে জল চড়াইয়া,
ঘৃত অন্ন বন্ধন করিল॥

www.pathagar.com

শব্দার্থ : ৩। চুল্লী, উনুন।

বিপুলা রন্ধন করে, নিদ্রা যায় লক্ষীন্দর,
কালনিদ্রা সহিতে না পারে।
রন্ধন সম্পন্ন হৈল, বিপুলায়ে জানাইল,
উঠিয়া ভোজন করিবারে॥
বেহুলা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে, উঠে বসি লক্ষীন্দরে,
ঘৃত অন্ন করিলা ভোজন।
ভোজন করিয়া সুখে,তাম্বুল দিলেন মুখে,
তুষ্ট হৈলা বণিক্য নন্দন॥
শয়ন করিল গিয়া, অতি হরষিত হৈয়া,
বামে কন্যা শুইল তখন।
অর্ধ নিশি হৈল গত, কালনিদ্রা অভিভূত,
জানকীনাথের সুবচন॥

পয়ার

সুখে নিদ্রা যায় দোঁহে মন্দির ভিতর।
হেনকালে চন্দ্রধর আসিল সত্বর॥
চান্দে বলে কটোয়াল কোন চিন্তা নাই।
সুপ্রভাত হইল কালিরে দিব ছাই॥
এই কথা বলি চান্দ নগরেতে গেল।
নাটগণে অবিলম্বে ডাকিয়া আনিল॥
জয়ঢাকে বাদ্য বায় আর পারে গালি।
আর কি করিবে মোরে নিলাজী
মনসা-মুগুন বাদ্য দিয়া নগরেতে।
হাস্য মুখে শুইলেন সনকা সহিতে॥

পদ্মাভবনে নাগগনের আগমন ও লক্ষীন্দরকে
দংশনের প্রয়াস।
দিশা : করুণাময়ী তারিণী।
আমার কপালে কি আছে জানি॥
নেতা বলে পদ্মাবতী শুনহ বচন।
নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ না বুঝি কারণ॥
বান্ধিয়া লোহার ঘর চান্দ সওদাগরে।
পুত্রবধূ রাখিয়াছে লোহার বাসরে॥
আজি যদি না মরিলা সুন্দর লখাই।
রাত্রি গত হৈলে তার মৃত্যু আর নাই॥
যে প্রকারে কার্য সিদ্ধি হয় আপনার।

www.pathagar.com

ত্বরা করি চিন্ত ভগ্নী সেই প্রতিকার॥
পদ্মা বলে শুন নেতা আমার উত্তর।
আনহ সকল নাগে আমার গোচর॥
ধামেনা নাগরে নেতা কহিল ত্বরিতে।
নাগ সব আনিবার চল পর্বতে॥
ধামেনা চলিয়া গেল যথা গিরিবর।
তাহরে দেখিয়া নাগ পলায় সত্বর॥
ভয় পেয়ে নাগ যদি গেল পলাইয়া।
মণিরাজ নামে নাগ জিজ্ঞাসে আসিয়া॥
অরুণ জিনিয়া তার শরীরের জ্যোতি।
যেই স্থানে থাকে নাগ নাহি দিবা রাতি॥
পঞ্চশত নাগসহ আসে মণিরাজ।
পদ্মাবতী বলে মোর সিদ্ধি হবে কাজ॥
অনন্তাদি নাগ আসে পদ্মার আদেশে।
দশশত নাগ তার সঙ্গে সঙ্গে আসে॥
দরশনে ভয় পায় ত্রিদেশের লোকে।
নাগ আসি তবে বলিলা পদ্মাকে॥
প্রণাম করিল আসি মায়ের চরণে।
জনে জনে আশীর্বাদ দিলা নাগগণে॥
হিমালয় উপরেতে কৈলাস ভূধর।
আছিল তক্ষক নাগ তাহার উপর॥
পঞ্চ শত ফনাশিরে দ্রুতগতিতে আসে।
দ্বিতীয় সূর্যের প্রায় আকাশে প্রকাশে॥
বিন্ধাচল গিরি ছাড়ি আসে অজগর।
পাঁচশত নাগ সহ আসিল সত্বর॥
তিন ক্রোশ পথ জুড়ি যাহার প্রহরী।
যোড় হাতে দাঁড়াইল নমস্কার করি॥

দেখি বলে এসো ভাই, কিছু দুগ্ধ খাও তাই,
শুনি নাগ খাইতে লাগিল।
ভান্ডে নোয়াইল মুখ, দুগ্ধ খায় বিষমুখ।

হরবৃদ্ধ নামে গিরি অরণ্যের মাঝ।
তথা হতে আসিলেন মহীরাজ॥
অষ্টশত নাগ আনে সেই অধিকারী।
পঞ্চ ক্রোশ পথ জুড়ি তাহার প্রহরী॥
পদ্মার চরণে আসি নোয়াইল মাথা।
তাহা দেখি পদ্মাবতী হইলা হরষিতা॥

www.pathagar.com

কর্কটাদি নাগ আসে যঞ্জগিরি হৈতে।
একাদশ নাগ তাহার সহিতে॥
পদ্মার সাক্ষাতে আসি রহে নত শিরে।
হরষিত মনে দেবী আশীর্বাদ করে॥

মৈনাক পর্বত হৈতে শঙ্খচুড় যায়।
অগণিত অনুচর সঙ্গে সঙ্গে ধায়॥
আসিয়া মিলিল নাগ পদ্মার সকাশে।
মনসা প্রণাম করি হর্ষ মনে বসে॥

আসিলা অনন্ত নাগ দেখে লাগে ত্রাস।
কোটি চন্দ্র যিনি যার শরীর প্রকাশ॥
যত ইতি নাগ হয় যাহার চাকর।
বন্দিল পদ্মারে আসে মাথার উপর॥

কানাই পর্বত হতে আসে কালরাজ।
আসিলেন নীল নাগ পদ্মার সমাজ॥
রক্ত কোকনদ যিনি শরীরের জ্যোতিঃ।
বহুশত নাগ আসে তাহার সংহতি॥
সিংহ যম দর্প করে মোদিনী কাঁপায়।
পদ্মার চরণে আসি প্রণাম জানায়॥

পাতালপুরী হইতে বাসুকি আসিল।
মনসা বন্দিয়া নাগ সভাতে বসিল॥

কৃষ্ণের আসন যার পটেতে নির্মাণ।
হেরিলে মানুষ হয় ত্রাসে কম্পমান॥
হুলস্থূল করি নাগ চায় আশে পাশে।
নাগের গর্জন শুনে প্রাণ কাঁপে ত্রাসে॥

ষাইট হাজার নাগ সঙ্গে করি লয়ে।
আইল উৎপল নাগ দ্রুত গতি ধেয়ে॥

পদ্মার নিকট আসি রহে করপুটে।
প্রণাম করিয়া বসে এক সঙ্গে জুটে॥

সুমেরু হইতে কেউটে আসিল।
এক লক্ষ নাগ সঙ্গে সত্বরে মিলিল॥
অনল জিনিয়া যার শরীরের জ্যোতি।
হরিতাল যিনি যেন সুন্দর মুরতি॥
দাঁড়াইয়া রহে সবে বান্দিয়া চরণ।
উজ্জ্বল করিয়া সভা অতি বিচক্ষণ॥

www.pathagar.com

ছাড়িয়া উদয় গিরি উদনাগ আসে।
নাসার নিশ্বাস যাঁর ত্রিভূবন নাশে॥
স্বর্গের অমরগণে যারে শঙ্কা।
তার সঙ্গে যত নাগ নাহি তার লেখা॥
পৃথিবী কম্পিত করে তাহার ফটকে।
পদ্মার চরণ বন্দি রহিল সম্মুখে॥
মন্দাকিনী হইতে মৃত্যুকাল আসিলা।
সারি সারি হয়ে নাগ হয়ে নাগ সভাতে বসিলা॥
ত্রিশ শত নাগ সনে মৃত্যুকাল আসিল।
পদ্মার চরণ বন্দি নিশব্দে রহিল॥

ধামেনা হইলা সর্ব নাগের দুয়ারী (১)
ধুরা নাগ বসিলেক হইয়া প্রহরী॥
আসিলা মাটিয়া সাপ গড়াগড়ি দিয়া।
জলে স্থলে যত নাগ আনিলা ডাকিয়া॥
তবে পদ্মা আসিলেন নাগের গোচরে।
রত্নময় ছত্র শিরে নেতা দেবী ধরে॥
ধনঞ্জয় নাগে তথা তাম্বুল যোগায়।
শ্বেত চামরেতে বাতাস করে গায়॥
পাত্র নেতা বামে বসে মনসা দক্ষিণে।
জিজ্ঞাসা করিলা পদ্মা শ্রেষ্ঠ নাগগণে।
আমার বিবাদ জান চন্দ্রধর সনে।
সবাকে এনেছি হেথা তাহার কারণে॥
পুত্রবধূ রাখিয়াছে লোহার মন্দিরে।
সেই আগর্বেতে (২) মোরে তিরস্কার করে॥

শব্দার্থ : ১। দাড়োয়ান। ২। অহঙ্কারে, গৌরবে।

দংশিয়া দেও ত আজি চান্দের নন্দন।
তবে সে হইবে মোর অভিষ্ট পূরণ॥

সবিনয়ে পদ্মাবতী নাগেরে বলিলা।
শুনিয়া বাসুকী নাগ প্রত্যুত্তরে দিলা॥
আমরা তোমারে করি মান্য অতিশয়।
আমারে এ কথা বলা উচিত না হয়॥
তন্ত্রমন্ত্র নাহি জানে সে ক্ষুদ্র ছাওয়াল।
ইহারে দংশিলে মোরে কে বলিবে ভাল॥
যে কার্য করিতে মোর সেবকেই পারে।
সে কার্য করিতে বল আমা সবাকারে॥
নাগের কথায় দেবী নিরাশ হইয়া।

www.pathagar.com

কী করিলে কী হইবে না পান ভাবিয়া।
পরিপূর্ণ নাগ সভা এখানে রাখিয়া।
আদিত্য নিকটে দেবী গেলেন চলিয়া॥
প্রণাম করিয়া দেবী রহিলা তখন।
তিমিরাত্রি বলে পদ্মা কেন আগমন॥
ত্রিভুবনে যত কার্য সব জান তুমি।
তোমার সাক্ষাতে দেব কি বলিব আমি॥
দেব হৈয়া মানবের হাতে পরাজয়।
সেই কার্যে তব স্থানে এসেছি নিশ্চয়॥
রাত্রিযোগ রাখ যদি অন্ধকার করি।
তবে সে আমার কার্য সাধিবারে পারি॥
আদিত্য কহিলা শুন জয় বিসহরি।
প্রকৃতির বসে আমি যাতায়াত করি॥
তোমার গৌরব আমি রাখিব নিশ্চয়।
কার্যসিদ্ধি হৈলে পরে হইব উদয়॥
সূর্যকে সম্ভাষা করি গেলা নিজ বাসে।
চিন্তাযুক্ত বিষহরি কার্য হবে কিসে॥
অতঃপর পুনরায় কহে পদ্মাবতী।
সমাদর করি অতি অনন্তের প্রতি॥
দংশিয়া দিবায় (১) মোরে ভালা লক্ষ্মীন্দর।
তবে সে আমারে পূজে চান্দ সদাগর॥

শব্দার্থ : ১। কামড়াইয়া দিত।

অনন্তে বলয়ে শুন শঙ্কর-নন্দিনী।
আপনি জানিয়া কেন বল হেন বাণী॥
দেবাসুর নর নাগ অষ্ট দিকপাল।
ত্রিভুবনে কে সহিবে মোর বিমজাল॥
মনুষ্য দংশিতে মোর না হয় উচিত।
পৌরুষ নাহিক যথা শুনিতে কুৎসিত॥
অনন্তের বাক্যে পদ্মা না পেয়ে ভরসা।
একে একে অষ্ট নাগ করিলা জিজ্ঞাসা॥
অনেক বলিলা দেবী নাগগণ আগে।
শুনিয়া উত্তর দিলা মহাপদ্ম নাগে॥
যত যত বড় বীর ত্রিভুবন আছে।
দেখিয়া ত্রাসিত হয়ে চলে যায় পাছে॥
আঁখি নিমিষে আমি সকলি বিনাশি।
মনুষ্য দংশিতে আমি বড় ঘৃণা বাসি॥

www.pathagar.com

করজোড়ে প্রণমিয়া বলে কর্কটকে।
আমার সমান বীর নাই তিন লোকে॥
সময় পাইলে আমি বিনাশি সবংশে।
দেবাসুরগণে মোরে সদায় প্রশংসে॥
বলিল বৈকুণ্ঠ নাগি শুন পদ্মাবতী।
আমার বিক্রয় জানে ইন্দ্র মহামতি॥
ভাল-মন্দ নাহি বুঝে দেখিতে ছাওয়াল।
দংশিলে এ অপমান (২) রবে চিরকাল॥
আস্তিকে বলিল তবে ক্রোধ করি দড়।
তুচ্ছ ভারে মোরা সবে লজ্জা পাই বড়॥
সেবকেই যেই কার্য অনায়াসে পারে।
জানিয়া এসব তত্ত্ব কহ আমাদেরে॥
বলিল উৎপল নাগে পদ্মার গোচর।
ধরনী গিলিতে পারি মূহুর্ত ভিতর॥
কাপুরুষের কর্ম যে মনুষ্য দংশিয়া।
হাসিবে সকল লোক কলঙ্ক ঘুচিয়া (৩)॥
শুনিয়া তক্ষক নাগ বলে মনসারে।
পরীক্ষিত দংশি শুধু ব্রক্ষ্মশাপ ভরে॥

শব্দার্থ : ২। দুর্নাম। ৩। ঘোষণা করিয়া।

শুনিয়া চান্দের বার্তা যত নাগগণ।
অঙ্গীকার নাহি করে সঙ্কট কারণ॥
জনে জনে জিজ্ঞাসিয়ে যত নাগগণ।
উত্তর না পেয়ে পদ্মা জুড়িল কান্দন॥
ধূয়ায় উঠিয়া বলে কার্য সিদ্ধিতরে।
আমারে বজ্জিয়া কেন বিচর অন্যেরে॥
তোমার আজ্ঞার ক্ষিতি গিলিবারে পারি।
সাগর শুষিতে পারি পরাক্রম করি॥
শুনিয়া ধূয়ার কথা হরষিত মনে।
পঞ্চ সের বিষ আনি দিলা ততক্ষণে॥
কোলে নিয়া চুম্ব দিয়া বসিলা আসনে।
খণ্ডে যদি মম দুঃখ তুমি পুত্র হনে॥
বহু যত্ন করি তারে শঙ্কর নন্দিনী।
অতীক কৌতুকে দিলা ধূয়ারে মেলানি (১)॥
চম্পক নগরে ধূয়া ততক্ষণে যায়।
আচম্বিতে পথেতে উজাই (২) মৎস পায়॥
ধূয়া বলে এত ভোগ এড়িব (৩) কিসেরে (৪)।

www.pathagar.com

মরিবারে যাব কেন চম্পক নগরে॥
এখানে থাকিয়া ধূয়া মৎস ধরিয়া খায়।
পদ্মা দিলা যত বিষ কোমরে (৫) লুকায়॥
হতাশ চরিত্র ধূয়া ঘন শ্বাস বয়।
পদ্মার নিকটে গিয়া উর্ধ্বমুখে রয়॥
উলটি পলটি ধূয়া সচকিত মন।
মনসারে বলে ধূয়া শুন বিবরণ॥
ধূয়া বলে গিয়াছিনু চম্পক নগর॥
লোহার মন্দির যেন পর্বত শিখর॥
হাতে অস্ত্র জাগে তাহে কটক প্রহরী।
কামান বন্দুক হাতে লোক সারি সারি॥
কত বা কহিব তার যত বিবরণ।
লোহার মন্দির যেন যমের ভবন॥

শব্দার্থ : ১। বিদায়। ২। যাহা উজাইয়া আসিয়াছে।
৩। ছাড়িব। ৪। কি কারণে। ৫। গৌরব।

রুমিলা কটক সব আমারে দেখিয়া।
প্রাণ লয়ে বড় ভাগ্যে আসিনু ফিরিয়া॥
নেতা বলে ধূয়া কোথা গিয়াছে চম্পক।
রচনা উত্তর দিয়া ভাঙ্গিল তোমাকে॥
ধূয়া প্রতি ক্রোধ করি জয় বিষ হরি।
ধূয়ারে মারিয়া বিষ লয় তাড়াতাড়ি॥
এইরূপে ধূয়া সাপ আসিল ফিরিয়া।
সেইক্ষণে আসিলেন সাপ যে মাটিয়া॥
মাটিয়ায় বলে যদি কার্য সিদ্ধি চাও।
আমি বর্তমানে কেন অপরে পাঠাও॥
নিশ্বাসে পর্বত কত উড়াইতে পারি।
সাগর শুকাইতে পারি দিয়া লেজে বাড়ি॥
সহায় হইলে আমি কোন চিন্তা নাই।
আজ্ঞা কর দংশি দিব সুন্দর লখাই॥
ইহা শুনি পদ্মাবতী হরষিত মনে।
ছয় তোলা বিষ আনি দিলা সেইক্ষণে॥
বিষে মত্ত হয়ে যায় গাছ পানে চায়।
গুটিকত পাখি ছানা দেখিবারে পায়॥
লোহার মন্দিরে কেন মরিবারে যাব।
বিধি দিল ভোগ যদি সুখে বসি খাবা॥
কুচিয়ালা গাছে বিষ বিরলে রাখিয়া।

www.pathagar.com

ছানা ধরিবারে যায় গাছেতে চড়িয়া॥
বলায় বিছায় তার সেই বিষ পায়।
রেণু রেণু করি তারা ভাগ করি খায়॥
মাথায় পড়িল বজ্র বিষ না পাইয়া।
পদ্মার সাক্ষাতে গেল ত্রাসিত হইয়া॥
রচনা করিয়া কথা মিছামিছি কয়।
মাটিয়ারে কহে পদ্মা রাগান্বিত হয়॥
পাখি ছানা খাইয়া হরিয়া বিষ যত।
বঞ্চনা করিয়া কহ আমারে দূরন্ত॥
পদ্মা বলে ভণ্ডেরে মারিয়া দেও দূরে।
বিষ যত কাড়িয়া লও প্রাণে বধ তারে॥
বিষ হারাইয়া তার জীবন সংশয়।
তার আছে আগুবাড়ি বাড়য়ালে কয়॥
আমি হেন বড় নাগ প্রাণ রাখি কিসে।
যারে তারে পাঠাও কার্য নাহি আইসে॥
হুঙ্কারে পৃথিবী পারি নিতে রসাতলে।
ত্রিভুবনে কে বাঁচিবে মোর বিষ জালে॥
সামান্য মানব সনে এত কেন কর।
লখাই দংশিয়া দিব কার্য কত বড়॥
এত শুনি পদ্মাবতী হরষিত মনে।
সাত তোলা বিষ আনি দিলা ততক্ষণে॥
লাগুলের বাড়ি মারি গাছ ভাঙ্গি যায়।
অরণ্যেতে মৃগশিশু দেখিবারে পায়॥
লোহার মন্দিরে কেন মরিবারে যাই।
বিধাতা দিয়াছে ভোগ সুখে বসে খাই॥
বৃক্ষপত্র ছিড়ি বিষ নিরলে রাখিয়া।
লাফ দিয়া মৃগছানা আনিল ধরিয়া॥
মহাজ্যোতির্ময় বিষ পাত্র নাহি ধরে।
পাতালে পশিল বিষ বাসুকী গোচরে॥
বিষ না পাইয়া নাগ হইল চমৎকার।
হা হুতাশ হয়ে যায় পদ্মার গোচর॥
প্রহরী দেখিয়া মোর মনে হলো ভয়।
আমারে ধরিয়া যে প্রহারে অতিশয়॥
সব বিষ টুটে গেল মনুষ্যের রণে।
বড় দুঃখ পাইলাম তোমার কারণে॥
পদ্মা বলে নাগগণ খেদাও মারিয়া॥
দেশান্তরী করি বিষ লওত কাড়িয়া।

www.pathagar.com

লাচাড়ী

ধূয়া বিবাদে হারিনু চান্দ সনে॥
পরিহাস করে মোরে, দুঃখ না সহে শরীরে।
চান্দ সঙ্গে হারিনু বিবাদে।
চান্দ নামে সদাগর, কাঁপে ভয়ে থর থর,
নাম শুনি পড়ে যে বিপদে॥
দেখিয়া নাগর বল, বুদ্ধি গেল রসাতল,
বৃথা গর্ব তোমা সবাকারে,
গুহিলা নাড়লি আর, যত নর নাগ ছাড়,
মহাবিষ কণ্ঠে কেন ধরে॥
যত সব নাগ বলে, চান্দেরে ডরে সকলে,
নাগ সব গেল পলাইয়া।
অনন্ত তক্ষক ফণী, শিরে কেন ধরে মনি,
কণ্ঠে বিষ ধরে কি লাগিয়া॥
সংসারে ঘোষণা করে, মানবেরে সাপে ডরে,
চান্দ নামে বিষ যায় টুটে।
পদ্মনাগ মহাতেজা, ত্রিভুবনে যায় পূজা,
সর্বলোকে এই কথা রটে।
উদকাল মণিরাজ, এই ছাড়ে কিবা কাজ,
অপমান তাহাদের পাশ।
অনন্ত বসুকী নাগে, বলিলা পদ্মার আগে,
কেন মাগ কর সর্বনাশ॥
পূর্বে তুমি বিপুলারে, শাপ দিলা নদী নীরে,
কালীনাগে দংশিবে লখাই।
শুনিয়া নাগের বাণী, নেতারে বলিল পুন,
মনে পড়ে সত্য সত্য তাই॥
জানকীনাথের বানী, হৃদে জাগে সে কাহিনি,
কালীনাগে আন রে ধামাই॥
যাও কালীদহ যথা, খণ্ডাও মনের ব্যথা,
কালী বিনে অন্য গতি নাই।

কালীনাগ আনিবার জন্য ধামেনার
কালিদহে গমন ও কালী নাগকে
পদ্মা সদনে আনয়ন।

দিশা বিপদে পড়িলে ডাকি মা তোরে।
(মাগো) চরণ ছাড়া করিও না মোরে॥
কালীয়ের নাম শুনি ধামেনা চিন্তিত।

www.pathagar.com

কহিতে লগিলা নেতা পদ্মার বিধিত॥
কালীয়ের বিবরণ শুন সাবধানে।
গোপ গৃহে নারায়ণ ছিলেন যখনে॥
নন্দঘোষ ঘরে যবে ছিলেন কানাই।
শিশুগণ সঙ্গে বনে চরাইত গাই॥
কালিন্দির জল খেয়ে শিশুগণ মরে।
কোপে ঝাঁপ দিয়া জলে নারায়ণ পড়ে॥
অন্য নাগ আসি তারে করিল দংশন॥
কপটে ঢলিল প্রভু দেব নারায়ণ।
নন্দ ও যশোদা শোকাকুল মন॥
চারি যুগে তুমি প্রভু জীবের জীবন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে তোমার কারণ।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে যত শিশুগণ॥
বলভদ্র আসি তারে করায় চেতন॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি গুরন্দর॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মত্ত, তুমি যে পাতাল।
তুমি দিবা, তুমি রাত্রি তুমি যে কালাকাল॥
তোমার কারণে প্রভু জগৎ সংসার।
তোমার আহারে সর্বজীবের আহার॥
মায়ারূপে আছো তুমি সংসারেতে গুপ্ত।
লীলারূপে পৃথিবীতে আছ তুমি ব্যাপ্ত॥
তুমি অগ্নি তুমি জল তুমি বিষধর
আপনি না জান কিবা ওহে পীতধর॥
বলভদ্র বাক্যে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
তখনে করিলা প্রভু গরুরে স্মরণ॥
গরুর আসিল নাগে করিতে ভক্ষণ।
ভয় পেয়ে গেল নাগ পাতাল ভুবন॥
হেন কালীদহে আগে যাবে কোন জন।
হেন জন নাহি দেখি আছে ত্রিভুবন॥
নেতা বলে সাক্ষাতে না একপাশে থাকি।
পদ্মার আদেশ বাক্য বলিবায় (১) ডাকি॥

শব্দার্থ : ১। বলিবার জন্য

শুনিয়া ধামেনা নাগ হয়ে হরষিত।
পদ্মার চরণ বন্দি চলিল ত্বরিত॥
ধূয়ারে সঙ্গতি করি ধামেনা দোয়ারী।
কালিদহে চলে গেল অতি ত্বরা করি॥

www.pathagar.com

চেঙ্গ বেঙ্গ আদি তথা ধরিছে উজানী (২)।
ধূয়ায় দেখিলে তারে মুখে পড়ে পানি॥
পদ্ম মাঝে চাষা লোক ধূয়ারে পাইয়া
লাঠির আঘাতে তারে ফেলিল মারিয়া॥
ধূয়ার মরণ দেখি ধামেনা তখন।
অমৃত কুণ্ডের জলে করাইল চেতন॥
তথা হনে ত্বরা করি যায় দুইজন।
অবিলম্বে উত্তরিলা কালীর ভবন॥
কালী কালী বলিয়া ধামেনা ডাক দিল।
কালী বলে কোন বেটা বিপাকে ঠেকিল॥

লাচাড়ী

ধূয়া ক্রোধে কালী গর্জে ঘনে ঘন।
ইন্দ্র আদি দিকপাল, কম্পমান সর্বকাল,
মোর বাত্তা কেবা নাহি জানে।
অসুর দেব গন্ধর্ব, অহঙ্কারে মত্ত সর্ব,
নাম ধরি ডাকে বিদ্যমানে॥
কালী বলে আন ধরি, পাঠাব যমের পুরী,
খণ্ডাব মনের যত দুঃখ।
দশে বিশে নাগ ধেয়ে, ধামেনারে দ্বারে পেয়ে,
ধরি নিল কালীর সম্মুখে।
লোচন পাকায় রোষে, ধামেনা পড়িল ত্রাসে,
চঞ্চলিত অতি ভীত মতি।
এক্ষণে বাঁধিব তোরে, পাঠাব যমের পুরে,
রক্ষে তোরে কাহার শক্তি॥
ধামা কয় জোড় হাতে, এসেছি তোমারে নিতে,
মনসা পাঠায়ে দিল মোরে।
কার্য আছে তথা বড়, সত্বর গমনে লড়,
মনে যদি থাকে মনসারে।
দেশের নাগগণ, আসিয়াছে সর্বজন,
তোমার অপেক্ষা মাত্র করি।
নসা বন্দিয়া মাথে, পণ্ডিত জানকীনাথে,
বলে শুন অপর লাচাড়ী।
শুনিয়া মনসার কথা, কালী নোয়াইল মাথা,
মধুর বচনে কহে বাণী।
কত কাল চলি যায়, মনে নাহ করে মায়,
ধন্য আজি আমার জীবনী॥

www.pathagar.com

কোন কার্য আছে তথা, স্বরূপে কহ রে কথা,
আদেশিলা কেন বিষ হরি।
শুনিয়া পদ্মার কথা, মনেতে লাগিল ব্যথা,
কুশলাদি কহ শীঘ্র করি॥
আমার বিষের জালে, কৃষ্ণ গেল রসাতলে,
দেখি তব নাহি কিছু ভয়।
কেমন সাহস করি, আসিলে আমার পুরী,
অকপটে কহ রে নিশ্চয়॥
জোড় হাতে নাগ কয়, শুন গিয়া সে বিষয়,
এইমাত্র চল ত্বরা করি।
পদ্মাবতী বড় দুঃখী, তুমি গেলে হবে সুখি,
জানকীর কবিত্ব চাতুরী॥
দিশা হৃদে আয়গো করুণাময়ী তারিণী।
আমার কপালে কী আছে না জানি॥

কালী বলে শুন নাগ আমার বচন।
আমারে আদেশ আজি কিসের কারণ॥
আমা হনে শতগুনে কণ্ঠে বিষ যার।
হেন অষ্টনাগ আছে নিকটে পদ্মার॥
এদেরে বজিয়া কেন মোরে চায় নিতে।
কার্যের গৌরব কিছু, না পারি বুঝিতে॥
দেবের দেবতা মহেশ কুমারী।
সর্বত্র পূজিতা মাতা দেবী নাগেশ্বরী॥
পদ্মাসনে কেবা হেন করিল বিবাদ।
মানব হইয়া কার মরিবারে সাধ॥
ভেক হয়ে ভজঙ্গীনী মুখে দেয় হাত।
শিবা হয়ে সিংহ পৃষ্ঠে বসিবে নির্ঘাত॥
মৃগ হয়ে ব্যাঘ্র সনে থাকিতে প্রয়াস।
কাক হয়ে গরুরেরে করে উপহাস॥
অগ্নিতে পতঙ্গ যথা মরে পুড়িয়া।
আশা রাখে পৃথিবীকে ফেলিবে তুলিয়া॥
হরিতে রবির তেজ কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে কেবা আছে এমন দুর্মতি॥
কার পানে দৃষ্টিপাত কৈলা গ্রহ শনি।
কি সাহসে হরিবেক দেবের রমনী॥
ভস্ম করি দিব তারে বিষ বরিষণে।
সৃষ্টি নাশ করি দিব পদ্মার বচনে॥

www.pathagar.com

ধামেনারে বলে কালী মোর বাক্য শুন।
সত্য করি কহ দেখি পূর্ব বিবরণ॥
শুনিয়া কালীর কথা জোড় হাত করি।
পূর্ব বিবরণ কিছু কহিল বিস্তারি॥
দেব দৈত্য দানবেতে নাহিক বিবাদ।
নরের সহিতে পদ্মার ঘটিল প্রমাদ॥
ধনে জন রাজপুত্র ধনে কুটিশ্বর।
তার পুত্র চান্দ পায় হর গৌরী বর।
পূজা তরে গেল পদ্মা জালুয়ার ঘরে।
এথা হনে চান্দ পত্নী নিলা পূজিবারে॥
চণ্ডির ইঙ্গিত পেয়ে রাজা চন্দ্রধর।
হেমতালে মারে বাড়ি ঘটের উপর॥
এ কারণে বিবাদ বাড়িল চান্দ সনে।
সকলি জানিবা তুমি গিয়া সেই স্থানে॥
ধামাই বচনে কালী করিলা গমন।
পদ্মার ভবনে গিয়া দিলা দরশন॥
যথাবিধি বন্দিলেক পদ্মার চরণ।
কালী গলে ধরি জড়িল ক্রন্দন॥

লাচাড়ী

ধূয়া : কালী গো তোমাকে কহিব কোন লাজে॥
যত দুঃখ চান্দে মোরে, দিতে আছে বারে বারে,
সয়ে থাকি ভাঙ্গর বাপের কাজে।
মনেতে যতেক দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক,
দিবা রাতি দহে চিত্তমাঝে॥
যাও নাই বাপ হর, দুষ্ট যে সতাই মোর,
এক চক্ষু দিলা কানা করি।
তবে বাপ শুল পানি, মুনির কুমারে আনি,
দিলা বিয়া অতি যত্ন করি।
পাপিষ্ঠার কর্মফলে, পতি ছাড়ি গেল চলে,
এক রাত্রি না হল বসতি।
পূজা খাই জালু ঘরে, সনকায়ে নিল মোরে,
মন সাধে পূজে দিবা রাতি॥
চণ্ডির ইঙ্গিত পেয়ে, চন্দ্রধর এল ধেয়ে,
হেমতালে ভাঙ্গিল কাঁকালি।
জানকী নাথের বাণী, শুনিছে কালনাগিনী,
ভাঙ্গি দিব তার নাগরালী ॥
কালীনাগের লোহার বাসরে গমন

www.pathagar.com

ও লক্ষ্মীন্দরকে দংশন।
দিশা কত নিদ্রে যাও গো রামের জননী॥
পদ্মা বলে শুন কালী আমার বচন।
রাত্রিতে দংশিয়া দেও চান্দের নন্দন॥
পদ্মার বচনে কালী কৈল অঙ্গীকার।
আপনে দংশিয়া দিব চান্দের কুমার॥
তখন সে কালীনাগে বলিল পদ্মারে।
কেমনে প্রবেশ করি লোহার মন্দিরে॥
অভেদ্য লোহার ঘর বজ্রের সমান।
পিঁপীলিকা প্রবেশিবে নাহি করি জ্ঞান॥

শব্দার্থ : ১। নেশাখোর। ২। ফাটিয়া যায়। ৩। সুখের সংসার।

পদ্মা বলে কালী নাগ না ভাবিও তুমি।
কর্মকার হাত ছিদ্র রাখিয়াছি আমি॥
পদ্মার যুগল পদ বন্দনা করিয়া।
লোহার বাসরে নাগ উত্তরিল (৪) গিয়া॥
মন্দিরের চারি পাশ ঘুরিয়া দেখিল।
প্রবেশ করিতে ছিদ্র খুঁজি না পাইল॥
বহুচেষ্টা করি কার্য হৈল না সাধন।
পুনরপি গেলা কালী তাহার সদন (৫)॥
পদ্মাবতী নাগে দেখি হইল বিস্মিত।
সমাচার (৬) কহ কালী হৈনু সশঙ্কিত॥
প্রবেশের পথ মাগো মন্দিরেতে নাই।
দংশিবারে না পারিনু (৭) চান্দের লখাই॥
শুনিয়া নাগের বানী লাগে চমৎকার।
চিন্তিলেন মন্দির ঘটিল কর্মকার॥
বাসুকি অনন্ত আদি করিয়া সংহতি।
কর্মকার আবাসেতে গেলা পদ্মাবতী॥
দয়ময়ী নাম কর্মকারের ঘরণী (৮)।
স্বপ্ন যোগে বিষহরি কহিলেন বাণী॥
চান্দের সহিত বাদ গেল আজি হনে।
বিবাদ বাড়িল তোর কামারের সনে॥
বধিব সকলি আজি সৎ অসৎ।
নাগ লাগি মন্দিরেতে না রাখিল পথ॥
রাত্রিকালে হেন বাণী দয়ায় শুনিয়ে।
নিদ্রা হনে উঠিলেক চমকিত হৈয়ে॥
চক্ষু মেলি দেখিলেন পদ্মাবতী।
অষ্টাব্দ হইয়া তবে করিলেন স্তুতি॥

www.pathagar.com

কী কারণে এত রুষ্ট মাগো বিষহরি।
সেবক জনারে দেও অব্যাহতি (৯) করি॥
শব্দার্থ : ৪। পৌঁছিল। ৫। নিকট। ৬। সংবাদ।
৭। পারিলাম। ৮। স্ত্রী। ৯। মুক্তি।

লাচাড়ী

ধূয়া ছাড় বাছা জীবনের সাধ॥
চন্দ্রধর মম বৈরী, পুত্রে রাখে যত্ন করি,
আজি হতে তোর সনে বাদ॥
মৃত্যুভয় দূর করি, বান্ধিল লোহার পুরী,
জীবনের আর রাখে সাধ॥
সুখেতে থাকিতে ঘরে, বিধি বঞ্চিলেক (১) তোরে,
যাবি তবে যমের ভবনে।
ঐ যে ওঝা ধনুন্তরি, একারণে তারে মারি,
তার কাছে তোরা কোন জন॥
চণ্ডিকা সতাই সনে, বিবাদে জিনিনু (২) রণে,
তুমি আছ কি ভরসা মনে।
কামারে পাইয়া ভয়, মিনতি করিয়া কয়,
পণ্ডিত জানকী নাথে ভণে॥
দিশা ও সখী পাইল আজি কাল ঘুমে।
পালঙ্কেতে বিপুলা লখাইর বামে॥
কর্মকার বলে মাগো করি নিবেদন।
পথ রাখিয়াছি নাগ প্রবেশ কারণ॥
অগুলি প্রমাণ ছিদ্র দক্ষিণে পাইবা।
সত্য সত্য বলি মাগো নিশ্চয় জানিবা।
লোহা দিয়া নানা ছন্দে রাখিছি তাহারে।
নাকের নিশ্বাসে তাহা গলি যাবে দূরে॥
এত শুনি পদ্মাবতী হরষিত মনে।
সঙ্কেত কহিল গিয়া কালী নাগ স্থানে॥
প্রাণের অধিক তুমি আর কেহ নাই।
তুমি যদি দংশি দেও চান্দের লখাই॥
তোমারে রাখিয়া আমি কৈলাসেতে যাই।
লক্ষ্মীন্দর প্রাণ যেন তথা বসে পাই॥
শব্দার্থ : ১। ছলনা করিল। ২। জয়লাভ করিলাম।
প্রবোধ পাইয়া কালী হরষিত হৈল।
পদ্মারে প্রণাম করি মন্দিরে চলিল॥
তথায় দেখিল জাগে কটক প্রহরী।

www.pathagar.com

চিন্তিত হইল নাগ উপায় কি করি।
মায়া করি নাগিনী সবারে ভুলায়॥
পদ্মার আদেশ মত দংশিতে যায়।
প্রশ্বাস অনলে লোহা গলিয়া পড়িল॥
সেই পথে নাগ গিয়া প্রবেশ করিল।
প্রবেশ করিয়া দেখে মন্দির ভিতর॥
একত্রে উদয় যেন শশী দিবাকর।
কাল নিদ্রা কালী নাগে করিল স্মরণ॥
নাগের স্মরণে নিদ্রা আসিল তখন।
নাগে বলে নিদ্রা শুন মম বাক্য ধর॥
বিপুলা লখাইকে তুমি অচেতন কর।
বহির্ভাগে আছে দেখ যতেক প্রহরী॥
গিয়া তবে রাখ সবে নিদ্রা মোহ করি।
শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে জ্বলে মোমবাতি।
শয়ন করিছে দোহে মুক্তা হেন জ্যোতি॥

লাচাড়ী

ধূয়া কান্দ কান্দ কালী নাগরে
কান্দে কান্দে কালী নাগে, লখাইর রূপ চাইয়া।
কেমনে কামড় দিব, পুত্রের মাও হইয়া॥
আমিত অভাগিনী কালী, দুষ্ট কপালের কাজে।
প্রবেশ করিনু আসি, লোহার মন্দির মাঝে॥
পুত্রের বেদনা মায়ে মহিতে কি কভু পারে।
পুত্রবতী অন্য পুত্র, দংশিবে কেমন করে॥
আমিত অবোধ কালী, হইয়ে পুত্রের মাও।
কেমনে কামড় দিব সুন্দর লখাইর পাও॥
এতেক বলিলা কালী, কান্দে অতি দীর্ঘ রায় (৩)।
রচিল জানকীনাথ, মনসা দেবীর পায়॥

শব্দার্থ : ৩। উচ্চ শব্দে উচ্চ স্বরে।

মুণি মন ঢলি পড়ে যায় রূপ তেজে।
হেন তনু বিনাশিব মনসার কাজে॥
সমূহ পাপের ভাগী করিলা আমারে।
কিরূপে কামড় দিব লখাই শরীরে॥
সাত পাঁচ ভাবি নাগ রহে এক পাশে।
অনুমান করি চায় ছুপ দিব (১) কিসে॥
না বলিয় দংশি যদি চান্দের কুমার।
পরকালে কিবা গতি হইবে আমার॥

www.pathagar.com

কহিয়া বলিয়া তবে ছুপ দিয়া যাই।
পরকালে যাহা হবে জানেন গোঁসাই (২)॥

লাচাড়ী

ওঠ ওঠ বাছাধন, চন্দ্রধরের নন্দন,
যাইতে হবে শমন ভবন।
মনসা কহিয়া মোরে, সংহার করিতে তোরে,
উপনীত (৩) তোমার মরণ॥
না বলিয়া যদি মারি, অঘোর নরকে পড়ি,
তোমারে জানাই সে কারণে।
নিদ্রাতে হও বিভোর, ঘোরে প্রবেশিল চোর,
নিদ্রা ঘরে রইলে অচেতন॥
বাদুয়া চান্দের পুত, জাগিয়া দেখ যমদূত,
চন্দ্র সূর্য না দেখিবা আর।
মনসার কার্য তরে, আসিনু লোহার ঘরে,
পরকার্যে শঙ্কট (৪) আমার॥
বিধির নির্বন্ধ যাহা, কেবা খণ্ডাইবে তাহা,
কালী নাগ ভাবো অকারণে।
জানকীনাথের বাণী, চিন্তা না কর নাগিনী,
পাপ পূণ্য মনসায় জানে॥

শব্দার্থ : ১। দংশন করিল। ২। প্রভু। ৩। উপস্থিত। ৪। বিপদ।

দিশা অকুলে ভাসাইলেরে।
শ্যাম চান্দ, দুঃখিনীরে॥
এত সব বিপদ ভাবিয়া কালী নাগে।
লখাইর নিকটেতে রহে এক ভাগে।
বিধির নির্বন্ধ (৫) কার্য না হয় খণ্ডন।
নাগের উপরে পড়ে লখাইর চরণ॥
সাক্ষী করে কালী নাগে যত দেবগণ।
আপনার দোষে মরে চান্দের নন্দন॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু সাক্ষী হও আর দিবা রাতি।
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী থাক দেব পশু পতি (৬)॥
সপ্তদীপ সাক্ষী হও অনন্ত পাতাল।
চরাচর সাক্ষী থাক দশ দিক পাল॥
এইবার অপরাধ ক্ষমিনু তোমারে।
আর বার দুঃখ দিলে যাবে যম ঘরে॥
ক্রোধ সম্বরিয়া (৭) নাগ রহে এক ভিতে (৮)।
বিপুলা লখাই আছে অঘোর ঘুমেতে॥

www.pathagar.com

পুরাণের মতে আছে লখাইর মরণ।
নাগের উপরে পড়িল পুন চরন॥
এইবার ক্ষমিনু হে বিপুলারে চাইয়া।
আর বার দুঃখ দিলে না যাবে সারিয়া॥
তদগত ভাবেকে (৯) নাগ রহিল সেখানে।
ক্রমাগত তিনবার প্রহারে চরণে॥
শিয়র হইতে কালী পিছনেতে যায়।
যাইতে লাগিল অঙ্গ লক্ষিন্দরের গায়॥
নিদ্রাবসে লক্ষিন্দর ধরিয়া তাহায়।
লাঞ্চনা করিয়া তারে উড়ায়ে ফালায় (১০)॥
ক্রোধমনে কালীনাগ রুষিলেক (১১) বড়।
দক্ষিণ চরণ চাপি মারিল কামড়॥

শব্দার্থ : ৫। লিখন। ৬। মহাদেব। ৭। সংবরণ করিয়া
৮। দিকে। ৯। সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া।
১০। ছুঁড়িয়া ফেলে। ১১। রাগ করিল।

যমদ্বার ভেদিল দারুণ দন্তাঘাতে।
ও মাগো বলি লখাই উঠে নিদ্রা হতে॥
সকল শরীর জুড়ি বিষ অগ্নি জ্বলে।
শয্যার নিকটে নাগ দেখে হেন কালে॥
হাতের কাটারি লখাই ফেলে দিলে ত্রাসে।
লেজ কাটা গিয়া নাগ রহে এক পাশে॥
ভাল কিবা মন্দ হৈল নাহিক বিচার।
বিষে ছন্ন লক্ষ্মীন্দর চান্দের কুমার॥
লক্ষীন্দর বিপুলারে ডাকে ঘন ঘন।
না পায় চৈতন্য উষা নিদ্রার কারণ॥
পন্ডিত জানকীনাথ মনসার দাস।
পদ্ম-পুরাণ বিরচিয়া করিল প্রকাশ॥

লাচাড়ী

নিদ্রা হনো ওঠে প্রিয়া, সায়ের কুমারী।
আকুল করিল বিষে, সহিতে না পারি॥
তুমি ত সকলি জান, পূর্ব বিবরণ।
উঠিয়া প্রবোধ বাণী, না দেও কি কারণ॥
করিল অনেক যত্ন, না হৈল চেতন।
লিখিল আঁচলে পত্র, চান্দের নন্দন।
এতেক প্রবন্ধ প্রিয়া, করিলা কি ফলে॥
লোহার মন্দির মাঝে, প্রবেশিল কালে।

www.pathagar.com

অনেক দিবস পরে, হবে দরশন॥
আরক্ষ্ম দেখিবে তুবি পদ্মার চরণ।
কণ্ঠ যে নিরোধ হইল, লাল পড়ে মুখে॥
ঢলিল সুন্দর লখাই বিপুলার বুকে।
আরে রে দারুণ বিধি, কি লিখিলে হায়॥
রচিল জানকীনাথ মনসার পায়।

লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে বিপুলার খেদ,
সংবাদ পাইয়া সনকা ও চন্দ্রধরের
আগমন ও ক্রন্দন।

দিশা আমি অভাগিনী কপালে রে,
আমি দুঃখিনীর কপালে রে,
আরে দারুণ বিধি যা লিখিয়াছে?
লখাইর হইল যদি জীবনের শেষ।
প্রভাত হইতে রাত্রি করিলা আদেশ॥
অন্তর হইয়া নাগ আছে এক ভিতে।
বান্ধিয়া লইর আত্মা বাহির হইতে॥
আত্মা নিয়া কালী নাগ করিল গমন।
হরষিতে ভেটাইল (১) পদ্মার চরণ॥
যতেক ঘটনা বলে পদ্মার গোচর।
যেভাবেতে কালী নাগে দংশে লক্ষীন্দর॥
অন্যের কাজেতে গেলে পান ফুল পাই।
তোমার কাজেতে মাগো লেগুর (২) হারাই।
ধন্য ধন্য করি পদ্মা কালীরে প্রশংসে (৩)॥
বিস্তর আহার দিয়া মিষ্ট বাক্যে তোষে।
সুখে রহে পদ্মাবতী লয়ে নাগগণ।
লক্ষীন্দর নিয়ে করে বিপুলা ক্রন্দন॥
চৈতন্য পাইয়া তবে সায়ের কুমারী।
দেখিল প্রদীপ নাই অন্ধকার পুরী॥
বিপরীত শয়ন করিছে লক্ষীন্দরে।
না দেখি লক্ষণ ভাল মনে শঙ্কা করে॥
লখাই নাসাতে বায়ু চাহে ততক্ষণ।
দেখিল বিনোদ প্রভু নাহিক চেতন।
ভূমিতে পড়িল কন্যা বুকে হানি ঘাও (৪)॥
কেন হেন করিলা জগৎ গৌরী মাও।
মস্তক চাপিয়া পড়ে যেন বজ্রাঘাত॥
অন্যখিনি (৫) হারাইল আজি প্রাণনাথ।

www.pathagar.com

একি ছিল বিধি মোর কপালে লিখন॥
অভাগী বিপুলা আমি মন্দ কপালিনী।
নিশাভাগে দংশিলেক (৬) প্রভু গুণমনি॥

শব্দার্থ : ১। উপহার দিল। ২। লেজ। ৩। প্রশংসা। করে। ৪। আঘাত। ৫। হতভাগিনী। ৬। দংশন করিল।

কত পাপ করেছিনু মুই (১) অভাগিনী।
জগত রহিল মোর অষণ কাহিনি॥
পাইনু অমুল্য ধন সাধিয়া দেবতা।
হস্ত হনে কাড়ি নিল দারুণ বিধাতা॥
ধিক ধিক বিধাতা খানিক নাহি ঘৃণা।
এ হেন যৌবনে মোর কৈলা বিড়ম্বনা (২)॥
অমূল্য রত্ন মোরে দেখায়ে সাক্ষাতে।
নয়ন হইতে কাড়ি নিলা আচম্বিতে (৩)॥
কি শুনিবে বাপে মায়ে যত বন্ধুগণ।
কি শুনিবে শ্বশুর শাশুড়ি দুইজন॥
মোরে বিয়া কৈলা প্রভু অতি বড় আশে।
মনোরথ না পুরিল মোর কর্ম দোষে॥
ক্ষণেকে ওঠিয়া যায় পাগলের বেশে।
ক্ষণে ক্ষণে দুই হাতে বুক কুটে ত্রাসে॥

লাচাড়ী

কি মোর কর্মের দোষে, তোরে ছাইল কাল বিষে,
উঠিয়া সম্মতি দেহ মোরে।
কি জানি করিনু পাপ, বিধি দিল এত তাপ,
দুঃখ আর না সহে শরীরে॥
পর কার্য কৈল নাশ, ভাঙ্গিল পরের আশ,
নাগ মাতা করিলা নিধন।
খণ্ড তপস্যা করিনু, পাইয়া নিধি হারানু,
প্রাণপতি অকালে মরণ॥
কান্দে কন্যা বড় শোকে, চাপড় (৪) হানিয়া বুকে,
কান্দে কন্যা মন্দির ভিতর।
কি হেন কর্মের ফলে, এ হেন যৌবন কালে,
পতি ছাড়ি হইল অন্তর (৫)॥
লখাই চরণ ধরি, কান্দে কন্যা বিদ্যাধরী,
প্রভুরে দংশিল (৬) কালরাতি।

শব্দার্থ : ১। আমি। ২। বিপদ দুঃখ। ৩। হঠাৎ। ৪। আঘাত ৫। ব্যবধান, মৃত্যু। ৬। দংশন করিল।

www.pathagar.com

মনসা পাষণ্ডি জন্ম, কি মোর পাপিষ্ঠ কর্ম,
লিখিল দারুণ প্রজাপতি।
আলিঙ্গন মাগি মুখে, ত্রিশুল হানিলে বুকে,
তীক্ষ্ণ শেল রহিল মরমে।
না কর ক্রন্দন এড় (৭) মনসা উদ্দেশে লড়,
পণ্ডিত জানকীনাথ ভণে॥
দিশা সোনা গৌর চাঁদ হারাইয়া মায়।
(হৈল) শচীরাণী উন্মাদীনী প্রায়।
লোহার মন্দিরে কান্দে সায়ের কুমারী।
আচম্বীতে শুনিলেন সনকা সুন্দরী॥
বুদ্ধি স্থির নহে দেবী হায় হায় করে।
প্রমাদ পড়িল বুঝি কহিলা চান্দেরে॥
বস্ত্র না সম্বরে দেবী আলু থালু কেশে।
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাত্তা লইবার আশে॥
আঁচলে ধরিয়া তারে চন্দ্রধরে রাখে।
কি সাহসে যাও প্রিয়া লজ্জা নাই মুখে॥
পুত্রবধু দুইজনে প্রথম যৌবন।
বিচারিতে যোগ্য নহে এতক ক্রন্দন॥
ভাল-মন্দ যত কথা বলিব কৌতুকে।
স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার আছে সর্বলোকে॥
এই বিড়ম্বনা পূর্বে আছিল তোমার।
লেখা নাই তুমিও কান্দিছ কতবার॥
আজি তুমি গাসরিলা (৮) সে সকল যত।
শৈশব কালের কথা কৈতে পারি কত॥
লজ্জা নাই প্রিয়ে তব বুদ্ধি বিবর্জিত।
এ সকল বিচারিতে না হয় উচিত॥
লজ্জা পায় সংকায় চান্দের বচনে।
তথাপি ক্রন্দন দেবী কর্ণ পাতি শোনে॥
দুতে আসি জানাইল এমন সময়।
সর্প দংশে লক্ষীন্দরে ঢালিল নিশ্চয়॥

শব্দার্থ : ৭। অধিক। ৮। ভুগিলে।

শুনিয়া সনকা দেবী পুত্র পুত্র বলি।
বুকেতে হানিল ঘাও হইয়া ব্যাকুলি (১)॥
সনকায়ে যত মন্দ বলিল চান্দেরে।
উর্ধ্বশ্বাস যায় দেবী বার্তা জানিবারে॥
প্রবেশ হইল গিয়া মন্দির ভিতর।
সুবর্ণ পালঙ্কে দেখে মরা লক্ষীন্দর॥

www.pathagar.com

লখাই লখাই বলি পড়ে ভূমি তলে।
প্রাণহারা হয় বুঝি পুত্র শোকানলে॥
চারি পাশে বেড়িয়া ধরিল নারীগণে।
চৈতন্য করায় তবে অনেক যতনে॥
চেতন পাইয়া কান্দে লাটায়ে ধরণী।
সর্বাঙ্গ তিতিয়া (২) পড়ে নয়নের পানি॥

লাচাড়ী

পুত্রশোকে কান্দে দেবী, মৃত নিয়া কোলে।
তোরে না দেখিনু আমি, মরণের কালে॥
কোকিলারে যিনি স্বর, হেম কান্তি গাও (৩)।
অভাগিনী ডাকি তোরে, চক্ষু মেলি চাও॥
তোমা পুত্র পাব বলে, পদ্মারে সেবিনু।
সুন্দর খঞ্জন পাখি কারে ডালি দিনু॥
নিদারুণ পদ্মাবতী কেন দিলা বর।
স্ত্রীবধ দিব আমি তোমার উপর॥
কানেতে কুণ্ডল দিব হস্তেতে খঞ্জরী।
যোগিনী সাজিয়া আমি হব দেশান্তর॥
তোমার কারণে পুত্র চিতা সাজাবে।
কোলে তুলি নিয়া আমি পুড়িয়া মরিব॥
দেখিয়া সকল লোকে হাসিবে আমারে।
গরল খাইয়া প্রাণ ত্যাজিব অচিরে॥
পুত্র পুত্র বলি কান্দে উচ্চস্বরে।
কোথায় রাখিয়া গেলা মাও অভাগীরে॥
বধূর প্রসাদে পুত্র আসিবে বাঁচিয়া॥

শব্দার্থ : ১। অস্থির। ২। ভিজিয়া। ৩। শরীর।

পুরী খণ্ড জুড়ি উঠে ক্রন্দনের রোল।
চন্দ্রধরে কান্দে যেন বাজে ভাঙ্গা ঢোল।।
ওঝা আনিবারে চান্দ পাঠাইলা দূত।
চান্দের বচনে ওঝা আসিলা বহুত।।
বিপুলা সুন্দরী দেখি ওঝার বদন।
কেশ দুই ভাগ করি বন্দিল চরণ॥

লাচাড়ী

ঝাড় ঝাড় ওহে ওঝা, সযত্ন করিয়া।
অমূল্য রতন দিব, প্রভুরে জুকিয়া (৪)॥
মলিন না হইল শঙ্খ, সিঁথির সিঁদুর।

www.pathagar.com

আমা ছাড়ি গেলা প্রভু, নিদয় নিষ্ঠুর॥
মাতার মুকুট মোর, না হইল দুচারি।
কালরত্রি নাগে খায়, রূপের মুরারী (৫)॥
শ্বশুরে বানায় ঘর, প্রকারে বিশেষ।
কোন পথে নাগে তাহে করিল প্রবেশ॥
নেতা লাগি কাজল, সিঁদুর গেল মুছি।
প্রভুর বিনোদ (৬) মুখে পরিয়াছে মাছি॥
চান্দে বলে ঝাড় ওঝা সযত্ন করিয়া।
অমূল্য পাথর দিব, লখাই জুকিয়া॥
ইষ্টমিত্র বন্ধুগণ, বলে সমুদয়ে।
রচিল জানকীনাথ মনসার পায়ে॥

চন্দ্রধর হইতে অনুমতি লইয়া ভেলায়
করিয়া লক্ষীন্দর ... বিপুলার গুঞ্জরী
ঘাটে গমন ও বিদায় গ্রহণ।
দিশাঃ আমি অভাগির কপালে রে,
আমি দুঃখিনীর কপালে রে,
দারুণ বিধি যা লিখিয়াছে॥

শব্দার্থ : ৪। ওজন করিয়া। ৫। রূপের আধার, সুন্দর। ৬। সুন্দর।

চান্দের বচনে ওঝা নানা মন্ত্রে ঝাড়ে।
বিশুদ্ধ প্রকারে মন্ত্র পঠিতে না পারে॥
জীয়াইতে না পারিবে প্রকারে বুঝিল।
রচনা উত্তরে ওঝা চান্দেরে কহিল॥
বহুতর কহিলেক ঔষধ সকল।
সুমেরু শিখর আন ক্ষীরোদের জল॥
স্বর্গ হতে সুধা যদি আন সদাগর।
তবে যে জীয়াতে পারি মরা লক্ষীন্দর।।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া নিল কার্যের লক্ষণ।
আনিতে নারিব (১) দ্রব্য না রবে জীবন॥
ক্রোধে চান্দে বলে তোরা কি ক্রন্দন।
লোচন পাকায়ে বলে নিঠুর বচন॥
শুন পুত্র বধূ তুমি না কর রোদন।
জন্মিলে মরণ আছে না হয় খণ্ডন॥
ছোট বড় যত জীব আছয়ে সংসারে।
আগে পাছে সকলেই যাবে যম ঘরে॥
কান্দিয়া কি ফল আছে শুনগো সুন্দরী।
কর্ম ফলে যা হইল কি করিতে পারি॥

www.pathagar.com

ভাসাইয়া দেও নিয়া মরা লক্ষীন্দর।
আপদ খণ্ডিল মোর কারে দিয়া ডর॥
অধিক চান্দের বাক্যে কান্দে সর্বজন।
বিপুলা সুন্দরী তবে ভাবিল তখন॥
বিধবা ব্রাহ্মণী পূর্বে গালি দিল মোরে।
মরা স্বামী নিয়া আমি ভাসিতে সাগরে॥
এই বাক্য ব্যর্থ নয় বুঝেছি কারণ।
শ্বশুর নিকটে কন্যা কহিল তখন॥
কলা গাছে আমারে সাজায়ে দাও ভোরা (২)।
সাগরে ভাসিব আমি নিয়া প্রভু মরা॥
চান্দে বলে আমার যে গেল সাত বেটা।
তাহা হনে বেশি দুঃখ কলাগাছ কাটা॥
একছড়ি কলা বেচি পাব কত ধন।
অকারণে নষ্ট হবে গাছের জীবন॥

শব্দার্থ : ১। পারিব না। ২। ভেলা।

কলার বাগান পূর্বে কাটিয়ে খাইছে।
অবশিষ্ট কিছু মাত্র বাগোয়ানে (৩) আছে॥
অনর্থক কলা কাটি ভোরা বানাইব।
তুমি নাহি গেলে পাছে কি কর্ম করিব॥
অকারণে হইবে যে কলার বিনাশ।
শুনিয়া কালীর মনে হবে উপহাস॥
নাগের উচ্ছিষ্ট পুত্র দয়া নাহি মোর।
গলে দড়ি দিয়া নেও গুঞ্জরী সাগর॥
কানির উচ্ছিষ্ট নিয়া ফালাও সত্বর।
গোময় গোময় দিয়া বাড়ি শুদ্ধ কর॥
বংশধরে বলে চান্দ শুনহ বচন।
পূর্বে যতেক কথা নাহি কি স্মরণ॥
মরা পুত্র ডুবা ধন পাইবেক শেষে।
হেন কার্য সদাগর নষ্ট কর কিসে॥
লক্ষীন্দর নিয়া যাবে বিপুলা সুন্দরী।
যতন করিযা ভোরা বান্ধ শীঘ্র করি॥
এই কথা শুনিয়া সাধু মৌনেতে রহিল।
ভোরা বান্ধিবারে তবে অনুমতি দিল॥
প্রবন্ধে বান্ধিও ভোরা বিপুলায়ে বলে।
ভাসিব প্রভুরে নিয়া সাগরের জলে॥
চন্দ্রধর স্থানে তবে সায়ের নন্দিনী।

www.pathagar.com

জোড় হাতে কহে কন্যা অতি কাকুবাণী॥
যেন মত কার্য করা সেই মত ফল।
মনসার সনে বাদ নহেত কুশল॥
আর কোন কার্য নাই নাপাত (৪) জঞ্জাল।
আমারে বিদায় বাবা দেও ত সকাল॥
বিপুলার কথা শুনি রাজা চন্দ্রধরে।
আদেশিল ত্বরা গিয়া ভোরা বান্ধিবারে॥
দেয়ান করিল গিয়া গুঞ্জরীর ঘাটে।
বাগান বাছিয়া তবে রাম কলা কাটে।
আগাগোড়া ফেলি দিয়া কাটিল প্রবন্ধে॥
জনে জনে সকলে লইয়া চলে কান্ধে।

শব্দার্থ : ৩। বাগান। ৪। ঘটাইও না।

অবিলম্বে ভোরাখান দিলা সাজ করি।
দৈর্ঘ্যে দশ গজ হৈল প্রস্থে গজ চারি॥
মৃত্তিকা ভরিয়া করে সকল পূরণ।
চান্দে বলে বধু এব করহ গমন॥
বিপুলা প্রণাম করি শ্বশুর চরণে।
শাশুড়িকে প্রণাম করিল পরক্ষণে॥
পূর্বজন্মে পাতকিনী অভাগিনী নারী।
মরা সঙ্গে সাগরেতে ভাসি একশ্বরী॥
যদি মোর সত্য ধর্ম কোন রূপে থাকে।
প্রাণপতি জীয়াইয়া আসিব কৌতুকে॥
কপালে লিখন যাহা অবশ্যই ঘটিবে।
আমার কারণে মাগো ব্যাকুল না হবে॥
সনকা শুনিল যদি বধূর বচন।
ধরিয়া বধূর গলে জুড়িল ক্রন্দন॥
বারে বারে লয় দেবী বধূরে নিছনি।
কেমনে রহিব ঘরে আমি অভাগিনী॥
পাশরিব লক্ষীন্দরে তোমারে দেখিয়া।
পতিব্রতা বধূ পাই পুত্র বদলিয়া॥
সাগরে ভাসিবা তুমি কিসের অভাবে।
লক্ষীন্দর দিতে মাত্র না পারিব সবে॥
বিপুলায়ে বলে নহে হেন ব্যবহার।
পতি বিনে ঘরে কিবা সুখ বিধবার॥
স্বামী যে নারীর গতি স্বামী যে দেবতা।
স্বামী পরে গুরু আর নাহি সর্ব্বথা॥

www.pathagar.com

স্বামী জগ স্বামী তপ স্বামী যে পালক।
স্বামী পরে দুই কূলে নাহি যে রক্ষক॥
স্বামী সেবাব্রত বিনা অন্য কিছু নাই।
স্বামী তুষ্ট হলে জানি পরলোক নাই॥
সুখেতে বঞ্চিত ঘরে আমি অভাগিনী।
প্রভুরে টানিয়া খাবে শৃগাল গৃহিণী।
স্বামীকে ভাসায়ে জলে স্ত্রী রহিবে ঘরে॥
সেই ছার নারী প্রাণ কি কারণে ধরে॥
এ অসার জীবন রাখিয়া কিবা ফল।
সে হতে মরণ ভাল ভক্ষিয়া (১) গরল॥
মম নিবেদন বলি শুন অতঃপর।
আমারে দেখিয়া দুঃখ বাড়িবে বিস্তর॥
না দেখিলে না শুনিলে হবে বিস্মরণ।
দিন দুই চারি মাত্র পুড়িবেক মন (২)॥
বিপুলার কথা শুনি সবাই আকুল।
পুরীখন্ড (৩) জুড়ি উঠে ক্রন্দনের রোল॥
চান্দে বলে সনকা কান্দহ কি কারণ।
বধূরে বলহ শীঘ্র করিতে গমণ॥
সাত পুত্র গেল মোর ভুলিনু সকল।
বুড়াবুড়ি থাকি যদি সর্বত্র কুশল॥
মূল রক্ষা হয় যদি বৃক্ষে ধরে ফল।
ফলের কারণে কেন কান্দিয়া বিকল॥
অভরসা না হইবা পাকা দাড়ি দেখি।
ভাল ভাল দেখি তবে রাখ পঞ্চসাক্ষী॥
আমার বচন যদি না কর প্রত্যয়।
কারে সাক্ষি দিব বল ভাবিয়া হৃদয়॥
দ্বিগুণে কান্দয়ে (৪) দেবি শুনিয়া বচন।
অশেষ প্রকারে করে চান্দেরে ভৎসন (৫)॥
সর্বনাশ হল তবু না ছাড় বিবাদ।
তোমার বসতি বাসে নাহি মোর সাধ॥
সুখ-দুঃখ নাহি কিছু নিতান্ত পামর (৬)।
দেবতা নিন্দিয়া (৭) কৈল সর্বনাশ মোর॥
বিপুলায় শ্বশুরকে প্রণাম করিল।
কাতর হইয়া কন্যা কহিতে লাগিল॥
ভোর রাতে উঠয়ে দেও মার লক্ষীন্দরে।
কোন লাভে মরা রাখিয়াছ ঘরে॥

www.pathagar.com

শূনিয়া বধূর কথা চান্দ সদাগরে।
গালি দিতে লাগিল ভৎসিয়া (৮) পদ্মারে॥
শব্দার্থ : ১। ভক্ষণ করিয়া। ২। মনে কষ্ট হইবে। ৩।
সারা নগর। ৪। কান্না করে। ৫। তিরস্কার।
৬। অধম পাপী। ৭। নিন্দা করিয়া। ৮। তিরস্কার করিয়া।

লঘুজাতি কানি আর কি করিবে মোরে।
স্বতন্ত্র করিয়া দিলা ভবানী শঙ্করে॥
মৈল পুত্র লক্ষীন্দর ছয় পুত্র আর।
নাগাল পাইলে কানির শোধ নিব ধার॥
পুরী হইতে কানির উচ্ছিষ্ট কর দূর।
ঘর দ্বার লেপি দাও গোময় প্রচুর॥
দেবপুরে যাবে কন্যা চিত্ত দৃঢ় করি।
ভূমে পড়ে প্রণমিল শ্বশুর শাশুড়ি॥
পিঁড়ির উপরে তবে লক্ষীরে রাখিয়া।
ꣻান করাইলা সবে গঙ্গা জল দিয়া॥
আগর (১) চন্দন দিয়া লেপিয়া শরীর।
পুনরপি রাখিলেন বিছানা উপর॥
শাশুড়ি নিকটে বধু কহে পুনর্বার।
পিরীক্ষা রাখিয়া কিছু যাইব আমার॥
ছমাস জলে বাতি এক কড়া তেলে।
সত্য ভঙ্গ নাহি মোর জানিও সেকালে॥
আর কিছু কহি আমি সত্যের প্রমাণ।
মাটিতে বপন করি রাখ উষ্ণ (২) ধান॥
সেই ধানে ছড়া যবে ধরিবেক হেথা।
তবে জান প্রাণণাথ বাঁচিয়াছে তথা॥
ভূমি চাপা ফুল ধনী উঠায়ে আনিল।
বিপুলা শাশুড়ি হাতে যত্ন করি দিল॥
এই ফুল শুস্ক হয়ে যদি টুটে (৩) বাস (৪)।
সেই দিন জান মোর সত্য হৈল নাশ॥
লোহার তণ্ডুলে পাত্র দিল জল ভরি।
চুলার উপরে তাহা রাখে যত্ন করি॥
অগ্নি বিনা যদি ভাতে ফেণা ফেনা ভাসে।
সেই দিন জানিও আমি চলিয়াছি দেশে॥
যেইদিন খুলে দেখ বাসরে কপাট।
সেই দিন জানিবা আমি গুঞ্জরীর ঘাট॥
শব্দার্থ : ১। গুরু। ২। গরম আতপ। ৩। নষ্ট হয়। ৪। গন্ধ।
এতেক পরীক্ষা দিয়া শাশুড়ি গোচরে।

www.pathagar.com

বিদায় হইয়া বধু যাবে দেবপুরে॥
বধূ বলে শুন বাবা বণিক্য মন্দন।
আজ্ঞা কর আমি তবে করিব গমন॥
বিদায় হইয়া কন্যা সায়ের কুমারী।
কাটা লেজ খানা সঙ্গে নিল যত্ন করি॥
বিপুলা যেবা দাসি ছিল রতি ধাই।
সংবাদ পাঠায়ে দিলা জননীর ঠাই॥
না হইল মাস পক্ষ দিন দুই চারি।
কালরাত্রি নাগে দংশে রূপের মুরারী (৫)॥
নারী কুলে জন্মি বৃথা এ জীবন গেল।
একরাত্রি প্রভু সঙ্গে সুখে না বঞ্চিলা॥
জননীরে বুঝাইয়া বলিও বচন।
আমার শপথ যদি করে ক্রন্দন॥
ছয় মাস থাকে যেন চিত্ত ক্ষমা দিয়া।
দেবপুরী হতে প্রভু আনি জিয়াইয়া॥
বিপুলার আজ্ঞা পেয়ে গেল রতি ধাই।
বিদায় হইতে যায় ছয় জায়ের ঠাঁই॥
সবে মিলি আশীর্বাদ কর মোর প্রতি।
ঘরে বসে পাবে তবে নিজ নিজ পতি॥
গুরু গৌরবিত যত চম্পক নগরী।
সকলে বিদায় দিলা বিপুলা সুন্দরী॥
বিদায় হইয়া কন্যা চলিল সত্বর।
তেড়া দামোদর নিলা মরা লক্ষীন্দর॥
আহা! পুত্র পুত্র বলি সনকায়ে কান্দে।
তাহা দেখি হুঙ্কার পুরিয়া কান্দে চান্দে॥
চলিলা গুঞ্জরী ঘাটে লখাই বিপুলা।
হইল সকল লোক শোকেতে ব্যাকুলা॥
উপনীত হইলেন গুঞ্জরীর ঘাটে।
টান দিয়া ভোরাখানা আনিল নিকটে॥
পুষ্পের শয্যাতে নিয়া রাখে লক্ষীন্দরে।
বাম দিকে বসে কন্যা ভোরা উপরে।

শব্দার্থ : ৫। রূপবান পুরুষ।

সর্ব্বলোকে বিষাদেতে হরি হরি বলে।
ভাসিলা বেহুলা এই গুঞ্জরীর জলে॥
সতী যদি হই আমি পতিব্রতা নারী।
উজান ধরিয়া ভোরা যাবে দেব পুরী॥
সতী কন্যা বাক্যে ভোরা যায় উজাইয়া।

www.pathagar.com

দুই কূলে রঙ্গ চায় সকলে মিলিয়া॥
যাত্রার মঙ্গল কন্যা দেখে হেনকালে।
পবন গমন গতি ভোরাখানা চলে॥
পদ্মার সনে গিয়া মিলিতে ভরসা।
জানকীনাথের মনে এই বড় আশা॥

লাচাড়ী

জাগ জাগ ওহে প্রভু, চক্ষু মেলি চাও।
তোমারে ভাসায়ে যায় তব বাপ মাও॥
ইষ্টমিত্র বন্ধু বর্গ, যত জ্ঞাতিগণ।
তোমারে ভাসায়ে যায়, যার যে ভবন॥
অতি দয়াবতী তব সনকা জননী।
সেও ভাসাইয়া যায়, দেখ গুনমণি॥
তুমি রাজপুত্র আমি রাজার নন্দিনী।
তোমারে লইয়া আজি ভাসি একাকিনী॥
তুমি যে আমার প্রভু, আমি যে তোমার।
মরা স্বামী প্রাণণাথ, হার বিপুলার॥
গরল (১) বান্ধিয়া লই, করিয়া যতন।
জিয়াইতে না পারিলে, করিব ভক্ষণ॥
বামা জাতি (২) হই আমি যথাতথা ভয়।
জাতি কুল সত্য মোর, রয় কিনা রয়॥
পদ্মা গিয়া আনে হেথা, লক্ষীন্দর প্রাণী।
যত দুঃখ দেয় মোরে, শঙ্কর নন্দিনী॥
দ্বিজ বংশীদাসে কহে, সত্যবতী নারী।
অবশ্য পাইবে পতি, গেলে দেবপুরী॥

শব্দার্থ : ১। বিষ। ২। স্ত্রী জাতি।

ভোরায় বেহুলার দেবপুরে গমন, পথে
কাকের দ্বারা ময়ের নিকট সংবাদ
প্রদান ও ফিরাইয়া নিতে ভ্রাতৃ
গণের আগমন।

দিশা আমার লঙ্কা বিনাশ হইল রে, রাবণ।
রাবণ বলে কোন মুণির শাপে॥
আচম্বিতে মৃত্যু গন্ধ পেয়ে শ্বেত কাক।
ভোরা উপরে পড়ি দিল তিন ডাক॥
কন্যা বলে কাক তুমি যমের কিঙ্কর।
ধর্মাধর্ম বিচার ত তোমার গোচর॥
ধর্ম পক্ষী বর তুমি ধর্ম অবতার।

www.pathagar.com

স্বধর্ম চিন্তিয়া তুমি কিছু কর প্রতিকার॥
আমার বচনে চল উজানী ভবন।
জননীকে কহিও যতেক বিবরণ॥
কি আর তোমার স্থানে কহিব বিশেষ।
মাতা কহিও গিয়া আমার নির্দেশ॥
সদয় হইয়া কাক আমার উপর।
সতী কন্যা দেখি কাকে দিল প্রত্যুত্তর॥
জননীকে বলিবা আমার বিবরণ।
কাকে বলে প্রত্যয় না করিবে কখন॥
শুনিয়া কাকের বাণী সায়ের কুমারী।
প্রত্যয় কারণে দিবা কনক অঙ্গুরী॥
দিয়া এই অঙ্গুরীটি বলিবা মায়েরে।
অভাগী বিপুলা যায় দূর দেশান্তরে॥
লইয়া অগুরী কাক উজানীতে চলে।
অগুরী ফেলিল নিয়া কমলা কোলে॥
যতেক রহস্য কাক সকলি কহিল।
হাহাকার করি দেবি কান্দিতে লাগিল॥
চিনিয়া আঙ্গুরী দেবী শোকে বিমোহিত।
নারীগণে ভেড়িয়া ধরিলা চারিভিত॥
মুকুলিত কেশ পাশ ভূমিতে লুটায়।
আপনা পাসরে দেবী আছাড়ের যায়॥
সতী যদি হই আমি পতিব্রতা নারী।
উজান ধরিয়া ভোরা যাবে দেবপুরী॥
সতী কন্যা বাক্যে ভোরা যায় উজাইয়া।
দুইকাল গলায় রহে হরি চরণে নুপূর।
হাতে না রহিল শঙ্খ ললাটে সিঁদুর॥
নিদয় নিষ্ঠুর বিধি পরম দারুণ।
হাতে দিয়া কাড়ি নিলা বড় নিদারুণ॥
খণ্ড তপস্যার ফল না করিনু পূণ্য।
বিপুলা বিহনে মোর সব হৈল শূন্য॥
দেবতা জিনিয়া বর পুণ্য ফলে পাইল।
পাপিষ্ঠ কর্মের দোষে বিধি হরি নিল॥
নাগের বাদুয়া চান্দ ভয় নাই তার।
বাদ হেতু সর্বনাশ ঘটিল আমার॥
আঁটকুড়া চান্দ তার পুত্র কন্যা গেল।
পদ্মা সনে বাদ করি সর্বনাশ হৈল॥

www.pathagar.com

না জানিয়া তার পুত্রে বরিল বিপুলা।
শৈশবে হারায়ে পতি শোকেতে ব্যাকুলা॥
দৈব যোগে প্রমাদ পড়িল কর্ম দোষে।
মরা সঙ্গে একাকিনী সাগরেতে ভাসে॥
দুধের ছাওয়াল মোর কিছু নাহি জানে।
ভয়েতে মরিবে বাছা না বাঁচিবে প্রাণে॥
নিদ্রা হনে জাগি কভু অন্ন নাহি খায়।
এ হেন বিপুলা মোর মরা লইয়া যায়॥
বিনাইয়া কান্দে সবে বস্ত্র না সম্বরে।
মাথায় হাত দিয়া কান্দে ছয় সহোদরে॥
কমলারে বলে পুত্র মোর বাক্য ধর।
বিপুলারে আনি মোর প্রাণ রক্ষা কর॥
কিসের অভাব আছে উজানী নগরে।
সবে মাত্র না পরিব জামাই দিবারে॥
ছয় পুত্র গেল ধেয়ে মায়ের বচনে।
করিল অনেক যত্ন বিপুলা সদনে॥
কি অভাবে যাও তুমি দূর দেশান্তরে।
মরা সঙ্গে একাকিনী ভাসিয়া সাগরে॥
কর্মদোষে যাহা হৈল কি করিতে পারি।
থাক এসে মম ঘরে শোক পরিহরি॥

শব্দার্থ : ১। নিঃ সন্তান।

পণ্ডিত জানকীনাথের কবিত্ব চাকুরি।
মহানন্দে রচিলেক অপূর্ব লাচাড়ী॥

লাচাড়ী

না যাও না যাও ভগ্নি (গো) (২) বাহুরিয়া আয় ঘরে।
আগর (৩) চন্দন কাষ্ঠে, জ্বালাব লক্ষীন্দরে॥
সুবর্ণ পালঙ্ক দিব গো, তোরে শুইবারে।
পঞ্চজনা দাসী দিব, আজ্ঞা পালিবারে॥
বিপুলায় বলে দাদাও শুনহে বচন।
প্রভুরে লইয়া যাব, দেবের ভুবন॥
সদা কালে তব ঘরে হে, না থাকিব ভাল।
আমি গেলে তব ঘরে, বাড়িবে জঞ্জাল॥
হাটের আত্মপ হে তরকারীর ঘটা।
তব বধু দিবা মোরে, আদ্য কালের (৪) খোটা॥
দিবেন আত্মপ চাল হে কুমারীর হাড়ি।
বধূগণে গালি দিবা, (আইলা) লখাইর রাঁড়ি (৫)॥

www.pathagar.com

পণ্ডিত জানকীনাথ হে, মনসা কিঙ্কর।
ছয় ভাই বিপুলারে বুঝাইলা বিস্তর॥
নিতার শিবারূপ ধারণ করিয়া বিপুলার
নিকট গমন ও সাহস বৃদ্ধি করা, তৎপর
ধনা মনার বাঁকে গমন।
দিশা বিপুলার কপালে রে ভগবান,
ভগবান আর কত লিখিয়াছ।
বিপুলায় বলে ভাই মোর নমস্কার।
ঘরে থাকি কিবা সুখ আছে বিধবার॥

শব্দার্থ : ২। ফিরিয়া। ৩। অগুরু। ৪। চিরদিন। বিধবা স্ত্রী।

প্রভুরে জিয়ায়ে আমি আসিব কুশলে।
সুকৃতি রহিবে মোর এই ভূমণ্ডলে॥
ছয় ভাই নমস্কার করি বিপুলায়।
বাক্য নাহি শুনে ভোরা বেগে চলে যায়॥
এক দৃষ্টে চাহি রয় মিলে ভ্রাতৃগণে।
মরার সহিত ভোরা চলিছে উজানে (১)॥

বিপুলা স্বামীর সঙ্গে ভাসিল সাগরে।
দেখিয়া গেলেন নেতা মনসা গোচরে॥
পদ্মা বলে নেতা তুমি শিবারূপে যাও।
দেখা দিয়া বিপুলার সাহস বাড়াও॥
বামা শিবারূপে নেতা করিলা গমন।
ভোরার নিকটে গিয়া দিলা দরশন॥
খেকি দিয়া রুটি যায় দন্তের ঝগড়া।
কাড়িয়া লইতে চায় ভোরা হতে মরা॥
শিহরে গায়ের লোম লেগুর পাকায়।
চক্ষে ঝলমল করে দুগাল ফুলায়॥
ভয়ানক মূর্তি ধরি আগুলিয়া যায় (২)॥
প্রাণ করে ধড়পড় না দেখি উপায়।
শিবা বলে মরা বেটা দিবায় আমারে।
তুমি গিয়া থাক ভাল গৃহস্থ ঘরে॥
কত দিনে জীবে পতি পাবে কত দুঃখ।
জীবন সফল কর ভুঞ্জি নানা সুখ॥

আপনে বাঁচিলে হয় মা বাপের নাম।
খাও বিলাও কর পরকালের কাম॥
মরা দিয়া চলি যাও অন্যপতি ধর।

www.pathagar.com

মরার সহিতে কেন দেশে দেশে ঘুর॥
বিপুলা বলিছে শোন বচন আমার।
পশুর নিয়ম আছে শতেক ভাতার (৩)॥
কিবা জান শিব তুমি হও পশুজাতি।
লাজ ভয় নাহি কিছু শতে শতে পতি॥
পর্বতে জঙ্গলে থাক দলে দলে।
কাটার আড়ালে থাক নিজ কর্মফলে॥

শব্দার্থ : ১। শ্রোতের উল্টা দিকে। ২। সামনে আসিয়া আক্রমণ করে। ৩। স্বামী।

বিপুলার কথা কিছু শৃগালে না শুনে।
মরাটারে নিতে চায় ভোরা হৈতে টেনে॥
আপনে জানহ মৃতে মোর অধিকার।
মরা নাহি দেও আর কর অবিচার॥
কতদিন হবে তবে যাবে দেবপুরে।
মাংস খণ্ড খসে যাবে অস্থি যাবে ঝড়ে॥
কন্যা বলে অস্থি খানি শুধু যদি থাকে।
তবুও জীয়াব পতি গিয়া দেবলোকে॥
পতি যে নারীর ধর্ম পতি যে দবতা।
হীন পশুজাতি তাই কহ হেন কথা॥
লজ্জা পেয়ে বামা শিবা করিলা গমন।
পণ্ডিত জানকী বলে মধুর বচন॥
শৃগালিনী সঙ্গ কন্যা এড়িয়া পলকে।
চলি যায় পতিব্রতা পাটা হেন বুকে॥
পবন গমন নিন্দে ভোরার চলন।
ধনা মনা ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥
ধনা মনা দুই ভাই গর্ব সহোদর।
ষোল হাজার ঝালমাল তাহার নফর॥
ডাকাতি করিয়া তারা হৈল ধনেশ্বর।
ভাল ভাল কন্যা হরি আনিয়াছে ঘর॥
নিরবধি মদ খায় করে পরদার।
আত্মপর ভেদাভেদ নাহি কিছু তার॥
সাগরের তীরে টঙ্গী করিয়া প্রবন্ধে।
তাহে বসি খেলে পাশা মনের আনন্দে॥
হেনকালে সায়ের কুমারী পতিব্রতা।
মরার সহিত আসি উপনীত তথা॥
ভোরার উপরে কন্যা রূপে সুশোভিত।
দেখি ধনা মনা দোহেঁ হৈল হরষিত॥
ধনা বলে বিধাতার নির্বন্ধ কারণে।

www.pathagar.com

উপনীত দিব্য কন্যা নিজ সন্নিধানে॥
ডাক দিয়া ধনা বলে শোন শশীমুখী (১)।
কী নেও ভোরেতে করি আন চাই দেখি॥
কন্যা বলে ধনরত্ন কিছু নাহি মোর।
মরা স্বামী নিয়া আমি ভেসেছি সাগর॥
একাকিনী ভাসিয়াছি মনের সাহসে।
বিচারি গারুড়ি যদি পাই কোন দেশে॥
ধনা বলে গারুড়ি আমার দেশে নাই।
মরাকে ভাসায়ে শীঘ্র তটে উঠ চাই॥
চাপাও চাপাও ভোরা ডাকে ঘন রায়।
মনসার ভরে ভোরা আপনে উজায়॥
ত্রাসিত হইল কন্যা প্রাণ কাঁপে ভয়ে।
হৃদয় করিয়া দৃঢ় স্মরিল পদ্মারে॥
পন্ডিত জানকীনাথ ভাবি বিষ হরি।
পয়ার ছাড়িয়া বলে সম্মুখে লাচাড়ী॥

লাচাড়ী বেয়ে গিয়া কৌতুহলে, ধনায় মনায় বলে,
এসো কন্যা আমার ভবন।
ভয়ঙ্কর জলচরে, পাইলে খাইবে তোরে,
সাগরে মরিবে অকারণ॥
মরা ফালাইয়া জলে, ইচ্ছায় না আস বলে,
আনিব পড়িছ মোর হাতে।
ভোরার সাক্ষাতে গিয়া, আগুলিল নৌকা দিয়া,
ভুলিয়া মদন শরাঘাতে॥
ধনার চরিত্র দেখি, ডরে কাঁপে চন্দ্রমুখী,
বিষহরি চিন্তে মনে মনে।
দুষ্টজনে মন্দ বলে, আসিয়া সঙ্কট কালে,
মনসা আসিলা ততক্ষণে॥

শব্দার্থ : ১। হে সুন্দরী।

পদ্মা আসে রথ ভরে, ধনা মনা বুদ্ধি হরে,
দোহে মিলে করে গালাগালি।
ধনা বলে আমি নিব, মনা বলে না ছাড়িব,
বিবাদে করয়ে কিলা কিলী॥
চুলাচুলি ধরাধরি, রঙ্গ চাহে বিষহরি,
কোলাহল করে দুইজন।
মারিছে মুষ্ঠির ঘাও, লাথিয়ে (১) ভাঙ্গিল নাও,
সাগরে ভাসিল সেইক্ষণে॥

www.pathagar.com

দোঁহা মুখে শুভ রাও, বিপুলাকে ডাকে মাও (২)।
যাও কন্যা আপনার স্থানে।
বিপুলা চলিয়া যায়, বিষহরি রঙ্গ চায়,
পন্ডিত জানকীনাথ ভগে॥
বিপুলার গোদার বাঁকে গমন।
দিশা গোদায় নাচিল রে রইয়া বালুচরে,
গোদার নাচনে বালু থর থর করে।
ছাড়িয়া ধনার বাঁক পরম কৌতুকে।
চলিলা সুন্দরী কন্যা পাটা হেন বুকে॥
বিজলী চটক যেন ভোরার সাজন।
সাক্ষাতে গোদার বাঁকে দিল দরশন॥
পরম অদ্ভূত তথ্য গোদের ঈশ্বর।
লক্ষ লক্ষ গোদা আছে সেই সে নগর॥
গোদা ছাড়া তার দেশে ভাল লোক নাই।
প্রকৃত শরীর যার তার নাহি ঠাঁই॥
অবধি নাহি যে গোদ আছয়ে প্রচুর।
হস্ত পদে গোদ তার যেন হয় মোড়া।
মধ্যে মধ্যে বীচি যেন ডেফলের কড়া॥

শব্দার্থ : ২। লাথি মারিয়া, পদাঘাত করিয়া। ৩। মা বলিয়া।

সকল শরীরে দাদ বিকট দর্শন।
সর্বদা যা ইচ্ছা খায় কুৎসিত লক্ষণ॥
আরও গোদার হয় রোগ রাজকাশ।
বয়স অধিক নয় বৎসর পঞ্চাশ॥
যেই মতো পীনা গোদা পরম সুন্দর।
সেই মতো তিন নারী আছে তার ঘর॥
গোদার তিন নারী একটি নহে ভাল।
এক বেটি পেঁচা নাকী রং অতি কাল॥
অন্যটির পৃষ্ঠে গোঁজ আছে অতি বড়।
আর বেটির মুখ খান লৌহ হতে দড়॥
হাতে পায়ে গোদ আছে গলে গলগন্ড।
সকল শরীরে মেজ দেখিতে প্রচন্ড॥
চক্ষে নাহি দেখে কিছু পেচরীর কাজে।
আউদল (১) চুলে ভাল মুখখানা সাজে॥
কত বা কহিব তার রূপের জিনিস।
বৎসর বিস্তর নয় মাত্রই চল্লিশ॥
অন্ন বস্ত্রহীনা বেটা জনম ভিখারী।

www.pathagar.com

জীবিকা উপায় তার নিত্য মৎস্য মারি॥
বড়শি ছাড়িয়া তার নহিক উপায়।
বড়শির মৎস্য বেচি নিত্য ভাত পায়॥
সদায় বড়শি বায় সাগরের জলে।
ভোরার উপরে কন্যা দেখে হেনকালে॥
কন্যা দেখি গোদা বেটা বড় আনন্দিতে।
ঊর্ধ্বমুখে চগবগি (২) চায় চারিভিতে (৩)॥
আপনার রূপে গোদা চাহে ঘন ঘন।
উবাফালে (৪) নাচে বেটা হরষিত মন॥
মনে মনে গোদা বেটা আপনা প্রশংসে।
আমারে দেখিয়া বুঝি নিজে নিজে আসে॥
ভাসিয়া যাইতে কন্যা মম রূপ দেখি।
এক দৃষ্টে মোর প্রতি চায় চন্দ্রমুখী॥

শব্দার্থ : ১। আলুলাতি (এলোমেলো)। ২। ফ্যালফ্যাল করিয়া।
৩। চারিদিকে। ৪।উচ্চ লাফে।

হাতের বড়শি নিয়া নাচে ফালে ফালে (৫)
পাকা গোদ গলি পড়ে সাগরের জলে॥
গোদা বলে ভোরা (৬) খান চাপাও সুন্দরী।
উজান ধরিয়া ভোরা যায় ত্বরা করি॥
অভরসা (৭) হৈল গোদা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ভোরা না চাপাও কন্যা যাও মরিবারে॥
জলে ঝাঁপ দিযা চায় রাখে ভোরা খান।
গোদার চরিত্র দেখি ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥
ডোম কি ডুগলা নই জাতি রাজপুত।
হাতে পায়ে চারি গোদ যেন বন ভূত॥
মনে ভাবে সুন্দরী গোদার কেহ নাই।
আমি ছাড়া রূপে গুণে আছে পঞ্চ ভাই॥
বড় বড় মাছ মারি ঘরে দিব নিয়া।
মনানন্দে খাবে তুমি ভাজিয়া পুড়িয়া॥
মনে ভাব সুন্দরী গোদার নাই ধন।
তিন খাদে রাখিয়াছি কড়ি দেড় পণ॥
কি বল গো সুন্দরী সতীনে নিবে বাটা (৮)।
বাছিয়া তাহারে দিবা ছোট মাছের কাটা॥
বাদলা (৯) দিনেতে কভু জলে নাহি যাবে।
এক গোদ গালিয়া কলসা ভরে থবে॥

www.pathagar.com

এ তিন ভুবন মাঝে বিচারিয়া চাও।
এমন সুখের স্থান আর কোথা পাও॥
শোন শোন সুন্দরী গো চাহ দিয়া মন।
এতাধিক ধন দিয়া রাখে কোন জন॥
পন্ডিত জানকীনাথ মনসার দাস।
ভাঙ্গিয় পুরাণ শ্লোক করিল প্রকাশ॥

লাচাড়ী

হরষিত গোদা বলে, মরা পালাইয়া জলে,
আসি কন্যা আমার আলয়।

শব্দার্থ : ৫। প্রতি লাফে। ৬। ভেলা। ৭। নিরাশ।
৮। ভাগ, অংশ। ৯। বৃষ্টির।

সদায় বড়শী বায় সারের জলে।
ভোরার উপরে কন্যা দেখে হেনকালে॥

পরাণে বিলম্ব নাহি সয়॥
জাতে আমি রাজপুত, রূপে গুণে অদ্ভূত (১),
গলে গলপন্ড শোভা করে।
চেয়ে দেখ একদৃষ্টে, পাটা হেন গোজ পৃষ্ঠে,
বড় মেজ মাথার উপরে॥
হাতে পায়ে গোদ চারি, বীচি তাহে সারি সারি,
পাকা ঢেউয়া (২) যেন ধরে গাছে।
তোর মোর রূপ এক অদৃষ্টে সদৃষ্টে দেখ,
বিধাতার নিবন্ধ যে আছে॥
তিন রাণী আছে মোর, দাসী করে দিব তোর,
যত সব কার্য করিবারে।
চাটি পাতি শুই আমি, বিচীটি গালিবা তুমি,
তোর এই কর্ন্ম করে॥
গোদার চরিত্র দেখি, ডরে কাঁপে চন্দ্রমুখী,
বিষহরি ভাবে মনে মনে।
পদ্মাবতী দিলা বর, গোদার উঠে কম্প জ্বর,
পন্ডিত জানকীনাথে ভণে॥

পথে বিপুলার মাতুল শ্বশুরহরি সাধুর সহিত দেখা ও আলাপ পরিচয়।
দিশা চন্দ্রধরের পুত্রবধূ নামটি বিপুলা।
তুমি আমার মাতুল শ্বশুরের শালা।

www.pathagar.com

মনসার কপটে (৩) গোদার উঠে জ্বর।
হাবু ডাবু করে গোদা জলের ভিতর॥
জল খায় গোদা বেট পেট হৈল মোটা।
রক্ষা কর মাগো তুমি আমি তোর বেটা॥
এখনে বলিলে বেটা নিয়ে যাব ঘরে।
এইমাত্র হলে কেন পরাণে কাতর॥
হৈয়া কনের ব্যাঙ সাপ সঙ্গে লড়।
প্রাণ নিয়ে শুভে শুভে ঘরে গিয়া পড়॥

শব্দার্থ : ১। অতুলীয়। ২। একজাতীয় টক ফল। ৩। মায়ায়।

এড়িয়া গোদার বাঁক পরম কৌতুকে।
চলিলা সুন্দরী কন্যা পাটা হেন বুকে।
পবনের বেগ হেন ভোরার চলন।
হরি সাধু বাঁকে গিয়া দিলা দরশন॥
বসিয়াছে সাধু তথা মাণিক্য পাটন।
ষোল খানা ডিঙ্গা তার বিচিত্র সাজন॥
দাদশ বৎসরে সাধু চলিয়াছে ঘরে।
বাণিজ্য করিতে গেল দক্ষিণ সফরে॥
ডিঙ্গা সব ভরিয়াছে সফরিয়া ধনে।
দিবানিশি বায় ডিঙ্গা আনন্দিত মতো॥
কৌতুকে বসিছে নায়ে হরি সদাগর।
সম্মুখে করয়ে নিত্য যত নাট্যকার॥
হেনকালে ভোরাখানা আসিল ত্বরিত।
কন্যা দেখি হরি সাধু মদনে পীড়িত॥
মরার সহিত কন্যা ভোরা উপর।
আনন্দি হৈল দেখি হরি সদাগর॥
কন্যার যৌবন রূপে মুণি মোহ পায়।
ভোরার নিকটে সাধু নৌকা বাইয়া যায়॥
জিজ্ঞাসা করিল সাধু সুবদনী।
আলীঙ্গন দিয়া মোর রক্ষা কর প্রাণী॥
মৃতটা ফেলিয় দাও সাগরের জলে।
নৌকাতে উঠিয়া আস মন কৌতুহলে॥
নানা অলঙ্কার দিব বিচিত্র বসন।
অমূল্য রতন দিব সফরিয়া ধন॥
কোন কালে না লঙ্ঘিব তোমার বচন।
তুমি ছাড়া অন্য দিকে নাহি দিব মন॥
ঘরেতে আছে যে মোর শতেক রূপসী (৫)।
সবাকারে করি দিব পদ সেবা দাসী॥

www.pathagar.com

করিবে তোমার সেবা দাসী সমতুল(৬) ॥
দোষ গুণ বুঝি কাটিবা নাক চুল॥
ধন জন সম্পদ মিরাশ (৭) পরিবার।
সত্য করি বলি আমি সকলি তোমার॥

শব্দার্থ : ৪। পুত্র। ৫। সুন্দরী স্ত্রী। ৬। সমান। ৭। খাজনা রহিত জমি।

প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি সাগরের জলে।
এই মতে সোহাগ (১) থাকিবে চিরকালে॥
ভোগিবা পরম ভোগ সংসারের সার।
মনোরথ পরিপূর্ণ করহ আমার॥
নৌকা রাখিয়া সাধু কন্যার দিকে ধায়।
কেশে ধরি বল করি নিয়ে যেতে চায়॥
বিপুলায় বলে সাধু শুনহ উত্তর।
হিত বাক্য কহি কিছু তোমার উপর॥
ধরি দ্রৌপদীর কেশ মরে দুর্য্যধন।
কালীর কেশেতে ধরি শুম্ভের (২) পতন॥
সীতার ধরিয়া কেশ নির্বংশ (৩) লঙ্কেশ্বর (৪)।
পুরাকালের বচন কহিনু সবিশেষ॥
সাধু প্রতি কহে কন্যা দেহ পরিচয়।
ঘর বর জানি কহি উচিত যা হয়॥
কন্যার বচনে সাধু অকপটে কয়।
সাধু পতি বলে কন্যা পাইয়া পরিচয়॥

লাচাড়ী

বিপুলায় বলে বাপু,বণিক্য কুমার।
হৈলা মামাশ্বশুর কমা সম্বন্ধে আমার॥
সজ্খপতি তনয়া, শ্বাশুড়ি হয় মোর।
মোরে বিয়া করে তার, পুত্র লক্ষিন্দর॥
কাল হয় কাল রাত্রি, কাল নিশি চরে।
প্রভু রে খাইল সাপে লোহার বাসরে॥
তারে জীয়াইতে আমি, দেবপুরে।
কহিনু তোমাকে আমি,
বার্তা দিয়া (৫) জানিবারে॥
হরি সাধু শুনি কহে, বিপুলার বাক্য।
কী কারণে বল তুমি, বচন অশক্য (৬)॥
ছয় ভাগিনারে মোর দংশে বিষধরে।
ভাসাইয়া দিল সাধু, গুঞ্জুরী সাগরে॥

শব্দার্থ : ১। আদর। ২। সম্ভু নামক দৈত্যের বংশহীন।
৪। লঙ্কার রাজা রাবণ। ৬। অস্থ্য, অন্যায়।

www.pathagar.com

দৈবের নিবন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
শুনিয়া না মানে সাধু কন্যার বচন॥
মুগ্ধ হৈয়া সত্যনাশ করিবারে চায়।
বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরে কন্যা ভোরা চলি যায়॥
বিপুলায় বলে যদি, সতী হই আমি।
ডিঙ্গা ঠেকিয়া চরে মাস দুই থাক তুমি॥
জীয়াইয়া প্রভুরে আনি আমি তব পাশে।
ভাগিনা বধূর সঙ্গে, যাবে তবে দেশে॥
সতী কুমারীর বাক্য কভু ব্যর্থ নয়।
চরেতে ঠেকিল সাধু নারায়ণ কয়॥
হরি সাধুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া
বিপুলার টেন্টনার বাঁকে গমন।
দিশা জটা বাকল পরিধানে রে,
আমার শ্রীরাম চন্দ্র যায় বনে।
ধণু ধারী অনুজ লক্ষণ
শীতে যায় তার সঙ্গে রে॥
লক্ষীন্দর জন্ম হরি সাধুয়ে না জানি।
বাণিজ্য কয়িয়া দেশে যায় বহুদিনে॥
আছিল বিদেশে সাধু না জানে কাহিনী।
এ কারণে বলে সাধু অনুচিত বাণী॥
সাধু বলে কন্যা তুমি দেও পরিচয়।
কাহার নন্দিনীকে সে করিল পরিণয়॥
কোন বংশে জন্ম তব থাক কোন রাজ্যে।
মরা সঙ্গে একাকিনী ভাসিলা কি কার্যে॥
শুনিয়া সাধুর বাণী নন্দিনী।
কহিলেক আপনার পরিচয় বাণী॥
পিতা মোর সায়ের রাজা জননী কমলা।
উজানী নগরে ঘর নামটি বিপুলা॥
পতি মোর লক্ষীন্দর চম্পকেতে ঘর।
শ্বাশুড়ী সনকা বটে শ্বশুর চন্দ্রধর॥
মনসার সনে করে শ্বশুর বিবাদ।
তাহার কারণে মোর এতেক প্রমাদ॥
বিপুলার মুখে সাধু এই বার্তা শুনি।
লাজে হেট মাথে রহে অপমান গণী (১)॥
সম্বন্ধে জানিল কন্যা ভাগিনার বধূ।
আপনার পরিচয় দিলা হরি সাধু॥
মহোদরী ভগিনী সনকা পাটেশ্বরী।

www.pathagar.com

মাণিক্য পাটনে ঘর নাম মোর হরি॥
দেশে না ছিলাম মাগো যাইনু ছফরে।
বলিলাম দূরক্ষরে (২) না জানি তোমারে।।
কি আর বলিব হইল আভিলাষ।
পরিচয় না জানি করিনু উপহাস॥
বিপুলা কহিল প্রভু তোমার দোষ নাই।
বিধাতা বিমুখ হৈল এত শাস্তি পাই॥
লজ্জায় বিকল (৩) সাধু নিলেন বিদায়।
মনসা ভাবিয়া কন্যা দেবপুরে যায়॥
অলক্ষীতে যায় ভোরা পবন গমনে।
টেন্টার বাঁকে কন্যা আসিল তখনো॥
জুয়ারীয়া (৪) বেটা থাকে সাগরের তীর।
ডুবিয়া মরিবে বলি কান্দিয়া অধীর॥
আছিল তাহার পিতা মান্য সভাকার।
এই বেটা হৈল তার কুলে অঙ্গার(৫)॥
শৈশব না যেতে তার জুয়ারীতে (৬) মন।
টাকা কড়ি নিয়া জুয়া খেলে অনুক্ষণ॥
আনিয়া ঘরের ধন বসিয়া খেলায়।
সকল হারিয়া শেষে শুধু হাতে যায়॥
ধন জন হারাইল ঘর-দোর বাড়ি।
হারাইল পৈরণ বস্ত্র (৭) চুল গোফ॥
সকলি বিনাশ হৈল জুয়ার কারণ।
সর্বলোকে বলে তারে উদাস টেন্টন॥
সকলি হারিয়া গেল হৈল পাগল।
শরীরে না সহে দুঃখ সদাইয় চঞ্চল॥

শব্দার্থ : ১। কনে করি। ২। কটু কথা। ৩। জড়সড়। ৪। জুয়ারু। ৫। কলঙ্ক। ৬। জুয়া খেলায়। ৭। পরিধানের কাপড়।

চাকর নোফর যত হারিল খেলিয়া।
নিদ্রায় স্বপন দেখি উঠে চমকিয়া॥
দুই কড়া কড়ি লয়ে সদায় খেলায়।
জুয়া না খেলি বেটা স্বস্তি (৮) নাহি পায়॥
যে দিকেতে যায় সে যে হাতে কড়ি লইয়া।
হাততালি দিয়া লোকে দেয় খেদাইয়া॥
অপমান পেয়ে বেটা মৌনভাবে রয়।
বাঁচিবার সাধ নাই মরিবে নিশ্চয়॥
দড়ি আর কলসিটা নিয়ে ধীরে ধীরে।

www.pathagar.com

মরিবারে যায় বেটা ডুবিয়া সাগরে॥
সাগরের তীরে গিয়া নামিলেক জলে॥
ভোরার উপরে কন্যা দেখে হেন কালে॥
মনে মনে ভাবে বুঝি সফল জীবন।
হৃদয়ে সুবুদ্ধি তার হৈল তখন॥
টেন্টনায়ে বলে কন্যা কর অবদান।
এ জগতে দুখী নাই আমার সমান॥
পন্ডিত জানকীনাথ কহে বিবরণ।
লাচাড়ী প্রবন্ধে পদ্মার চরণ॥
শ্রী ভূমি শ্রী হট্টে বাস উত্তম ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণাত্রেও গোত্র শুদ্ধ শ্রী পতি নন্দন॥
পরম পবিত্র মাতা মহা মায়া নাম।
তান গর্ভে ছয় পুত্র হৈলা গুণ ধাম॥
পদ্মার চরণ যুগে কবি প্রণিপাত।
দুস্তর সাগর লঙ্ঘে শ্রী জানকীনাথ॥

লাচাড়ী

ধূয়া শুন কন্যা আমার বচন।
বিধাতার বিড়ম্বন, শোন কন্যা দিয়া মন,
জুয়াপাশা খেলি রাতদিন।
সাত পুরুষের ধন, খোয়াইনু (৯) অকারণ,
সর্বনাশ জুয়ার কারণ॥

শব্দার্থ : ৮। শাস্তি। ৯। নষ্ট করিলাম।

শাসনে পুণিত (১) বাড়ি, অনেক অন্তর (২) জুড়ি,
বিচিত্র নির্মাণ ঘরখানি।
হারাইনু পুত্র কন্যা, পাপিষ্ঠ জুয়ার বন্যা,
মিরাশ জাঙ্গাল (৩) পুষ্করিনী॥
অপূর্ব সুন্দরী নারী, বন্ধকেতে জ্ঞাতীবাড়ি,
অপমান যত কিছু আর।
স্বামী বর্তমানে নারী, দিয়াছিনু দাসি করি,
কাপুরুষ আমি কুলাঙ্গার॥
পাঁচটি সন্তান ছিল, বন্ধকী পড়িয়া রৈল,
নিরুপায় ভাবিয়া চিন্তিত।
লোক নিন্দা অপমান, না সহে আমার প্রাণ,
জলে ডুবি মরিব নিশ্চিত॥
দাঁড়ি গোফ চুল নাই, সকলি হারিয়া যাই,

www.pathagar.com

নাম মোর উদাস টেন্টন।
কহি বিবরণ মোর, প্রভুর কুশল তোর,
আমারে দেও কিছু ধন॥
বিপুলা সন্তোষ হইয়া, কনক অগুরী দিয়,
টেন্টনারে কহিলা তখনে।
অল্প কিছু ধন লও, নিশ্চিন্তে ঘরেতে রও,
দুঃখ তুমি না ভাবিও মনে॥
আমার বচন ধর, এহেন কুকর্ম ছাড়,
সতত থাকিবে সাবধানে।
ইহারে ভাঙ্গিয়া খাও, জুয়া পাশা না খেলাও,
পন্ডিত জানকীনাথে ভণে॥
টেন্টানার বাঁক ছাড়িয়া বিপুলার ভাগের
বাঁকে গমন।
দিশা আম সঙ্কটে পড়িয়াছি গো,
আমি বিপদে পড়িয়াছি গো-
সময়কালে রাখিও চরণে॥

শব্দার্থ : ১। পরিপূর্ণ। ২। জায়গা। ৩। বাগান।

ধন নিয়া টেন্ট নায় উঠে গেল তীরে।
জীউক তোমার স্বামী আশীর্বাদ করে॥
ছাড়িয়া টেন্টনা বাঁক পরম কৌতুকে।
চলিলা সুন্দরী কন্যা স্মরী মনসাকে॥
দ্রুত গতি চলে ভোরা পবন গমন।
সম্মুখে বাঘের বাঁক দিল দরশন॥
পদ্মাবতী বলে নেতা শোনোগো বচন।
ব্যাঘ্র রূপে যাও তুমি বিপুলা সদন॥
সাগরের তীরে রহে ব্যাঘ্ররূপ ধরি।
হেনকালে ভোরা নিয়া আসিলা সুন্দরী॥
মায়ারূপী বাঘ রে তবে গর্জিয়া উঠিল।
প্রলয় কালেতে যেন সিন্ধু উথলিল॥
বিপরীত ডাক ছাড়ে লেগুর পাকায়।
দন্তি কড়মড়ি করি দুগাল ফোলায়॥
ডাক দিয়া বলে ওলো গৃহস্থের নারী।
মারা গোটারে আমার স্থানে দেও শীঘ্র করি॥
ইহারে খাইয়া আমি চলে যাব ঘর।
নতুবা উভয়ে খাইয়া ভরিব উদর॥
বাঘের চরিত্র দেখি সায়ের কুমারী।
মুখে নাহি সরে বাক্য নিরুপায় হেরি॥

www.pathagar.com

অচেতন হৈয়া কন্যা পড়িল ত্বরাসে (৪)।
চৈতন্য পাইয়া পরে রহিলেক বসে॥
বাঘে বলে শীঘ্র করি মরা দেও মোরে।
লাফ দিয় পড়ে যেন ভোরার উপরে॥

লাচাড়ী

শুনিতে বাক্য (৫) কথা, বাঘে নি খাইবে, মুতা (৬)।
মনে মোর না লয় (৭) প্রত্যয়।
আমি অনুমান করি, ব্যাঘ্র নহে বিষহরি,
মায়া করি দেখাও যে ভয়॥

শব্দার্থ : ৪। ত্রাসে, ভয়ে। ৫। অসম্ভব, বিশ্বাসের অযোগ্য।
৬। মরা। ৭। হয়।

শোন শোন বাঘ্র বর, আমার বচন ধর,
মোরে খাও প্রভুর বদলে।
কাল রাত্রি নিশা ভাগে, প্রভু রে খাইল নাগে,
মরা সঙ্গে ভাসিয়াছি জলে॥
বড় নিদারুণ মতি, খেতে চাও প্রাণ পতি,
তোর প্রাণে নাহিক বেদন।
মরা মাংস স্বাদ নাই, কহি যে তোমার ঠাই,
আর সর্পেতে করেছে দংশন॥
বাঘে বলে তুমি ছাড়, জীতা (৪) মাংস কদাচার,
তোর স্বামী খাইব নিশ্চয়।
মৃত স্বামী মোরে দিয়া, অন্য পতি বর গিয়া,
এ কথা কর হ প্রত্যয় ।।
শুনিয়া বাঘের বাণী, স্তুতি করে সুবদনী,
পদ্মাবতী ভাবে মনে মন॥
ভজ দেবী পদ্মাবতী, যদি চাও অব্যাহতি,
জানকীনাথের সুবচন॥

ব্যঘ্রের বাঁক পরিত্যাগ করিয়া বিপুলার
ত্রিবেণীতে গমন ও লক্ষ্মীন্দরের অস্থি,
প্রক্ষালন এবং নেতা ধুপীর
আশ্রয় গ্রহণ।

দিশা তুমি কোথায় রয়েছ দীনবন্ধু-হে রাম, দুঃখের সময়ে।
দুঃখের সময়ে দুঃখের সময়ে রে দুঃখের সময়ে।

www.pathagar.com

বিপুলায় বলে বাগ অনুচিত কহ।
অনুমানে বুঝিলাম ব্যঘ্র তুমি নহ॥
মরা মাংস কদাচিত বাঘে নাহি খায়।
বুঝিলাম পদ্মাবতী এসেছে হেথায়॥
কী কারণে তুমি মোরে কর বিড়ম্বনা।
তোমার চরণ বিনা নাহি উপাসনা॥
১। জ্যান্ত প্রাণী। দোহাই শীবের যদি মরা নেও মোর।
স্ত্রীবধ দিব গো আজি তোমার উপর॥
পূর্বের প্রতিজ্ঞা মাগো সব পাশরিলা।
কালরাত্রি যোগে মোর প্রভুরে খাইলা॥
এখন পথেতে আসি নিতে চাও মরা।
দোহাই শিবের যদি ধর আসি ভোরা॥
যাহা করিবার কর অনুগত জনে।
মরা প্রভু নিয়া যাব তোমার চরণে॥
তথা গেলে প্রভু মোর জীয়াবে আপনে।
নেতা ভাবে, পরিচয় পাইল এখানে॥
রথ ভরে নেতা গেলা মনসা ভবনে।
ছাড়িয়া বাঘের বাঁক চলে এক মনে।
ভোরা দিয়া চলে কন্যা মন অভিলাষে।
চলিলা সুন্দরী কন্যা পরম সাহসে॥
মনসা স্মরণ করি করিলা গমন।
ত্রিবেণি মোহনা ভোরা দিল দরশন॥
তিন স্রোত তিন দিকে ত্রিবেণি মোহনা।
কোন স্রোতে কোথায় যাই না পাই ঠিকানা॥

লাচাড়ী

বড় বড় বিহঙ্গম (২), যেন কালতক যম,
দেখি তাহা প্রাণ কাঁপে ডরে।
হাঙ্গর কুম্বির দলে, ভাসান দিয়েছে জলে,
নাড়ে জল অতি ভয়ঙ্কর॥
জলের কল্লোল ধ্বনি, শুনিয়া উড়িল প্রাণী,
এ সংকটে প্রাণ কিসে পাব॥
একে আমি আমি নারী জাতি, তাহে হই শিশুমতি,
কী সাহসে কোন পথে যাব।
হৃদয়ে না পাই বুদ্ধি, না জানি ইহার শুদ্ধি,
কোন স্রোতে যাবে ভোরা খান।

www.pathagar.com

দিক বিদিক ঠিক নাই, না জানি কোথায় যাই,
না পারি করিতে অনুমান॥
দেবের ভুবনে যাব, মৃত পতি জীয়াইব,
বড়ই ভরসা ছিল মনে।
দেখিয়া ত্রিবেণি জল, বুদ্ধি গেল রসাতল (১),
পন্ডিত জানকীনাথে ভণে॥

দিশা আমার মনে বড় ভয় লাগে রে,
সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া॥
ত্রিবেণি মোহনে কন্যা না পায় উদ্দেশ।
নেতার নিকটে পদ্মা কহিলা বিশেষ।
মরার সহিতে ঊষা পড়িছে সংকটে।
ভোরাখানা আন গিয়া তটের নিকটে॥

পদ্মার বচনে নেতা ত্রিবেণিতে গিয়া।
ভোরাখানা আনিলেন মন্ত্র উচ্চারিয়া॥
উজাইয়া যায় ভোরা মনসার ভরে।
সায়ের কুমারী ভাবে হরষন্তরে॥
আপনে চলিল ভোরা না বুঝি কারণ।
মনে মনে ভাবে কন্যা পদ্মার চরণ॥

গলিয়া পড়েছে মৃত অস্থি মাত্র সার॥
যুক্ত হয় এ সময়ে ধুইয়া লইবার ॥
ছয় মাস অন্ত হল ভাসিছি সাগরে।
ক্ষণ মাত্র ছিনু আমি শ্বশুরের ঘরে॥
মনে মনে যুক্তি করে নিরক্ষীয়া (২) মরা।
এমন সময়ে তটে লাগিলেক ভোরা॥
ধরিতে গলিয়া পড়ে ধরণ না যায়।
ভাবিয় চিন্তিয়া বলে করি কি উপায়॥
পন্ডিত জানকীনাথ মনসার দাস।
পুরাণ অমৃত বাণী করিল প্রকাশ॥

লাচাড়ী

বিপুলা স্বামীর সনে, বিষাদ ভাবিয়া মনে,
কান্দে ধণী ত্রিবেণিতে ভাসি।

সুন্দর শরীর তব, কিবা নর কিবা দেব,
হেনদেহ পড়িগেছে খসি॥

www.pathagar.com

ছিলাম আমরা বতী, কপটেতে পদ্মাবতী,
দোহারে আনিল মৃত্যুপুরে।
পাইনু এহেন পতি, সুখে ভোগে নাহি রতি,
মৃত সঙ্গে ভাসিনু সাগরে॥
বিধাতার লিপি যাহা, দৈবেতে ঘটায় তাহা,
পড়িনু ভিষম বিপাকেতে।
কি বা অপরাধ পেয়ে, দেবরাজ পাশ দিয়ে,
দিল জন্ম মানব কুলেতে॥
তপখন্ড করেছিনু, তাহে প্রভু হারাইনু,
মনসার দারুণ সাপেতে।
কামতুল্য রূপ ছিল, হেনতণু কোথা রইল,
চন্দ্র যেন ডাকিল মেঘেতে॥
অস্থি সব করে ধরি, সতী বেহুলা সুন্দরী,
জলে গিয়া লয় প্রক্ষালিয়া।
বক্ষ মাংস যায় খসি, অস্থিগুলি উঠে ভাসি,
গলিয়াছে লক্ষিন্দর কায়া॥
অস্থিচয় প্রক্ষালিয়া, ভোরাখানা ভাসাইয়া,
যায় ঊষা উজান বহিয়া॥
পদ্মবতীর শ্রী চরণ, শিরে করিয়া বন্ধন,
গেল বিপ্র জানকী রচিয়া॥

দিশা বনে কান্দে রে কোকিল পাখি;
মধুর রাম না বলিয়ে॥

ধরিতে গলিয়া পড়ে ধরনে না যায়॥
রহিয়া রহিয়া অস্থি সকলি খসায়॥
যত্ন করি পাখালিল বত্রিশ পাঞ্জর (৩)।
পড়িল হাটুর ঘিলা সমুদ্র ভিতর॥
রাঘব বোয়াল (৪) এক মৃতা গন্ধে (৫) ধেয়ে।
গিলিল হাটুর ঘিলা সম্মুখেতে পেয়ে॥
আনিল বান্ধিয়া অস্থি পরম যতনে।
লম্প দিয়া পড়িলেক নেতার চরণে॥
প্রসন্ন বদনে নেতা জিজ্ঞাসে তখনে।
কাহার কুমারী পায় .....

নয়ন কটাক্ষে চায়, প্রাণ কাড়িয়া নিয়ে যায়,
অপরূপ মদন তরঙ্গ॥
খঞ্জন গমন গতি, চলিতে শোভিত অতি,

www.pathagar.com

ঘন ঘন আঙ্গুলি হেলায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে, অতি সুললিত বেশে,
রুনু ঝুনু মন্দিরা বাজায়॥
সুললিত গীত গায়, সংযোগেতে তান বায়,
ময়ুরে পেখম তাহে ধরে।
সুরমুনি আদি যত, সব হৈলা বিমোহিত,
কামবানে দহিল শরীরে॥
কুকিলা জিনিয়া রব, নিত্য করে অসম্ভব,
ক্ষীণ কটি সদায় হেলায়।
অপরূপ নিত্য করি, মহিলেন (১) ত্রিপুরারি (২),
পন্ডিত জানকীনাথে গায়॥

মহাদেবের নিকট ঊষার বর প্রাপ্তি। দেব
সভায় পদ্মাবতীকে আনায়নের জন্য
মহাদেব কর্তৃক নন্দি নারদ
মুনিকে প্রেরণ। মনসারণ
সহিত নারদ মুণির
কথোপকথন।

দিশা দেব সবার মাঝে রে,
আরে রাজ সভার মাঝে রে,
আরে নিত্য করে বিপুলা সুন্দরী।
অলক্ষীতে করে গতি শূন্যে করে ভর।
মধু লোভে মত্ত যেন গুঞ্জরে ভ্রমর॥
নাটুয়া খঞ্জন যেন নয়ন ভঙ্গিমা।
দিপ্তি পায় মুখ যেন সারদ চন্দ্রিমা॥

শব্দার্থ : ১। মুগ্ধ করিলে। ২। মহাদেবকে।

দেখিয়া ঊষার নিত্য যত দেবগণ।
ধন্য ধন্য বলি করে পুষ্প বরিষন॥
দেখিলাম ভাল নিত্য অনেক দিবসে।
সভাসদ একযোগে ঊষারে প্রশংসে॥

পারিজাত মালা দিয়া বলে ত্রিলোচন (৩),
অভিলাষে বর মাগ আমার সদন॥
হরের বচন শুনি সায়ের কুমারী।
প্রণাম করিয়া কহে জোড় হাত করি॥

বিদ্যাধরী জাতি আমি ঊষা নাম ধরী।
অনিরুদ্ধ পতি মোর শোন ত্রিপুরারি॥

www.pathagar.com

পূর্বে নিত্য করি মোরা ইন্দ্রের সভায়।
কপটেতে তাল ভঙ্গ করে মনসায়॥
সেই দোষে দোহা কারে শাপে পুরন্দর।
মৃত্যুলোকে থাকিবারে দ্বাদশ বৎসর॥
জাতিতে বণিক্য সায়ে রাজা নাম ধরে।
জনম হৈল মোর তাহার বাসরে॥
চন্দ্রধর নামে সাধু চম্পক নগর।
অনিরুদ্ধ জন্মিলেন নামে লক্ষীন্দর॥
মম সনে হৈল বিয়া লক্ষীন্দর পতি।
আমার স্বামীরে দাগে দংশে কালরাত্রি॥
মনসার সনে বাদ সাধে চন্দ্রধরে।
তে কারণে প্রভু মোর দংশে কলেবরে (৪)॥
প্রাণ পতি জীয়াইয়া দেও দিগম্বর।
তোমার প্রাসাদে যাব চম্পক নগর॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে বলে পঞ্চাননে (৫)।
সর্ব দেব আসিলেন পদ্মা নাই কেনে॥
এই বলে ক্রোধ করি কহে মৃত্যুঞ্জয়।
পদ্মাবতী সভাস্থলে না কি বিষয়॥
শংকরে বলয়ে নন্দি শোনহ বচন।
ডাক দিয়া আন পদ্মা যাও এই ক্ষণ॥
মাথায়ে বন্দিয়া নন্দি হরের বচন॥
মনসার পুরে গিয়া দিল দরশন॥

শব্দার্থ : ৩। মহাদেব। ৪। শরীরে। ৫। শিব।

নন্দি বলে বিষহরি করহ গমন।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছে (১) দেবত্রি লোচন॥
সমর্ম জানিয়া পদ্মা বিশেষ প্রকারে।
নন্দিরে প্রবোধ দিল রচনা উত্তরে॥
কহিও বাপের পদে মোর নমস্কার।
আজি না পরিব আমি তথা যাইবার॥
নিশি সুপ্রভাতে গিয়া দেখিব বাপেরে।
আজি বাপে কষ্ট যেন না দেয় আমারে॥
দ্বিতীয় শংকর নন্দি সর্বলোকে জানে।
আসিবারে পদ্মাবতী পুনঃ পুনঃ ভানে (২)॥
তথাপিও পদ্মাবতী না তুলিল মাথা।
অসন্তোষে গেলা নন্দি মহাদেব যেথা॥
কহিলা সকল কথা শংকরের স্থানে।
না আসিলা পদ্মাবতী আমার বচনে॥

www.pathagar.com

শীবে বলে নারদ আপনি যাও তথা।
তুমি বৈ পদ্মাবতী না আসিবে হেথা॥
বলিও পদ্মারে যত খন্ডাইব (৩) দোষ।
তবু না আসিলে হবে মম অসন্তোষ।
শীবের বচনে মুণি চলিল সত্বর।
অবিলম্বে গেলা মুনি পদ্মার গোচর॥
নারদ দেখিয়া গদ গদ স্বরে।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে॥
মুণি বলে পদ্মাবতী চল শীঘ্র করে।
সভাতে যাইতে পুনঃ পাঠালেন হরে॥
কেন তুমি পিতৃ আজ্ঞা করহ লঙ্ঘন।
তুমি যে শীবের কন্যা নহে অন্যজন॥
শুনিয়া মনসা দেবী বলে ধীরে ধীরে।
কেন হেন বাক্য তুমি বলহ আমারে॥
কুস্বপ্ন দেখিনু আজ মন নহে ভাল।
চলি যাও মুণি বর না কর জঞ্জাল॥

শব্দার্থ : ১। ইচ্ছা করেন। ২। বলে। ৩। ক্ষমা করিব।

মুণি বলে ধীরে ধীরে উঠ বিষহরি।
শয়ন না হয় ভার হবে ভারী॥
পন্ডিত জানকীনাথ মনসার জাত।
ভাঙ্গিয়া পুরাণ শ্লোক করিলা প্রকাশ।

লাচাড়ী

পদ্মাবতী বলে পুণি, শুনহে নারদ মুণি,
এবে শিবে ডাকে কেন মোরে।
কান্দে হেম তাল নিয়া, মারে চান্দ বাড়ি দিয়া,
সেই হনে অঙ্গ ব্যথা করে॥
সেই সে ব্যথায় মোর, অঙ্গ করে থর থর,
কহি তোমা ওহে মুণিবর।
সেই সে জ্বরের তাপে, দাঁড়াইতে মাথা কাঁপে,
যাহা খাই নহে রুচিকর॥
মুণি বলে তত্ত্ব জানি, বিশল্য করনি আনি,
তাহা খাও আর্দ্রেকে (৪) বাটিয়া।
বাসক ধুতুর পাতে, যোগে বাটি দেও মাথে,
অসুখ যে যাবে ছাড়িয়া॥
ঔষধ তো আছে ভাল, কাঁচা দুধে কাঁচা জল,

www.pathagar.com

খাও তাহা প্রভাত সময়।
জ্বর যে যাইবে ছাড়ি, গুচিবে মুখের জারি (৫),
স্বাস্থ্য লাভ ঘটিবে নিশ্চয়॥
তথাপি না যায় তাপ, ঔষধ জানে তব বাপ,
তাহা দিবা দেব মহেশ্বর।
আমার বচন ধর, চল যথা দিগম্বর,
রচিলেক কবি ষষ্ঠিবর।।
নারদ মনির সহিত পদ্মার দেব সভায়
আগমন সভাস্থলে বিপুলা,
মনসা ও চন্ডির বচসা

শব্দার্থ : ৪। আদা। ৫। বিস্বাদ।

দিশা আমায় প্রেম ডোরে মান্দিয়াছে।
বংশীধারী গো নবীন কিশোরি॥
পদ্মা বলে করিতে না পারি মাথা স্থির।
কহিতে না পারি কথা ব্যথায় অস্থির॥
পদ্মারে তুলিয়া মণি দুই হাতে ধরি।
গায়ে হাত দিয়া বলে ভাস্তু বিষহরি॥
কোলে করি পদ্মারে তুলিল মনিরাজ (১)।
হাসিয়া উঠিলা পদ্মা পেয়ে মহালাজ॥
মুণি বলে পদ্মাবতী করহ গমন।
বিষম কপটী তুমি জানিনু এখন॥
যাহাতে করেছ তুমি অনুচিত কাজ।
সেই হেতু নাই গেলা দেবের সমাজ॥

থাকিতে না পারিবেন ভাবিয়া মনেতে।
রথবরে গেলা পদ্মা মুণির সহিতে॥
নাগগণ সঙ্গেতে না নিয়া পদ্মাবতী।
কেবল চলিলা নেতা পদ্মার সংহতি॥

প্রণাম করিয়া পদ্মা বাপের চরণে।
পশ্চাতে প্রণাম করে ব্রক্ষ নারায়ণে ॥
চন্ডি গঙ্গা প্রণ মিয়া মসিলা মনসা।
হাসি শংকরে কহিলা কুশল জিজ্ঞাসা॥

শিবে বলে উষা তুমি আগু বাড়ি যাও।
পুর্বাপর যত কথা পদ্মারে জানাও॥

www.pathagar.com

ঊষা বলে নিবেদন পরি পশুপতি।
উষা নাম ধরি আমি অনিরুদ্ধপতি॥
পূর্বে ইন্দ্র সভায় যাই নিত্য করিবারে।
কপটে মনসা দেবী তাল ভঙ্গ করে॥
তাল ভঙ্গ দোষে সাপ দিলা শচীপতি।
নর জন্ম লব গিয়া মর্ত্ত শীঘ্র গতি॥

উজানী নগরে সাহে রাজা মহামতি।
তাহার মহীয়শি নাম কমলা যুবতী॥
কমলা উদরে হৈল জনম আমার।
চন্দ্রধর নামে রাজা চম্পক মাজার॥
অনিরুদ্ধ হইলেন চান্দের কুমার।
লক্ষীন্দর নামে জাত গর্বে সনকার॥
কাল রাত্রি নাগে খায় মম প্রাণপতি।
এ সকল বিড়ম্বনা করে পদ্মাবতী॥
প্রাণনাথে জীয়াইয়া দেও পঞ্চানন।
তোমার প্রাসাদে যাবে চম্পক ভবন॥
হাসিয়া শংকরে কহে মাগো বিষহরি।
যত কথা কহে উষা শোন কর্ণভরি॥
এত অনুচিত কাজ তোমার কি সাজে।
কালরাত্রি নাগে খায় মন্দিরের মাঝে॥
কর জোরে পদ্মা বলে বাপের বিদিত (২)
না জানিয়া দোষ দেওয়া না হয় উচিত॥
অতি বোকা তোমার শ্বশুর বুড়া ঠেটা (৩)।
আপনার দোষে তার পক্ষ যায় কাটা॥

চন্ডি দেবী কোপিলা বাপের নিন্দা শুনি।
হাসিয়া বলেন তবে নারদ মহামণি॥
উচিত বলিতে চন্ডি রোষ কর কিসে।
দাদার সম্বন্ধে পদ্মা কহে পরিহাসে॥

আখি পাকাইয়া পদ্মা কর্কশ বচনে।
বিপুলারে মন্দ বলে সভা বিদ্যমানে॥
বৈতালিনী (৪) আসি মিথ্যা বলিল সভাতে।
বিচার করিয়া মন্দ বলিলা পশ্চাতে॥
দেব সভা মধ্যে কহে মিথ্যা কথা।
ভাঙ্গিব চুপার (৫) গর্ব মুন্ডাইব (৬) মাথা॥

www.pathagar.com

যার গর্ভে মন্দ মোরে বলিল বৈতালি (৭)।
করিব সবার বার (৮) দিয়া চুন কালি॥
কার গর্ভে গর্ভ করি কহে এত কথা।
ফ্যাক নাতি (৯) ভাঙ্গিয়া দিব মুড়াইয়া মাথা।

শব্দার্থ : ১। ঋষি নারদ।
২। নিকটে। ৩। যে একগুয়ে তর্ক করে। ৪। দুচরিত্র। ৫। গলাবাজি।
৬। মুরইন মন্ডন করাইব। ৭। চরিত্রহীন। ৮। বাহির। ৯। অতিরিক্ত আহ্লাদ।

নাক চুল কাটি তোরে পাঠাইব দেশে।
জগতের লোকে যেন তোরে দেখি হাসে॥
বানিয়া ধাঙ্গরী (১) বেটি কিসের ভরসে (২)।
সভাতে বিবাদ করে অসম সাহসে॥
চন্ডি বলে মনসা বুঝিয়া কও কথা।
তোর বাক্যে বিপুলার কে মুড়াবে মাথা॥
দুঃখ কহিলেক আসি সভা বিদ্যমানে।
মনসা অলেহ্য (৩) কথা বলে কি কারণে॥
সভা মধ্যে ন্যায় যদি হারে বিপুলা।
বুঝিয়া উচিত শাস্তি করিবে সভায়॥
আপনার গর্বে তুমি করিয়াছ বল।
সভার বিচারে তুমি পাবে প্রতিফল॥
চণ্ডী দেবী স্থায় ভরসা হইল মনে।
কহিতে লাগিল উষা ভৎসিয়া তখনি॥
শংকরের কন্যা তুমি নাম পদ্মাবর্তী।
লক্ষ দোষ হইলেও তুমি বড় সতী॥
মহতের হইলে দোষ বলা নাহি যায়।
মাস পক্ষ অন্ত হৈলে সকলি লুকায়॥
কাহার বাঁচিতে সাধ পইয়া লাঞ্চনা।
বিমাত মারী চক্ষু করিয়াছে কানা॥
স্বামীরে করিলে ত্যাগ অবাজন দেখি।
দয়ামায়া নাই কিছু বড় বিষমুখী॥
হাসাইলা দেবসভা না বলহ মোরে।
তোমারে জানেন ভাল আমার শ্বশুরে।।
স্থানভ্রস্ট করি মোরে নিয়া পৃথিবীতে।
হয় কি উচিত মোরে এত দুঃখ দিতে॥
ক্ষমা কর বিষহরি আমি বড় দোষি।
গোপনে আছিল কথা কইতে লজ্জাবাসী॥
সবার সক্ষাতে পদ্মা নিন্দাবানী শুনি।

www.pathagar.com

থর থর কাপে অঙ্গ চক্ষে পড়ে পানি॥
চন্ডি বলে পদ্মাবতী কেন কান্দ আর।
জীয়াইয়া দেও ঝাটে (৪) চাঁন্দের কুমার॥

শব্দার্থ : ১। বোনের ষট। ২। ভরসায়, জোরে। ৩। অন্যায় করে।
৪। শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

ক্রোধ করি পদ্মাবতী বলিলা চন্ডিরে।
বিপুলার পক্ষ নিয়া এত বল মোরে॥
গর্ব করি কহ কথা আমি কি ডরাই।
বাপের সাক্ষাতে আজি ভাঙ্গিল বড়াই॥

চন্ডি বলে না সহিয়া কি করিতে পার।
না জীয়ায়ে লক্ষন্দর কি প্রকাশে সারা॥
দোহারে প্রবোধ বাক্য বলিলেন শীবে।
কলহ ছাড়হ তবে কার্য ভাল হবে॥
উভয়ে প্রমান দেও সবার সাক্ষাতে।
অবিচার বিশ্বাদ ফল কিবা তাতে॥
পদ্মা বলে সত্য সত্য প্রমাণ করহ।
গালাগালি পাছে হবে শান্ত হয়ে রহ॥
উঠিয়া নারদ মণি কহিলা তখন।
যার যে প্রমাণ সত্য দেও এইক্ষণ॥
করজোড়ে ঊষা তবে সভাতে দাঁড়ালো।
সুবর্ণ কাটারি সহ কাটা লেজ দিল।
প্রভু রে দংশিল যবে মনসার নাগে।
লেজ কাটা যায় মোর কোন পূর্ণ ভাগে॥

সবার সাক্ষাতে পদ্মা কাটালেজ দেখি।
ক্রোধে কহে সভাস্থলে ঘোর করি আখি॥
দেখ দেব পুরন্দর দেব মহেশ্বর।
সাক্ষী আনিয়াছে বান্দী (৫) সবার গোচর॥
কিবা কুচি আর (৬) লেজ কিবা গোহিলার (৭)।
কিবা টিকটিকি লেজ কিবা ইন্দুরার (৮)॥
কিবা কাকুলাশ লেজ আনে যত্ন করি।
ত্রিভুবন ভাঙ্গিয়াছে হীন বৃত্তি করি॥

শীব বলে পদ্মবতী আন নাগগন।
বিচারিয়া বুঝিনিব ইহার লক্ষণ॥

www.pathagar.com

শব্দার্থ : ৫। দাসী। ৬। কুইচা, কুচে। ৭। গুইশাপে। ৮। ইঁদুর।

লাচাড়ী

পদ্মা বলে শিব আগে, কি জন্য আনিব নাগে,
বাড়িয়া আছে যে শতে শতে।
কোন নাগ জন্ম কাটা, কেহ আছে জন্ম টুটা,
ইহারে চিনি বা কোন মতে॥
শিব আজ্ঞা অনুসারে, নাগ আইলা হাহাকারে,
বেড়িয়া রহিল মনসারে।
নাগ দেখি পক্ষীরাজে, ভিষণ তর গরজে,
ভয়ে নাগ যায় দিগন্তরে॥
নাগগণ যায় ত্রাসে, দেখিয়া সভায় হাসে,
রহ রহ বলে দেবগণ।
প্রাণ ভয়ে লড়ে চায়, উল্টিয়া নাহি চায়,
পন্ডিত জানকীনাথে ভণে॥

চিত্রগুপ্তের নিকট হইতে লক্ষীন্দরের
মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ।
দিশা মধুর রাম নামের বাতাসে রে,
কত জীব তৈরে যে গেল॥
পুনর্বার বলে শিবে শোন পদ্মাবতী।
কোথা গেল নাগ তব শীঘ্র গতি॥
পদ্মাবতী বলে বাবা না কহ উচিত।
এসেছিল নাগগণ তোমার বিধিত॥
প্রাণ লয়ে গেল তার গরুড়ের ডরে।
কোথা গিয়া বিচারিব খালে বনে ঝাড়ে॥
পদ্মাবতী জিনে ন্যায় বিপুলার হারে।
নেতা দেবী অন্য পথ চিন্তিলা অন্তরে॥
ইঙ্গিতে কহিলা নেতা বিপুলার স্থানে।
এ সকল বিবরণ চিত্র গুপ্তে জানে॥
পুনরায় চিত্র গুপ্তে সাক্ষী মান্য কর।
তাহার কারণে প্রাণ পাবে লক্ষীন্দর॥

উষা বলে নাগ যদি না আনিতে পার।
আর সাক্ষি জ্ঞানাইব সবার গোচর॥
ধম্মরাজ চিত্র গুপ্ত ধম্ম অবতার।
সংসারে জন্ম মৃত্যু বিধিত তাহার॥
অগোচর কিছু তাহার নাই ত্রিভুবনে।

www.pathagar.com

প্রভু মোর নাগে খায় চিত্র গুপ্তে জানে॥

পদ্মাবতী বলে বেটি হারিয়া না হারে।
এক সাক্ষী এড়ি পুনঃ অন্য সাক্ষী ধরে॥

পশুপতী বলে মাগো কহিনু তোমারে।
জিজ্ঞাসা করিতে কি ক্ষতি আছে তাহারে॥

কহ কহ চিত্র গুপ্ত কহ সমাচার।
কিরুপে হইল মৃত্যু চান্দের কুমার॥

এত শুনি চিত্র গুপ্ত পূর্বাপর হতে।
পুস্তক বিচার করি লাগিল দেখিতে॥
পৃথিবীর ছয় দ্বীপ রাখিয়া একাধারে।
জম্বু দ্বীপ বিচারিয়া দেখ তার পরে॥
চম্পক নগরে সাধু নামে চন্দ্রধর।
লক্ষীন্দর পুত্র তার পরম সুন্দর॥

বিবাহের তৃতীয় রাত মহানিশা ভাগে।
লোহার মন্দির মাঝে খায় কালি নাগে॥
এই মতে চিত্র গুপ্ত প্রমাণ করিল।
মনসা হারিলা ন্যয়ে বিপুলা চিনিল॥
দেবগণ সকলে নিন্দিলা মনসারে।
মিথ্যা তর্ক করে পদ্মা সভার ভিতরে॥
প্রাণ সম দেখি মাগো ক্ষমিনু তোমারে।
অনিরুদ্ধ জীয়ইয়া দেওত উসারে॥

পদ্মা বলে বাবা তুমি আমারে।
অপমান যত কৈল চান্দ সওদাগরে॥
বাউড়ি বৈতালি ডাকে কানি নাম ধরে।
কহিতে চান্দের কথা হৃদয় বিদারে॥
কদাচ চান্দের পুত্র না জিয়াব আমি।
শিখাব চান্দেরে বাবা ক্ষমা কর তুমি॥

নেতা বলে জোড় হাতে বিনয় করিয়া।
সুন্দরী উষার পতি দেও জীয়াইয়া॥
পদ্মা বলে নেতা তুমি না বলিও আর।
মারিলে বাঁচাব পুনঃ নাহি ব্যবহার॥
পন্ডিত জানকীনাথ মনসার দাস।

www.pathagar.com

অপূর্ব পুরাণ শ্লোক করিল প্রকাশ।

লাচাড়ী

পদ্মাবতী মন দুঃখ প্রকাশ (বারমাসি)
ধূয়া আমি না জীয়াব চান্দের নন্দন গো।
ও পাত্র নেতা-
বল বোন সুন্দরী দেশে জাউকা।
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি, তারে বলে বনমালী,
তারাবতী কান্দিলা বিস্তর।
তারে নি জীয়ায়ে দিলা রাম বঘুবর গো॥
লঙ্কাপতি দশানন, বধে কমল লোচন,
মন্দ ধরি কান্দিয়া কাতর।
তারেনি জীয়ায়ে দিলা রাম গদাধর গো॥
জৈষ্ঠ্য মাসে জালু ঘরে, ভক্তিভাবে পুজো মোরে,
ভক্তিতে লয় সনকা পুরে।
নানা মতে গালি পাড়ে মোরে চন্দ্র ধরে গো॥
আষাঢ়ে পঞ্চমী তিথি, সবে পুজো হৃষ্টমতি,
চান্দে ঘট ভাঙ্গি করে দুর।
মোর প্রতি কেন এত নির্দয় নিঠুর গো।
শ্রাবণে নতুন পানি, নাগগনের উজানি,
চন্দের কি করে অপচয়।
মোর নাগগণে মারি করে অপচয়গো॥
ভাদ্র মাসে চান্দপুরী, পুজে সানকা সুন্দরী,
চান্দে মোরে হেম তালে মারে।
সেই হনে আমার কাকালী ব্যর্থ করে গো॥
আশ্বিনে ত্রিদেশে পূজা, সবে পুজে চান্দ রাজা,
আমারে না দেয় পুস্প পানি।
আর গালি পারে, মোরে লঘু জাতি কানিগো॥
কার্তিতে চান্দের বাড়ি, ভাগ পুড়ি কোপ করি,
মহা জ্ঞানে জীয়ায় বাগান।
এ দুঃখেতে আমার পুড়য়ে পরাণ গো॥
অগ্রাহয়নেতে সাধরে, সনকায়ে পুজে মোরে,
বেয়াইন বলে ধরে হাতে।
মোর কন্যা বিয়া করে তার কোন সুতে গো॥
পৌষে আজ্ঞা দিলা বাপে, ছয়পুত্র খাই কোপে,
বাগোয়ান কাটি আর বার॥
চান্দে মোরে গালি পাড়ে পিত্তি ভাতদার গো॥

www.pathagar.com

মাগেতে সানকা মোরে, যথা বিধি পুজা করে,
কনকা বলিয়া মোরে ধরে।
পরিহাস চলে চান্দে দুঃখ দেয় মোরে গো॥
ফাগুনে ত্রিদেশে পুজা, সবে পুজে চান্দ রাজা,
সনকা কয় মেরে পুজিবারে।
ধাগুড়ি ধামে না ভাতারি গালি দেয় মোরে গো॥
চৈত্রে পেয়ে বায়ু বল, চৌদ্দ ডিঙ্গা করি তল,
তারে নাহি মারিনু প্রাণেতো॥
মোরে ঘৃণায় কাবুলা পেলে পদ্মা পাতে গো,
বৈশাখ মাসেতে আরে, বিয়া করে লক্ষীন্দরে,
যত ইতি গালি পারে মোরে।
মনে দুঃখে দংশি আমি ভণে ষষ্টিবরে গো॥
শ্রী হট্টের দত্ত গ্রাম, হয় ষষ্টিবর ধাম।
মাতৃদেবী অতি পূন্যশীলা॥
তার গর্বে জন্মীয়, পদ্মা পুরান বিরচিয়া,
দত্ত বংশ কীর্ত্তি প্রকাশিলা।
দত্ত বংশ উজ্জ্বল করিলা গো॥

পর লাচাড়ী

বিপুলার দুঃখ কাহিনী (ছয় মাসি)
ধূয়া শোন ওগো পদ্মা মা গো, মহাদেবের ঝি মোর মনে হেন লয়, শীতল জল পি।
ওগো মনসা মাগো॥
বৈশাখ মাসেতে এল চম্পক নগরে।
মোর প্রভু নাগে খায়, লোহার বাসরে॥
রাম কলা কাটি সাধু ভোরা বানাইলা॥
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই ফিরে না চাহিলা।

জৈষ্ঠ্য মাসেতে আইলো সাগরের তীরে।
দারুণ প্রখর রোদ্রে, বজ্র হেন পোড়ে॥
প্রভুর বিচ্ছেদে মাগো চক্ষে পড়ে পানি॥
শুকনা কাষ্ঠেতে যেন জলন্ত আগুনি।
আষাঢ় মাসেতে মাগো ঘন বৃষ্টি হৈল।
মশকে সর্বাঙ্গ মোর চুষিয়া খাইল।
তৃতীয়া ভিজিয় মাগো থাকি উপবাস।
জলেতে ভাসিয়া ফিরি সারা আষাঢ় মাস॥

শ্রাবণ মাসেতে মাগো ভাসি একাকিনী।
প্রভুরে খাইতে আসে বনের বাঘিনী॥

www.pathagar.com

আমার বিপদে মাগো দয়া হৈল তার।
ভাগ্যে বাঘে চারী দিল পাইয়া সদাচার॥

ভার্দ্র মাসেতে আইলো নেতার গোচর।
ধোপানীর বেশ ধরি পাখালে কাপড়॥
শীতে বাতে কস্ট পাই তাহার গোচর।
নিবেদিয়া পায়ে পড়ি জীয়াও প্রভু মোরা॥

আশ্বিন মাসেতে এলাম দেবের ভবন।
নিত্য গীতে মহিলাম যত দেবগণ।
যদি মোর প্রাণ নাথে দেও জীয়ায়ে॥
সত্য ভ্রষ্ট হইলাম নর জাতি হয়ে॥

বাদ এড়ি ভক্তি ভাবে পুজি শ্বশুরে।
হইবে তোমার পূজা চম্পক নগরে॥
জীয়াইযা দেও মাগো মোর প্রাণ পতি।
ষষ্ঠি বর কবি মাথে পদ্মাতে ভক্তি॥

লক্ষীন্দরকে জীয়াইতে ঘিলা চাকি না
পাইয়া বিপুলার ক্রন্দন শ্বস্তি।
দিশা ওমা মনসা বন্দি, তোমার চরণ কমল গো।
নেতা বলে বিপুলা গো মোর বাক্য ধর।
আপনা কল্যাণেতে মনসা পায়ে পড়॥
উপদেশ নিয়া তবে শায়ের কুমারী।
করিল অনেক চরণেতে ধরি॥
বিবাদ করিলা যত আমার শ্বশুরে।
তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছ আমারে॥
তোমার সহিত মাগো আর নাহি বাদ।
এত দুঃখ দিয়া নাকি মিটিল না সাধ॥
বাদ বিস্বাদ যত খণ্ডিল এখন।
শ্বশুরে পূজিবা মগো তোমার চরণ॥
কহিলা অনেক কথা করিয়া প্রণতি।
শুনিয়া সদয় হইলা দেবী পদ্মাবতী॥
আনগো বিপুলা তব মরা লক্ষীন্দর।
এখানে জিয়ায়ে দিব সবার গোচর॥
পদ্মার বচন শুনি সন্দরী বিপুলা।
অগৌনে আনিয়াদিল অস্থির পুটলা॥
স্থানে বিচারিয়া রাখিলা ভূমিতে।
বিপুলারে বলে দেবা সবার বিদিতে॥

www.pathagar.com

অস্থি সব আনিয়াছে ঘিলা চাকি নাই।
শীঘ্র করি আন উষা আছে কোন ঠাই॥

প্রণাম করিয়া বলে সায়ের নন্দিনী।
গিলা চাকী কোথা গেল আমি নাহি জানি।
ক্রোধ বসে বলে সভা সহযোগে
ইহা কি বলিবে বেটা খাইছে মোর নাগে।
আমারে অমান্য কর মনে করি হেলা।
দেব সভা মধ্যে বুঝি হারাইলা ঘিলা॥
ভাঙ্গর বাগের বাক্য টুটি গেল বুঝি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ বৃক্ষেতে আজি॥
বিষানলে ত্রিভুবনে করিব বিনাশ।
মনুষ্য হৈয়া মোরে করে উপহাস॥
এই ক্ষণ পারি তোর ভাঙ্গিতে বড়াই।
সত্য ভঙ্গ হবে বলি মনে ভয় পাই॥

শিবের ইঙ্গিতে তুমি দপভাব মনে।
না জীয়াব তোর পতি যাও এথা হনে॥
পরিহাস কর মোরে অশুভের চিহ্ন।
চলিতে নারিবে জীবে তবু পদ ভিন্ন॥
পদহীন করি তারে জীয়াইতে পারি।
জীবন পাইবে কিন্তু চলা হবে ভারি॥
পদ্মার বচনের কন্যা চিন্তে মনে মন।
কান্দিতে লাগিল উষ ধরিয়া চরণ॥

লাচাড়ী

পদ্মার চরণ ধরি, কান্দে কন্যা বিদ্যাধরী,
পতি দান দেহ দুঃখিনীরে।
আমি অতি দান অল্প মতি, না জানি তোমার স্তুতি,
কৃপাকর আমি অধিনীরে॥
অযোনিসম্ভাবা তুমি, আমি তা কহিব কত,
এয়াতে ভুলাও ত্রিপুরারী।
তোমার স্তুতি শুনি, সন্তোষ হৈলা পদ্মিণী,
জানকীয়ে রচিল লাচাড়ী।

ঘিলাচাকির উদ্ধার ও পদ্মাবতীর লক্ষীন্দর
জীয়ানের উদ্যোগে এবং আরুড়ি মন্ত্রে
লক্ষীন্দরের প্রাণদান ও ধনজন
সহ চৌদ্দ ডিঙ্গা লাভ।

www.pathagar.com

দিশা বন্দি শংকর নন্দিনী গো,
জয় জয় মনসা হো বন্দি।

পদতলে পড়ি উষা করিছে মিনতি।
তাহা দেখি মনসার দুঃখ লাগে অতি॥
শিব বলে পদ্মাবতী বহু তত্ত্ব জানে।
কী হইল ঘিলাচাকি রাঘবে গিলিতে॥
শিবে বলে যাও নেতা রাঘবের স্থানে।
ঘিলাচাকি আন গিয়া ত্বরিত গমনে॥

শিবের আজ্ঞায় নেতা চলিল তখন।
সত্বরে মিলিলা গিয়া ত্রিবেণী মোহন॥
রাঘব রাঘব বলি দিলা তিন ডাক।
শুনিল রাঘবে থাকি ত্রিবেণির বাঁক॥
লক্ষ্মীন্দর ঘিলাচাকী আছে তোর ঠাঁই।
আনিয়া না দেহ যদি শিবের দোহাই॥
দনিয়া রাঘব মৎস্য ভাবিল হৃদয়।

পূর্বে বলিয়াছে নেতা না দিলে সংশয়॥
ঘিলাচাকি দিতে তথা রাঘব আসিল।
সাগরের জল মধ্যে হিল্লোল উঠিলা॥
আসিয়া রাঘব মৎস্য ত্রিবেণির ঘাটে।
উগাড়িয়া দিল ঘিলাতটের নিকটে॥
তথা নহে নেতা দেবী ঘিলাচাকি লইয়া।
তড়িত গমনে গেল হরষিত হইয়া॥
আনিয়া দিলেন ঘিলা পদ্মায় গোচরে।
জীয়াইতে লখাই পদ্মা হরষ অন্তরা॥
ঘিলাচাকি লইয়া পদ্মা আনন্দিত মনে।
লখাইর হাঁটুতে ঘিলা স্থাপিলা তখনে॥
পৃথিবীর মাটি দিয়া শরীর গঠিলা।
অস্থি চর্ম্ম মাংস তবে একত্র করিলা॥
কহিতে লাগিলা পদ্মা বিপুলার স্থানে।
সত্য যদি কর তবে দেই প্রাণদান।

লাচাড়ী

কর জোড়ে উষা কহে, সভার গোচরে,
কহিনু শ্বশুরে সত্য, পূজিবা তোমারে॥
পদ্মা বলে তবে আমি, বাঁচাব তাহারে।
লক্ষ বলি দিয়া যদি, পূজে চন্দ্রধরে॥
প্রত্যয় না করি আমি, পূজবে আমারে।

www.pathagar.com

বাহুড়ি আসিবে হেথা, না যাইবে ঘরে।
প্রথমে আমার দুঃখ শুন গো সুন্দরী।
জলপূর্ণ ঘট নিল, সানকায়ে পুরী॥
পূজার কারণে আমি, নিজ মূর্ত্তি ধরি।
পাছে থেকে চান্দে মারে, হেমতালে বাড়ি॥
পদ্মা বলে শোন উষা, দুঃখের কাহিনী।
বাম হাতে নাহি চায়, দিতে পুষ্প পাতি।
তোমার শ্বশুরে কন্যা, কথা নাহি বুঝে।
নগরে তর্জন করে, কেহ নাহি পূজে॥
বেহুলা বলে মা শুন, আমার উত্তর
অবশ্য পূজিবে মাগো, চন্দন ঈশ্বর॥
যদি মাগো নাহি পূজে, তোমা একমনে।
ফিরিয়া আসিব আমি, নারব সেখানে॥
রচিল জানকীনাথ, মনসা চরণ।
পুজার কারণে সহ, এত বিড়ম্বন॥

দিশা তুমি প্রেম ডোরে বেন্দেছ,
বংশিধারী গো রাই রঙ্গিনী।
তবে পদ্মাবতী কহে সভার গোচর।
গঙ্গে করি নিয়া যাবে চম্পক নগর॥
একলক্ষ বলি মোরে দিবে সদাগরে।
স্থির করি কহ কন্যা সভার গোচরে॥
দেবগণ বলে ঊষা হৈল প্রতিকার।
পদ্মারে পূজিবে বলে করে অঙ্গীকার॥
কায়মনো বাক্যে উষা অঙ্গীকার করে।
সত্য সত্য সত্য মোর পূজিবা শ্বশুরে॥
নেতারে বলিলা তবে আস্তিক জননী।
যোগাও আনিয়া সপ্ত সমুদ্রের পানি॥
পাইয়া পদ্মার আজ্ঞা নেতা গেলা সুখে।
সপ্ত সমুদ্রের পানি আনিলা কৌতুকে॥
দ্বিতীয়ে মনসা বলে শোন ভগ্নী নেতা।
ভাঙ্গিয়া উপরের জল আন পাও যথা॥
কাল ধুতুরারে আন সমুলে তুলিয়া
যত ইতি দ্রব্য লাগে দিলেন আনিয়া॥
নেহারি সকল বস্তু সাক্ষাতে পাইয়া।
কেশ মুকুলিয়া বস্ত্র পরিলা কাছিয়া॥
মশারি ভিতরে রাখি মরা লক্ষন্দর।
পদ্মা গিয়া প্রবেশিলা তাহার ভিতর।

www.pathagar.com

লাচাড়ী

লক্ষীন্দর বর্ণ যেন, উত্তপ্ত সুবর্ণ
বিষ তেজে গেল শুকাইয়া।
বিপুলা উঠায়ে ধরে, যন্ত্র কহি পদ্মারে,
মন্ত্র পাঠে একমন হৈয়া॥
গারুড় মন্ত্র উচ্চা, যথাশক্তি অনু
শিবিরে চরন বন্দি শিরে।
কর্ণমুলে মন্ত্র পড়ে, অস্থি ......দেবগণে পুস্প......

১২. রামায়ণ গান

আদিকবি বাল্মীকিরচিত রামায়ণ পৃথিবীর প্রাচীন শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অন্যতম। এটি আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্যও বটে। পৃথিবীর সকল হিন্দু সম্প্রদায় রামায়ণকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করেন। রামায়ণের সাতটি খণ্ড। তাই একে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বলে।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজা দশরথের ঘরে জন্ম নেন। নারায়ণ চারভাগে ভাগ হন চার ভাই রূপে। রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে যান স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে। লংকার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে। সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীব, হনুমান...অসংখ্য বানরসৈন্য নিয়ে রাম লংকা আক্রমণ করেন। প্রায় এক বছর যুদ্ধ চলে। রাবনের একলক্ষ পুত্র আর সোয়া লক্ষ নাতি নিধন হলে রাবণ নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং নিহত হন। রাম সীতাকে নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য পুনরায় সীতাকে বনবাস দেয়া হয় এবং তার গর্ভের সন্তান লব ও কুশের হাতে রামেরা চার ভাই পরাজিত হন। তখন রাম সীতাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সীতা পৃথিবীকে বলেন, "ধরিত্রী দ্বিধা হও, আমাকে ঠাঁই দাও"। মাটি ফেটে বড় গর্ত হয় তার মধ্যে সীতা ঝাঁপিয়ে পরে আত্মবিসর্জন দেন।

রামায়ণের এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে রামায়ণ গান রচিত হয়। একজন গায়ক উঠে দাঁড়িয়ে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গান করেন এবং দোহাররা পিছনে সুর তোলেন। এই গানে হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল, চাকি (করতাল), বাঁশি ও বেহালা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। শত শত শ্রোতা এই গান উপভোগ করে। বিয়োগান্তক এবং মৃত্যুর প্রসঙ্গ যখন আসে তখন প্রচুর লোক এই গানে চোখের জল ফেলেন। মেয়েরা হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকেন। অনেকগুলি পালার মধ্যে সীতার বিয়ে, শক্তিশেল বান, মহীরাবণ বধ, তরণীসেন বধ, অশ্বমেধ যোজ্ঞ প্রভৃতি প্রধান।

১৩.সাতপাল বা হালুই

পৌষ-পার্বণ উপলক্ষ্যে গ্রামের কৃষাণ কৃষাণী বালক বালিকারা মিলে পৌষের কঠিন শীতে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি যায় সাতপাল বা হালুই গাইতে। গান শুনে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মালিক তাদের হাতে তুলে দেয় কিছু ধান, চাল বা টাকা। এভাবেই মধ্যরাত

www.pathagar.com

পর্যন্ত তারা বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে যা পায় তাই দিয়ে পূজা করে বাস্তু ঠাকুরের। সাত পালের বিষয় সাধারণত ধর্মীয় আখ্যান, সামাজিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে নেয়া হয়ে থাকে।

দলে ৭/৮ জন মিলে সাতপাল গান পরিবেশন করে যারা সবাই একসাথে সামনের সারিতে থাকে। পেছনের সারিতে থাকে বাদ্যযন্ত্রীরা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে হারমোনিয়াম, ঢোল, চাকি, আড়বাঁশি। গান শুনে বাড়ির মালিক কিছু ধান দেয়।

ধান নেয়ার জন্য একজনের কাছে একটি বস্তা থাকে। আলোর জন্য থাকে হারিকেন।

শীতকালে গ্রামের লোকেরা যে ধরণের পোশাক পরে সেই পোশাক পরেই সবাই এই গান গাইতে যায়।

চিলা ইউনিয়নের হলদিবুনিয়া গ্রামে, চাঁদপাই ইউনিয়নের কালিকাবাড়ি, কাইনমারী, কানাইনগর গ্রামে এবং মংলা পৌরসভার শেলাবুনিয়া গ্রামে এই গানের প্রচলন রয়েছে। তবে হলদিবুনিয়া গ্রামের যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চেও এই গান পরিবেশন করে হলদিবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা।

নিচে কয়েকটি সাতপাল গানের বর্ণনা দেয়া হলো।

১.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোলকাতাতে ছিলেন
তাহার কন্যা স্বর্ণলতা বিধবা হইলেন
বিধবা হইয়া কন্যা বলে পিতার ঠাই
পুরুষের হয় দশ বিয়ে মেয়ের কী উপায়
সেই কথা শুনে বাবু নিকের হুকুম দিল
নিকে হবে ভাল হবে পড়ব ঢাকাই শাড়ি
বায় হেলিয়ে বাঁধব খোপা যাব শ্বশুর বাড়ি
শ্বশুর বাড়ি গেলে পরে ডাকবে খোকার মা
তিন ডাকের পর ডাক শুনব কথা বলব না
এইতো নায়েকের বাড়ি পেতে আছি থান।
ধনে বংশে বজায় থাকুক কোলে সোনার চাঁন
সারথ সুরথ যেমতো প্রকারে
মোরা করিব বাস্তের পূজা সাধ্য অনুসারে।

২.

ওগো স্বপন পুরে দেখে এলাম ফুলেরই শহর
ফুলেরই বান্ধা কোটাবাড়ি, ফুলের বন্ধা ঘর
ফুলের অপাট ফুলের কপাট আঁকা ফুলের পাখি
ফুলের দোয়েল, ফুলের কোয়েল করে ডাকাডাকি
ফুলের আলেং ফুলের পালেং ফুলের বিছানায়

www.pathagar.com

তাহার ভিতর ফুল কুমারী সুখে নিদ্রা যায়
ওঠ ওঠ ফুলকুমারী কত নিদ্রা যাও
বাড়ি আইছে বাস্তের ফকির কিছু ভিক্ষা দাও
সারত সুরত নিত্য গোষ্ঠ দিবাচরে
করিব বাস্তের পূজা শাস্ত্র অনুসারে।

৩.

ঘোষ গেল বাথানেতে যশোদা গেল ঘাটে
শুন্য গৃহ পেয়ে কৃষ্ণ সকল ননী লোটে
ননী খাইছে কেরে গোপাল ননী খাইছে কে
আমিতো খাই নাই ননী, বলাই খেয়েছে
বলাই যদি খাইতো ননী খাইতো আধো আধো
তুমিতো খেয়েছ ননী ভান্ড করি শূন্য
নন্দ রানী হাতে ছড়ি ধায় গোপলের পিছে
লম্প দিয়ে ওঠে কৃষ্ণ কদম্বেরই গাছে
ডালে ডালে ছোটে কৃষ্ণ পাতায় পাতায় পা
তাহা দেখে নন্দ রানী থরকম্প গা
নামো নামো ওরে কৃষ্ণ পাড়ে দেব ফুল
ডাল ভাঙ্গিয়া নিচেয় পড়ে মজাবা দুইকূল।

৪.

শোন সবে ভক্তি ভরে করি নিবেদন।
অভিমুন্যুর বীরত্বগাঁথা শোন দিয়ে মন॥
অর্জনপুত্র সে যে সুভদ্রা তনয়।
মাতুল কৃষ্ণ ভগবান যুদ্ধেতে দুর্জয়॥
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যবে আরম্ভ হইল।
ষোল বর্ষ বয়স তার তখন পূর্ণ হল॥
মহাতেজে যুদ্ধ করে শত্রু করে ক্ষয়।
তাহা দেখি দুর্যোধনের হলো কম্পোদয়॥
চক্রবূহ্য রচনার সিদ্ধান্ত হইল।
সপ্তরথী বেস্টন করি তারে আক্রমিল॥
অন্যায় যুদ্ধেতে মারে দ্রোনাচার্যের বানে।
মহাশোকে কাতর হয় পান্ডবও গণে॥
কাদিছে সুভদ্রা আর কান্দে পান্ডবকুল।
বনের পশুপাখি কেঁদে হইল ব্যাকুল॥
অমল বলে নিগমতত্ব জেনেছে যে জন।
দ্রোনাচার্যের বানে তাহার হবে না মরণ॥

www.pathagar.com

৫.

ধূয়া বিধি আমার কি হইল
লঙ্কাপুরে রাবনের বাঁধল যে রণ
রাবণের শক্তি শেলে পড়িল লক্ষণ॥
রণ যিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর
লক্ষনেরে কোলে করি কাঁন্দেন বিস্তর॥
কি কুখ্যানে ছাড়লাম আমি অযোধ্যা নগরী
মরল পিতা দশরথ রাজা অধিকারী
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দর
দিনের দুই প্রহরে রাবণ করল তারে চুরি॥
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষণ
কী করিব রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন।
লক্ষণ সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের নিধি
আসিয়া সাগর পারে কাল হইল বিধি॥
মোর দুখে লক্ষণ যে দুঃখি নিরন্তর
কেন যে নিষ্ঠুর হলে ওরে না দাও হে উত্তর।

৬.

রজকিনী কাপড় কাচে ফেলে সোনার পাটে
চন্ডিদাস বড়সি বায় সে বসে অপর ঘাটে
এমনি করে বার বছর তাদের কেটে যায়
বড়শিতে কি ধরে মৎস রজকিনী কয়।
তাহা শুনে চন্ডিদাস কহে ধীরে ধীরে।
এইতো প্রথম খোট দিয়াছে বার বছর পরে।

৭.

বাসর ঘরে লক্ষিন্দরে কাল সাপেতে খায়
বেহুলা কাঁদিয়া বলে ও বিধি কিবা করলে হায়
বাসর ঘরে পড়ে কাঁদে বধূ বালিকা
কান্না শুনে ছুটে আসে ও শাশুড়ি শলকা
কি হইয়াছে ওগো বধু বল তব ঠাই
বেহুলা কাঁদিয়া বলে মাগো ভেঙ্গেছে কপাল
জন্মের মত ছেড়ে গেছে তোমার দুলাল॥

৮.

ওগো বিষ্ণু প্রিয়া শুয়ে ছিল নিমার পাশাপাশি
গভীর রাতে উঠে নিমাই হইল সন্যাসী
জেগে উঠে বিষ্ণু প্রিয়া কাঁদিতে লাগিল
কান্না শুনে শচি রাণী ছুটিয়া আসিল

www.pathagar.com

বলে পুত্র কোথায় গেলি জননী ছাড়িয়া
কি দিয়ে যে বুঝাবো আমি ঘরে বিষ্ণু প্রিয়া।

৯.

অযোধ্যায় এক রাজা ছিল দশরথ তার নাম
তিনটি রাণী চারটি ছেলে বড়টির নাম রাম
পিতৃ সত্য পালন করতে রাম চলিল বন।
সঙ্গে গেল সীতা দেবী অনুজ লক্ষণ॥
পথে চলতে চলতে বেলা হইল অবসান
পঞ্চ বটি বনে কুঠির করিল নির্মাণ॥
রাবনের ভগ্নি ছিল সূর্পনখা বাড়ি
নিত্য নিত্য ঘোরাফেরা সঙ্গে নিয়ে চেড়ি।

১০.

সন্ধ্যা দিতে গিয়েছিলাম মহিকারাগারে
সন্ধ্যা দেওয়া হলো না দিদি দুই ভাইয়ের রূপে।
একটি ভাই গৌর বর্ণ আর একটি হয় কালো
দুই ভাইয়ের রূপের ছটায় ঘাট করেছে আলো।
তাদের একটি ছেলে যদি আমায় বলত মা
নারী জনম ধন্য হইত ভবে জন্ম লইতাম না।

১১.

এইতো মাসে কানাই গাঙ্গে উজায় মাছ
রাধিকা যায় জল আনিতে কানাই লাগলো পাছ
শোন শোন ওগো বন্ধু আমার কথা শোন
গাইটের টাকা খরচ করে বিয়ে করে আনো
কোথায় পাব টাকাগো রাধে কোথায় পাব মেয়ে
মেয়ে যদি না পাও কানাই কলসি বেঁধে মরো
কোথায় পাব কলসি রাধে কোথায় পাব দড়ি
তোমার কাঙ্কের কলসি গো রাধে তোমার চুলের দড়ি
তুমি হও প্রেম যমুনা রাধে তাইতে ডুবে মরি।

১২.

লোহার আটন লোহার ছাটন লোহার কাসর ঘর
সেই ঘরেতে শুয়ে আছে বেহুলা লক্ষিন্দর
কোথা হতে সর্প এসে দংশে লক্ষার পায়
ওঠো ওঠো বেহুলা সতী আমার পরাণ যায়
খড়ম হাতে বেহুলা সতি হানে সর্পের গায়
প্রাণের ভয়ে সর্প তখন পালাইয়া যায়।

www.pathagar.com

১৩.
সীতা হরণ করে রাবন চড়িলেন রথে
এমন সময় দেখা হলো জটাই পাখির সাথে
জটাই বলে ওরে রাবণ একি বিবেচনা
রাজা হয়ে করলি চুরি পরেরই অঙ্গনা
অনেক দিনের পাখী আমি ঠোঁট হয়েছে ভোতা
নইলে রাবণ ফলের মতো ছিড়তাম দশ মাথা।

১৪.
তোরা আয় আয়রে রাধা কৃষ্ণের কথা কিছু
শুনবি যদি আয়
কদম তলে বসে কৃষ্ণ বাসরি বাজায়
জল আনিবার ছলে রাধা যমুনাতে যায়
কৃষ্ণ সনে আলপনে কদমেরী তলে
তাহা দেখে কাল কুটিলে আয়ানেরে বলে
খড়গো হাতে ছুটে এলো আয়ান মহাবলী
বাঁশি ছেড়ে অশি হাতে কৃষ্ণ হলো কালী

যারা সাত পাল গান পরিবেশন করে তারা সবাই মিলে হলদিবুনিয়া গ্রামের ঘরামী বাড়িতে বাস্তু ঠাকুরের পূজা দেয়। রাতে এই পূজা হয়, পৌষ মাসের শেষ দিনে। পূজার শুরুতে নিচের গানটি সবাই মিলে গাওয়া হয়

১৪. বাস্তুকে জাগানোর গান

জাগো মাতা বসুন্ধরা
নিবেদিত তোমায়
তোমার পূজার দিন এসছে
জাগো এ সময়
তুমি মুলো তুমি ছুলো
সর্ব মূল্যধার
তুমি মাতা সর্ব শক্তি
সর্ব সারাৎ সার
তুমি ধৈর্য বসুমতি
তুমি দিবা ধ্যান
নব বিধির ভক্তির সনে
করিব অর্পণ
তোমারই মানসবনে ফুল ফুটিয়ে রয়
সেই ফুল তুলিয়া দিব মাগো তোমারই পূজায়।
পৌষ মাসেরও শেষ দিনে তোমারই পূজা হয়।

www.pathagar.com

পূজা শেষ নিম্নোক্ত ছড়াটি একজন আবৃত্তি করে শোনায়।

১.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার কপালে সিন্দুর
বনে বসে মারে ইন্দুর।

২.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার কপালে চিত
বনে বসে গায় গীত।

৩.
আর বগ আর বগ
আর বগডা নাতুর নুতুর
কামার মারে নেলো হাতুর।

৪.
আর বগ আর বগ
আর বগাডা মাচার খুঁটি
চাল চাবায় মুটি মুটি

৫.
আর বগ আর বগ
আর বগাডা হিজেল গাছে
হাগে দেলো বুড়ির ভাজা মাছে।

৬.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার নাম্বা চেনু
বনে বসে বাজায় বেনু।

৭.
আর বগ আর বগ
আর বগাডা বড়ো বোঝে
হোলের গোড়ায় টাকা গোজে।

৮.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার নাম্বা হোল
বনে বসে বাজায় ঢোল।

৯.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার নাম্বা নূর
নাপিত মারে নেলো খূর।

www.pathagar.com

১০.
আর বগ আর বগ
আর বগাডা হৈ চৈ
গোয়াল মারে খালো দই।

১১.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার নাম্বা কোচা
লাফ দিয়ে ধরে কলার মোচা।

১২.
আর বগ আর বগ
আর বগাডার পায়ে চটি
লাফ দিয়ে ধরে চুলের মুটি।

শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদ তেরি করা হয় চাল, গুড়, কলা দিয়ে। সংসারের মঙ্গল কামনায় সবাই এখানে প্রার্থনা করে। বাস্তু ঠাকুর যেন বাড়ির ভাল করে।

তথ্যসূত্র

১. মুকুন্দ মন্ডল, কানাইনগর, মংলা। ২. সুজেন হালদার, কাইনমারী। ৩. কিরণ মন্ডল, পূর্ব কাইনমারী।
২. অন্ধ গুরুদাস হাজরা, বয়সঃ ৬৩ বছর, পিতাঃ মধূসুদন হাজরা (মৃত), গ্রামঃ পরানপুর, পোস্টঃ বাবুগঞ্জ বাজার, উপজেলাঃ চিতলমারী, জেলাঃ বাগেরহাট।
৩. অন্ধ গুরুদাস হাজরা, বয়সঃ ৬৩ বছর, পিতাঃ মধূসুদন হাজরা (মৃত), গ্রামঃ পরানপুর, পোস্টঃ বাবুগঞ্জ বাজার, উপজেলাঃ চিতলমারী, জেলাঃ বাগেরহাট।
৪. বাবুল মোহান্ত, বয়সঃ ৩৪, পিতাঃ মত্যুঞ্জয় মোহান্ত, চর বড়বাড়িয়া, চিতলমারী, বাগেরহাট
৫. অন্ধ গুরুদাস হাজরা, বয়সঃ ৬৩ বছর, পিতাঃ মধূসুদন হাজরা (মৃত), গ্রামঃ পরানপুর, পোস্টঃ বাবুগঞ্জ বাজার, উপজেলাঃ চিতলমারী, জেলাঃ বাগেরহাট।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

ক. মৃদঙ্গ

মৃদঙ্গ একটি অতি প্রাচীন আনদ্ধ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র, মৃদঙ্গের অবয়ব মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত। মাটির খোলটি পৌনে দু'হাত দীর্ঘ। বাঁ দিক আয়তনে ডান দিক অপেক্ষা দ্বিগুণের বড়। মৃত্তিকা নির্মিত মৃদঙ্গ বলতে কেবল খোলকেই বুঝায়। মধ্যযুগের বর্ণনা অনুসারে মৃদঙ্গ কাঠের তৈরি ছিল। রক্তে চন্দন বা খদির কাঠ দিয়ে এই বাদ্য তৈরি হতো। অর্থাৎ শাস্ত্রে কাষ্ঠ নির্মিত মাদলকেও মৃদঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার পাখোয়াজকেও মৃদঙ্গ বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট গান কীর্তনের সঙ্গে খোল বাজিত হয়ে থাকে। মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গেও খোল বাজাবার রীতি প্রচলিত আছে।

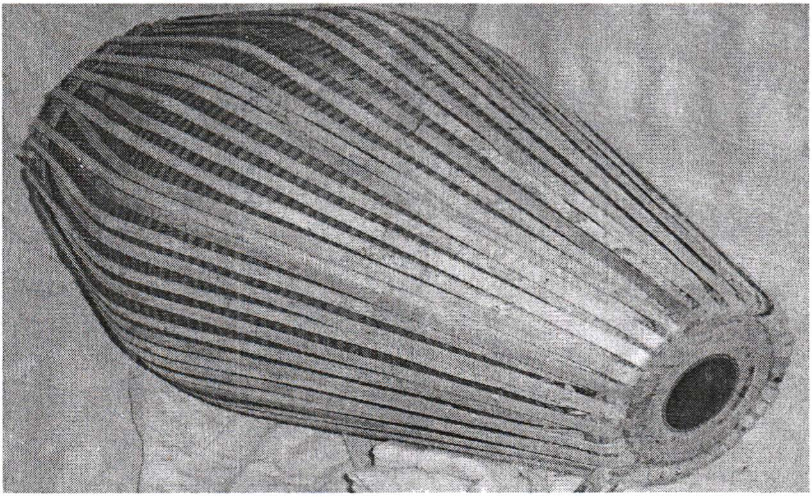

মৃদঙ্গ

খ. সারেঙ্গী

সারেঙ্গী দেখতে একটা নীরেট কাষ্ঠ খণ্ডের মতো দেখায়। আসলেও একটা নীরেট কাষ্ঠখণ্ড খোদাই করে ফাঁপা করে সারেঙ্গী তৈরি হয়। সারেঙ্গীর দৈর্ঘ্য প্রায় সাতাশ ইঞ্চি। সারেঙ্গীতে চারটি প্রধান তার ব্যবহার করা হয়।

চারটি তারই চর্ম নির্মিত। প্রধান চারটি তার ছাড়া অনুরণনযোগ্য আরো পঁয়ত্রিশটি তার আছে। উপরের তারের সংখ্যা এগারোটি। এবং বাকি তারগুলো সারেঙ্গীর বাঁ

www.pathagar.com

পাশের বয়লাতে সংযুক্ত। ডান হাতে ছড় দিয়ে সারেঙ্গী বাজাতে হয়। ছড়টি দেখতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায়।

ঘোড়ার চুলে রজন লাগিয়ে ছড় ব্যবহার করতে হয়। সারেঙ্গী এই উপমহাদেশীয় যন্ত্র। সারেঙ্গীর আওয়াজ মিষ্টি, সারেঙ্গী গজল, কাওয়ালী, টপ্‌পা, ঠুমরী, খেয়াল ইত্যাদি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

সারেঙ্গী

গ. ঢোল

ঢোল ঢাক থেকে ছোট আকারের যন্ত্র। কিন্তু ঢোলক অপেক্ষা আকারে বড়। খোলটি কাষ্ঠ নির্মিত। খোলের ভিতরটা ফাঁপা। দু'দিকে দু'টো মুখ থাকে। দু'মুখেই চামড়ার আচ্ছাদান থাকে। বাঁ দিক বাঁ হাতের করতল দ্বারা ও ডান দিক ডাক হাতে সাপের ফণার মতো ছোট ও মোটা একটি কাঠির দ্বারা ঢোল বাজানো হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও নানাবিধ উৎসবে ঢোল বাজানো হয়।

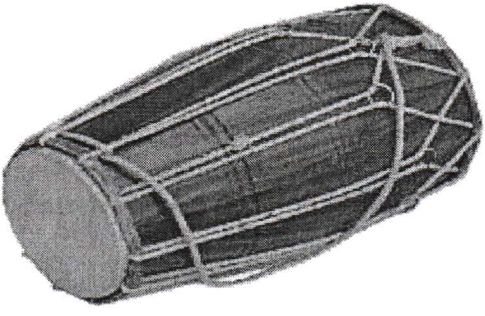

ঢোল

www.pathagar.com

ঘ. কাঁসা

কাঁসা একটি ঘন বাদ্যযন্ত্র। কাঁসা যন্ত্রটি কাঁসর নামেও পরিচিত। গোলাকার উঁচু কাঁধবিশিষ্ট ছোট থালার মতো এই যন্ত্রের নাম কাঁসর বা কাঁসি। কাঁসি কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়। এই যন্ত্রে নানারূপ ছন্দের কাজ করা যায়। প্রধানত মাঙ্গলিক ও হিন্দুদের পূজা-পার্বণে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশেও কাঁসারাদি যন্ত্র আছে। সেগুলো গং নামে পরিচিত।

ঙ. খরতাল

খরতাল লৌহ নির্মিত ঘন বাদ্যযন্ত্র। এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ দুটো পৃথক লোহার দণ্ড দিয়ে খরতাল যন্ত্র তৈরি। লোহার খণ্ড দুটো ডান হাতের মুঠিতে ধরে পরস্পরের আঘাতে বাজানো হয়। প্রয়োজনবোধে যুগপৎ দুহাতেই খরতাল বাজানো যেতে পারে।

চ. করতাল

করতাল ঘন বাদ্যযন্ত্রটি কাঁসা অথবা পিতল নির্মিত ঝাঁঝের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কাঁসার দুটো পাতের কেন্দ্রস্থলে দুটো ছিদ্রে দুটো রজ্জু করতালের পিঠের দিকে বের করে রজ্জুসহ দুহাতে দুটো মুখোমুখি আঘাত করে বাজাতে হয়। করতাল প্রধানত মৃদঙ্গের আনুষঙ্গে বাদিত হয়। কীর্তন বা ভজন গানে করতাল ব্যবহৃত হয়।

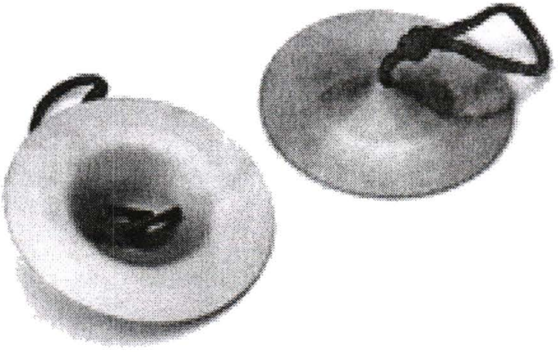

করতাল

ছ. মন্দিরা

মন্দিরা ঘন বাদ্যযন্ত্রটি কাঁসার তৈরি। আকৃতি ছোট বাটির মতো, দুটো ছোট ছোট কাঁসার তৈরি বাটিই মন্দিরা নামে পরিচিত। দুটো বাটি পরস্পরের আঘাতে বাদিত হয়। ঢোলক, মৃদঙ্গ, পাখোরাজ ও তবলা-বাঁয়ার সঙ্গে তাল দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাল, লয় ও ছন্দ নিরূপণে মন্দিরা বিশেষভাবে সহায়তা করে। মন্দিরা খঞ্জনি নামেও পরিচিত।

www.pathagar.com

জ. আড়বাঁশি

যে বাঁশির শীর্ষের গাঁট বন্ধ থাকে ও গায়ে মুখ-রন্ধ্র এবং যা আড়ভাবে ঠোঁট কিঞ্চিত বাঁকিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় তার নাম আড়বাঁশি বা মুরলি। আড়বাঁশির ফুৎকার ছিদ্রটি বাঁশির একটি প্রান্তে অবস্থিত। সেই প্রান্তের মুখ কাঠের আচ্ছাদনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। এতে ফুঁ দেয়ার জন্য একটি বিশেষ ছিদ্র এবং স্বর স্থানে ছয়টি ছিদ্র থাকে।

ঝ. একতারা

একতারাকে লোকবাদ্য যন্ত্রের মধ্যে খুবই প্রাচীন বলা যায়। একতারার সঙ্গে লাউয়ের খোলসের একটি সম্পর্ক রয়েছে। লাউয়ের খোলস ছাড়া একতারা তৈরি হতো না বলা যায়। বর্তমানে লাউয়ের খোলসের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরি হচ্ছে। অন্যতম উপকরণ চামড়া এবং নারিকেলের মালা। বাউল গানের ক্ষেত্রে একতারার ব্যবহার রয়েছে।

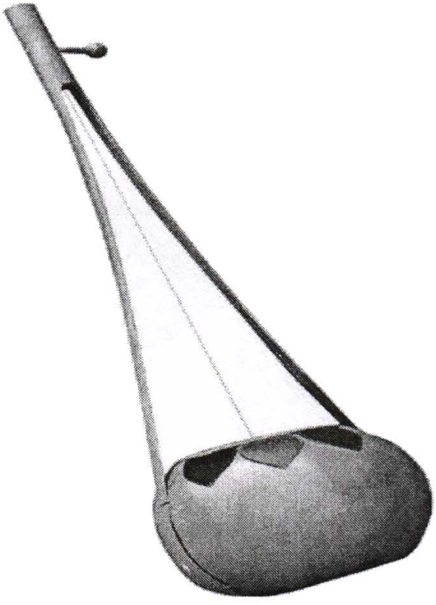

একতারা

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব

সারা বাংলাদেশের মতো দক্ষিণাঞ্চলের মানুষগুলো বছরের প্রথম দিনটাকে আনন্দঘন ভাবে পালন করে থাকেন। এই দিনে গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। সবাই মিলে সাদা শাড়ি (লাল পাড়) পড়ে তরুণী,কিশোরী,নতুন বউমেয়েরা মেলাতে ঘুরতে যান। বাগেরহাট এ শিল্পকলা চত্তরে ৭ দিনব্যাপি অনুষ্ঠান চলে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দোকান সাজিয়ে নিয়ে বসেন। মেলার দিন খুব ভোর থেকেই শুরু হয় লোকজনের আনাগোনা, সকালে পানিভাত, কাঁচা মরিচ, ইলিশমাছ খেতে ভিড় করেন স্টলগুলোতে। চড়াদামে বিক্রি করা হয় এসকল খাবারের জিনিস। সেই সাথে সাথে বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরি শুরু হয়। ভাঁপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাক্কান পিঠা,পাটি সাপটা পিঠা, চুরি পিঠা, কুলি পিঠা, পান পিঠা এছাড়া ছাঁচের বিভিন্ন নকঁশা করা পিঠা বিক্রি করা হয়। এছাড়াও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে মেহেদি পরানোর দোকান, ঢাক, তবলা বাঁশির নকশা করা ফতুয়া, জামা কসমেটিক, বিভিন্ন খেলনার দোকান সাজানো থাকে। সারাদিন ধরে চলে পহেলা বৈশাখের গান–

"এসো হে বৈশাখ, এসো এসো"-

এভাবে গান গেয়ে বরণ করে নেওয়া হয় বছরের প্রথম দিন টাকে। সন্ধ্যায় মনোরম সঙ্গীত সন্ধার আয়োজন থাকে। উল্লেখ্য যে, সঙ্গীত সন্ধ্যায় থাকে আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, গান ও নাচের অনুষ্ঠান। মোটকথা সকলেই আনন্দমুখরভাবে দিনটাকে অতিবাহিত করেন যাতে করে বছরের প্রত্যেকটা দিন যেন এমনভাবে কাটে এটা আশা করে। অনেকে সারাটা দিন খুব নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে কাটান আবার অনেকে মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করে পূজা, প্রার্থনার আয়োজন ও রাখেন। মেলার অনেকটা অংশজুড়ে থাকেন ছোট্ট বাচ্চাদের আমোদের ব্যবস্থা। নাগর দোলায় চড়া, হাওয়াই মিঠা খাওয়া, পুতুল গাড়ি কেনার আবদার সবকিছু মিলিয়ে অন্য রকম পরিবেশ। এছাড়াও থাকে বাচ্চাদের জন্য ছবি আকাঁর প্রতিযোগিতার, রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ও থাকে।

২. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। অন্যান্য এলাকার ন্যায় বাগেরহাটেও আনন্দঘন পরিবেশে এ দুটি উৎসব পালন করা হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা জাঁকজমকভাবে এ উৎসব পালন করে। উৎসবের দিনের পূর্ব থেকেই নতুন পোশাক ক্রয়ের মাধ্যমে প্রস্তুতি শুরু হয়। গরীব-ধনী প্রায় সকলেই সাধ্যমতো দামে কেনাকাটা করে থাকে। ঈদ-উল-আযহা বা কোরবানীর ঈদ উপলক্ষে

www.pathagar.com

ধনী ব্যক্তিরা বিশাল আকৃতির ষাড় কিনে রঙিন মালা পড়িয়ে বাজার থেকে বাসায় বা বাড়িতে নিয়ে আসে। এর মধ্যে ধর্মীয় চেতনার চেয়ে সামাজিক, এমন কি রাজনৈতিক লৌকিকতা বেশি পরিদৃষ্ট হয়। ঈদের দিন সকালে বিভিন্ন ঈদগাহ-এ বা মসজিদে মুসলমানরা জামায়াতে ঈদের নামাজ আদায় করে এবং নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। পরে একে অন্যের বাড়ি বা বাসায় যায় ও আপ্যায়িত হয়।

৩. শারদীয় দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। কথিত আছে, এই দিনে তাদের দেবী দূর্গা বাবার বাড়িতে দশদিনের জন্য বেড়তে আসেন। এটি শুরু হয় আসা থেকে দেবী কিসে আসছেন- এটার উপর নির্ভর করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই বছরটা কেমন যাবে তা। যদি দেবী হাতির পিঠে আসে তাহলে ফসল খুব ভাল হবে না। যদি ঘোড়ার পিঠে আসে তাহলে আয় উন্নতি ভাল হবে, আর যদি দোলনায় চেপে আসে তাহলে ফসল খুব ভাল হবে- এটাই তাদের ধারণা।

দুর্গাপূজায় সাজানো শুরু হয় সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই। বাগেরহাটের সবচেয়ে বড় পূজা মণ্ডপ হয় বাগেরহাট শহরে। তাছাড়া দশানী, হাড়িখালী কবিখোলা, মুণিগণ খেয়াঘাট আবার বাসাবটি সাহাপাড়াতে সবসাহরা মিলে নিজেরা আয়োজন করে একটি মণ্ডপের। কাড়া পাড়া ইউনিয়নের একটি মণ্ডপের আয়োজন করা হয়। যেখানে সবচেয়ে বেশি মূর্তি রাখা হয়ে থাকে। প্রতি বছর অনেক আগে থেকেই প্রচারণা চালানা হয়, যারা দেবী মূর্তি দান করতে চান তারা ওখানে দান করে থাকেন। এভাবে দানের দ্বারাই ১০টি মূর্তির সে বিশাল এক মণ্ডপ সাজানো হয়।

৪. জন্মাষ্টমী

প্রতি বৎসরই জন্মাষ্টমী তিথি আসে। নিশ্চয়ই কোন খবর নিয়ে আসে রাশিচক্র ঘুরে। সংসারে অশেষ ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মানুষ চলে। চলার পথে ক্রমে সে বুঝতে পারে যে সে কত ছোট, কত দীনহীন অকিঞ্চন। অনুভব করতে পারে তার অপ্রণতা কতখানি, কতভাবে অসহায়। এই অনুভবের সঙ্গে তার অবেচেতন মনের গোপন প্রকোষ্ঠে একটা আকুতি ভেসে ওঠে। সে তাকেই চায় যিনি মহান, যিনি পূর্ণ, যিনি সকলেরই নিকট বরণ্য, সকল নিরাশ্রমের যিনি আশ্রয় স্থল।

মানুষ তখন ভগবানকে চায়। সত্যই চায়। জগতসারে অজগতসারে আনন্দরূপকে সকলেই খোঁজে কিন্তু পায় না। কতলোকে সাধন ভজন করে থাকে, ধরতে থাকে কিন্তু পারে না। ঘুমেরঘোরে কল্পনার জোরে দাড়ার মত সে কখনও আসে, থাকে না, মিশে যায়, থাকে শুধু নিরালা।

জগতের হতাশ নরনারীর দুয়ারে জন্মাষ্টমী এক সুখবর নিয়ে আসে। ভাদ্রের এই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি অকাতরে ঘোষণা করে মানব, তুমি যাকে খুজিঁতেছ, খুঁজে পাও নাই, তিনি আজ মুক্ত, তিনি আজ তোমার কাছে এসেছেন, তুমি ধরা দাও।

www.pathagar.com

শ্রী ভগবান মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে আসেন মানুষের কাছে- ইহা অপেক্ষা বড় সংবাদ আর কিছুই হতে পারে না বলে বিশ্বাস করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। তার আগমনে জগদাতীত বস্তুর সংগে জগতের মিলন ঘটে। ইতিহাসের যে লগ্নে এমন ঘটনা ঘটে তা চিরকাল অক্ষয় ও বরণীয় হয়ে থাকে। ধ্রুবতারার মতো তাকে কেন্দ্র করে ইতিহাস গড়ে ওঠে। তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে মানব উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উঠে আসে যে, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে পাঁচ হাজার বৎসর আগে এরূপ একটি অঘটন ঘটে বর্তমান উত্তর প্রদেশের রাজধানী মথুরা নগরীতে। সুদীর্ঘকাল ধরে এই জাতি ভক্তি ও বিনম্র চিত্তে সেই ঘটনা স্মরণ করে আসছে।

সমাজের সকল অনাচার মূর্তি ধরেছিল যুবরাজ কংসের মধ্যে পুঞ্জিভূত বেদনার রূপ প্রকাশ পেয়েছিল কারা কক্ষে শৃঙ্খলিত, বুকে পাষাণ চাপা এক দশতির অশ্রু প্রবাহে। এবারে সত্যের সূর্য উদিত হইবে। অরুণ বেসেই দেবতাগণ আসিয়া গর্ববন্দনা করিয়া গাইলেন-

সত্য ব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে
সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেএং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরনং প্রপন্নাঃ

অতপর তিনি এলেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাতে অনাদারে ভাদরে অন্ধকারে কারাগারে। কেউ দেখল না, কেউ জানলওনা, কেবল দুটি প্রাণী- দেবকী ও বসুদের দেখিলেন অঙ্গ প্রভায়গৃহ আলোকিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে উভয়ে সন্ত্রস্ট। কংসগীত পিতা আদিষ্ট হয়ে নন্দনকে নন্দালয় রেখে আসিলেন।

এক শ্রেণির শক্তিশালী লোক আছে তারা নিজেকে ভগবান সমকক্ষ ভাবেন, ভাবেন তারাই জগতের রাজা। মানবের পালন ও প্রজার লালন তাদের কাজ। এটা তাদের ছলনা মাত্র। আসলে তারা পালনের আবরণে পীড়নকারী। পোষণ অজুহাতে লুণ্ঠন করে। এনামোর নামে অন্ধকার নিয়ে মানব সমাজকে তমাছন্ন করে ঐ সকল নৃপ-ব্যাজগণ। যখন রজঃ তমোগুণের চেনা-চামুণ্ডার সহিত বলছণ্ড হয়ে ওঠে তখন মেদিনী কোলাহলাছন্ন হয়ে ওঠে। ব্যথার ভারে ধরণী কাঁদে। সেই দুর্বিসহ বেদনা ঘুচাতে ভগবান আসেন, কংস এমন প্রকৃতির রাজা। দেবকী মাতার ছয়টি পুত্রকে বধ করেছেন। ইন্দ্রিয় মনের মঙ্গল মুমী বৃত্তিগুলো গলা টিপ মেরেছে ভোগ বিগ্রহ কংসের যথেচ্ছাচারী বাহুবল কিন্তু যা মঙ্গল যা শিব তা কোন কালেও মরে না। সাময়িক আঘাতে মৃতকল্প হলেও আসলে সে মৃত নয়।

কেউই জানিল না। চারদিকে সশস্ত্র প্রহরী। খুবই সতর্কতার সাথে কংস নিজে প্রতিমূহুর্তে সংবাদ নিচ্ছেন। তবু সকলের অজ্ঞাতে ঘটনা ঘটল। কংস ও তার সংগীরা ঘুমিয়ে পড়ে, এমন ঘুম যে নিজেরাও জানে না। কংসের কারাকক্ষে পুঞ্জিভূত বেদনার কুক্ষিতে কৃষ্ণ এলেন। নন্দ আর নন্দ গোকুলের নর-নারী পেল অমৃত। কংস আর কংসের অনুচর পেল মৃত্যু।

www.pathagar.com

এভাবেই ধরণীমাতার দুঃখ ঘোচাতে পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আর্বিভার। সনাতর ধর্মাবলম্বীরা জগৎকে পাপ মুক্ত করতে যুগে যুগে কৃষ্ণকে আহবান করেন এবং এই দিনেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাই এই দিনের মহাত্মতা অপরিসীম। অতুলনীয় শ্রদ্ধাভরা অঞ্জলীর নিয়ে তারা অপেক্ষা করে।

৫. দোল উৎসব

কচুয়া উপজেলায় একটা বিরাট অংশ হিন্দু এলাকা। দোল উৎসব হিন্দুদের একটি জনপ্রিয় উৎসব। এতে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে সবাই সব দুঃখ কষ্ট ভুলে রঙে রঙে রঙ্গিন করে তোলে সবাই। পূজোঁ শেষ করে প্রথমে ঠাকুরের পাশে রঙ স্পর্শ করে তারপর বাড়ির গুরুজনের পাশে রঙ স্পর্শ করে আশির্বাদ নেয় এর পর শুরু হয় রঙ খেলা। বন্ধু-বান্ধবী আত্মীয় স্বজন সকলে এক অন্যর মুখে রং মাখিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়। রং মাখামাখির পাশাপাশি মিষ্টি, নাড়ু বিতরণ, প্রসাদ বিতরণ অন্যতম। দোল পূজার দিনে হিন্দু বাড়িগুলোকে দেখে মনে হবে বাড়িগুলো যেন রং মেখে সেজেছে। মূলত মনের সব গ্লানী, ক্লেশ ধুয়ে মুছে সুখের আনন্দের রঙে নতুন করে নিজেকে রাঙ্গানোটাই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

৬. অম্বুবাচী

বাগেরহাট জেলার চিতলমারি উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি বিশেষ লোকোউৎসব। আষাঢ় মাসের সপ্তম দিনের মধ্যাহ্ন (সাড়ে সাত দিন) থেকে থেকে তিন দিন এটি পালিত হয়। এ সময় হিন্দু নারীরা নানা ধরণের ক্রিয়াচার পালন করে। তাদের বিশ্বাস, এ তিন দিন আকাশ ও পৃথিবীর মিলন হয় এবং এতে ধরিত্রী সিক্ত হয়ে কৃষিকাজের উপযোগী হয়। এসময় মাটি খোড়া, হাল চালনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। হিন্দু বিধবা নারীরা এ সময় কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলে। এ উপলক্ষে পিঠা-পুলি ইত্যাদি বিশেষ ধরণের খাবারের আয়োজন করা হয়। কথিত আছে, অম্বুবাচীতে মাটি খোড়া হলে মাটির থেকে রক্ত বের হয়। এ সময় দুধ ও কলা খেলে সাপের কামড় খাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। এ সময় ভাগ্নে মামার বাড়িতে খেলে মামার আর্থিক উন্নতি হয়। অম্বুবাচীতে ঘরের কাজও বন্ধ রাখা হয়।

৭. গাস্বি

এ উৎসব হৈমন্তিক ধানের শিষে দুধ সঞ্চয়নমূলক একটি অনুষ্ঠান। আশ্বিনের শেষ রাতে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফসল যাতে ভালো হয় সে উদ্দেশে পরের দিন পয়লা কার্তিক প্রত্যুষে কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা একত্রে বেটে সরিষার তেলসহ ধানগাছে মাখিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি নীরোগ স্বাস্থ্যের জন্য লোকেরা পরদিন ভোরে তেলাকুচার পাতা, আমগুরুজের লতা, হলদি, পান ইত্যাদি বেটে গায়ে মেখে স্নান করে। ঘরে ইঁদুর থাকলে নতুন ধান রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হবে, এ আশঙ্কা থেকে ছেলেমেয়েরা ভোরে বাড়ি বাড়ি

www.pathagar.com

গিয়ে সবার বেড়া লাঠি দিয়ে পেটায় আর ছড়া কাটে– 'ইন্দুর-বান্দর দূর যা... ইন্দুর-বান্দর দূর যা'। ভাবা হয়, এতে ইঁদুর পালিয়ে যাবে। গৃহিণীরা এ আশ্বিনের শেষ রাতে রান্না করে এবং পরদিন সকালে সবাই মিলে খায়। এ জন্য একটি ছড়া প্রচলিত আছে 'আশ্বিন মাসে রান্ধে-বাড়ে, কার্তিক মাসে খায়/ যে যেই বর চায় সবে, সেই বর পায়।' এ রাতে যুবকেরা রান্না করা পিঠা চুরি করতে বেড়িয়ে পড়ে। যাদের সাথে রসিকতার সম্পর্ক (বৌদি, ঠাকুমা) তাদের রান্না করা পিঠা বা মাংস চুরি করে তাদের বোকা বানাতে চায়। কেউ গল্প করার এক ফাঁকে চালের গুড়ার মধ্যে এমন কিছু দেয়, তাতে পিঠা ফেঁপে ওঠে না। কেউ হাঁড়ি বা কলসি চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে রাখে। পরদিন সকালে দেখা যায় একজনের হাঁড়ি অন্যদের পুকুরের মাঝখানে ভাসছে। একজনের বালতি অন্যদের ঘরের পেছনে আড়াল করে রাখা। এই অংশ শুধু মজা করার জন্য। একে হরিকালিও বলা হয়।

www.pathagar.com

লোকমেলা

ঝলমলিয়া দিঘির পাড়ের রাশ মেলা

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার হুড়কা গ্রামের ঝলমলিয়া দিঘির পাড়ে রাশ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সনাতন ধর্মের বৈষ্ণবীয় মতে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সাথে রাধা এবং তাঁর সঙ্গীদের মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে রাশ মেলা। নভেম্বর মাসের পূর্ণিমার দিন রাশ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূর্ণিমাকে রাশ পূর্ণিমাও বলা হয়। আনুমানিক ২৫০ বছর পূর্বে এখানে এই মেলা শুরু হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই মেলা ১ মাস ধরে চলতো। তখন মেলায় যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ. ঘোড় দৌড়ের ব্যবস্থা ছিল। এখন ৭ দিনব্যাপী এই রাশ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন লোকগান ও রাশ কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্মীখালী বারুণীর মেলা

মোরেলগঞ্জ উপজেলার জিউধরা ইউনিয়নের লক্ষ্মীখালী গ্রামে বারুণীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এখানে বারুণীর মেলা শুরু হয়। চৈত্র/বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের মদন ত্রয়োদশী তিথিতে মেলাসংলগ্ন কামনাসাগর দিঘিতে ঐ দিন পূণ্য স্নান হয়। হাজার হাজার নারী-পুরুষ স্নানে অংশগ্রহণ করে। ৭ দিন ধরে মেলা চলে। মতুয়া সম্প্রদায়ের ভগবান শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ সাধু ঠাকুর এই মেলার প্রচলন করেন। এক সময় এই মেলায় যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ হতো।

ঠাকুরানি দিঘির পাড়ে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা

রামপাল উপজেলার রাজনগর ইউনিয়নের কালেখার বেড় গ্রামে ঠাকুরানির দিঘির পাড়ে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলাটি চৈত্র মাসের শেষ দিন এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ আসে।

ঈদের মেলা

রামপাল উপজেলার বাঁশতলী ইউনিয়নের গিলাতলা গ্রামের গিলাতলা বাজারে ঈদের দিনকে ঘিরে ৩ দিন ধরে মেলা চলে। এ মেলায় নানা বয়সের লোকজন আসে।

চৈত্র সংক্রান্তি মেলা

মোংলা উপজেলার চিলা ইউনিয়নের উত্তর হলদিবুলিয়া গ্রামের কাচারি বাড়ির কাছে ব্রিটিশ আমল থেকেই চৈত্র সংক্রান্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিনে এক

www.pathagar.com

দিনের জন্য এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় আশেপাশের গ্রাম থেকেও নানা বয়সের ও নানা পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। এ মেলায় অন্যান্য সামগ্রীর তুলনায় বেশি বিক্রি হয় তরমুজ, বাঙ্গি ও বাতাসা।

এছাড়াও বাগেরহাট জেলায় ছাবের ফকিরের মেলা প্রসিদ্ধ। প্রতিবছর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই মেলা বসে। জিউধরা ইউনিয়নে ঠাকরুন তলা গ্রামে ভাণ্ডারী বাড়ি আছে। সেখানে প্রতিবছর ওরশ হয় এবং মাইজভাণ্ডারী গান হয়। এখানে সাধুর বাড়ি মেলা চৈত্র ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বসে। রজব শাহের মাজারে এবং পীর কাঁলাচাদের মাজারে ওরশ হয়। গয়েজউদ্দিন মাইজভাণ্ডারীর বাড়িতে বছরে ২ বার মেলা বসে; ৯ই মাঘ ও ২৫শে ফাল্গুন এছাড়া ১লা বৈশাখ, অনুষ্ঠান হয়। নবান্ন এবং নতুন চালের পিঠা এই এলাকার বিশেষ উৎসব।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. সাধভক্ষণ

এটি এমন একটি অনুষ্ঠান সেটি শুধুমাত্র গর্ভবতী মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এটি মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কিন্তু এটির জনপ্রিয়তা বেড়ে এখন অন্যান্য ধর্মালম্বীদের অনেকেও পালন করে। একজন গর্ভবতীর যখন গর্ভের বয়স ৭ মাসে পড়ে তখন গর্ভবতী মাকে সবধরণের মজাদার মজাদার খাবার খাওয়ানোই সাধভক্ষণ। এটি বিজ্ঞানসম্মতও বটে। তবে এর সাথে ধর্মভেদে কিছু আনুষ্ঠানিতাও রয়েছে, যা সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এই আয়োজনটি মূলত গর্ভবতী মায়ের বাবার বাড়িতে পালন করা হয়। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা রান্না করে খাবার নিয়ে আসেন। ৭ ঘাটের পানি (নদীর), ৭ ধরনের শাক মিশিয়ে ভাজি করা হয়। দধি, মিষ্টির আয়োজনও থাকে মাছ মাংসের পাশাপাশি। খাবার এর পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনেরা বিভিন্ন উপহার যেমন- শাড়ি, গয়না ইত্যাদি থাকে। আত্মীয় স্বজনেরা শাড়ি, গয়না, খাবার এগুলো দিয়ে গর্ভবতী মাকে আশির্বাদ করে থাকেন। এই আশির্বাদে বেশিরভাগ মানুষই গর্ভবতী মা যাতে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এসব দোয়াই করে।

গর্ভবতী মাকে কালি বাউস মাছ খেতে দেওয়া হয় না, তাতে নাকি বাচ্চার গাল বড় হয়। বাইন মাছও খেতে দেওয়া হয় না, এতে নাকি বাচ্চা পেটের মধ্যে মোড়ায়। এছাড়া বাচ্চা গর্ভে থাকাকালীন গর্ভবতীকে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এর দিনে কোন কিছু কাটতে দেওয়া হয় না, কাটলে বাচ্চার কোন অঙ্গের ক্ষতি হয়। এখনও গ্রাম বাংলায় গর্ভবতী মাকে ভারী ভারী কাজ করতে দেখা যায়। পানি আনা, ঢেকিতে ধান ভানা এধরনের কাজ করলে নাকি বাচ্চা নিচের দিকে থাকে, বাচ্চা প্রসবের পূর্বে মাকে প্রচুর হাঁটানো হয় বাচ্চা নিচের দিকে আনার জন্য, ব্যথা শুরু হলে বেতের ধামার উপর উপুর করে শোয়ানো হয় এতে দ্রুত বাচ্চা ডেলিভারী হয়ে যায়। বাচ্চা প্রসব যাতে তাড়াতড়ি হয়ে যায় এজন্য ঐ সময় গর্ভবতী মাকে জমজম কুয়ার পানি, পড়া পানি, চিনি পড়া প্রভৃতি খাওয়ানো হয়। এছাড়া মরিয়ম ফুল নামক এক ধরনের ফুল, যা আরবাঞ্চলে ফুটে তা ভিজিয়ে পানি প্রসব ব্যথা উঠলে খাওয়ানো হয়। শুকনো ফুল পানি ভিজে আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে এবং ফুটে উঠলে সাথে সাথে বাচ্চা হয়ে যায়। বাচ্চা প্রসবের পরও মাকে বিভিন্ন রকম সংস্কার মেনে চলতে বাধ্য হতে হয়। যেমন- মাকে পেট ভরে খেতে দেওয়া হয় না, চাল, ভাজা, রুটি এগুলো খেতে হয়, তাতে করে গর্ভবতীর শরীর শুকিয়ে আসে, ব্যথা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায়। বাচ্চার ক্ষেত্রেও অনেক সংস্কার, যেমন- তাবিজ, কবজ দেওয়া হয় অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, বাচ্চা

www.pathagar.com

যাতে না মোচড়ায় এজন্য বেনের দোকান থেকে সাতমোড় গাছ নামক এক ধরণের প্যাঁচানো বা মোড়ানো গাছ গলায় পড়িয়ে দেয়া হয়। এসব সংস্কারে তেমন ফল না পেলেও একটা পুরোনো বিশ্বাস থেকে অনেকে তা পালন করে।

২. বুড়ির ঘরপোড়া অনুষ্ঠান

দক্ষিণ অঞ্চলে কার্তিক মাসে শীতের শুরুতে বুড়ির ঘর পোড়া একটি আনন্দমুখর অনুষ্ঠান। এটি খুবই সাদাসিধে গ্রাম্য পরিবেশের অনুষ্ঠান। কোন আলো-বাতি বা কোন আড়ম্বর কিছুই নেই এতে, তবু এই দিনটা কৃষকদের জন্য তরুণ-তরুণীদের জন্য একটি আনন্দমুখর সন্ধ্যা। নাম থেকেই বোঝা যায় এ অনুষ্ঠানটি রাতে বেলার অনুষ্ঠান। কার্তিক মাসে যখন খেজুর গাছ কাটা হয় ঐ খেজুর গাছের ফেতরা দিয়ে মশালের মতো তৈরি করে তার সাথে আরো আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সংযুক্ত করা হয়। কার্তিক মাস শেষে অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে বিভিন্ন রোগ ও মশা দেখা দেয়। এ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের প্রথমত দিনটা কাটে বুড়িকে তৈরি করার কাজে। মাঠে ধান কাটা শেষ হয়ে যায়। ঐ সময় মাঠের মধ্যে খোলা জায়গায় দুটি বাঁশ পোতা হয়। দুটি বাঁশের মাথায় কুটা (মরা ধান গাছ) নারকেলের পাতা, লাঠি খড়ি বেধে মোটা করে পেঁচিয়ে লম্বা বাঁশটি বুড়ো হিসেবে আর তুলনামূলক ছোট বাঁশটি বুড়ি হিসেবে সাজানো হয়। উল্লেখ্য, এ সময় লক্ষ্য রাখা হয় যে বুড়ো-বুড়ি যেন পাশের গ্রামের বুড়ো-বুড়ি থেকে বড় এবং মোটা হয়। এর পাশাপাশি শুকনো কাঠ খড়ি দিয়ে সাজান হয়।

বিকেল হলে শুরু হয় মশাল তৈরি। লম্বা গাছের কাঁচা লতার মাথায় গিট দিতে হবে। নারকেলের মালা ফাঁকা করে মালার মতো গাঁথা জন্য কিছুটা পরপর খেজুর গাছের ফেতরা দিয়ে ভাল শক্ত করে মশাল তৈরি করা হয়। কাচা লতা দিয়ে তৈরি করা হয় যাতে করে আগুনে লতা পুড়ে না যায়। আবার যাতে করে লতা দিয়ে মাথার ওপরে সহজে ঘোরানো যায়।

অবশেষে সারা দিনের প্রতীক্ষার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মুড়ি আর বাতাসা সবার মাঝে বিতরণ শেষে শুরু হয় বুড়োর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কাজ। গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা বুড়োর আগুনের মধ্যে কিছু নাটা ফল দিয়ে রাখে। এই ফল আগুনে পুড়লে বিকট আওয়াজ করে ফুটে ওঠে। বুড়োর গায়ে ভাল করে আগুন লেগে গেলে যে ছেলেরা মশাল ঘোরাবে তারা সবাই যার যার মশাল নিয়ে বুড়োর গা থেকে আগুন ধরিয়ে আনে এরপর সবাই ফাকা ফাঁকা হয়ে দাড়িয়ে যায়, যার মশাল মাথার ওপর ঘোরাতে থাকে, সারা মাঠ আলোকিত হয়ে যায়। জোনাকি পোকার মতো আগুনের ফুলকি উড়তে থাকে সারা মাঠে। দূর থেকে কি অপরূপ শোভা গ্রামের সবাই মুগ্ধ চোখে দেখে থাকে। এটা আসলে নবান্ন উৎসব শুরু করার প্রথম ধাপ। কিন্তু এ সকল আনন্দমুখর অনুষ্ঠান প্রায় বিলীন হতে যাচ্ছে। এখন আর এগুলো সচরাচর চোখে পড়ে না।

www.pathagar.com

৩. গায়ে হলুদ

মুসলিম বিয়ের প্রধান আনন্দমুখর অনুষ্ঠান হচ্ছে গায়ে হলুদ। এই অনুষ্ঠানে বিয়ের পাত্র/পাত্রিকে গায়ে হলুদ মাখিয়ে গোসল করানো হয়। এর সাথে থাকে মেহেদি মাখা, দুধের স্বর মাখা। সবচেয়ে আনন্দময় পর্ব হলো রং খেলা। ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত এ রং খেলায় মেতে অংশ নেয়। এ অনুষ্ঠানে গ্রাম্য বয়স্ক নানি-দাদিদের রং মাখিয়ে বিয়ের পাত্র-পাত্রিদের সাথে গোসল করিয়ে দেয়া হয়। সাধারণত বাড়ির উঠানে গায়ে হলুদের ব্যবস্থা করা হয়। সারা উঠান পানি কাদা আর রং এ একাকার হয়ে যায়। সেখানে কাঁদাপানি পাত্র-পাত্রির ভাবী, নানি, দাদিদের টানা-টানী সে এক অন্য রকম দৃশ্য। গোসল শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বসে বিভিন্ন রকমের লোকজন ধাঁধা, গান ও নাচের আসার বসে। এর গানগুলো খুবই উপভোগ্য। যেমন–

"ধান দুবলো বরণ কুলা বকুল ফুলের মালা-
পঞ্চঋষী বরে বরণ আবে ছোটে তারা
এতদিনে দিলে দুবলা দেবড়িরও মাজারে (দেবড়ি-উঠান)
আজ কেন আইছ দুবলা নওশারও বরণে
এতদিনে দিলে কুলা ঋষির দোকানে
আজ কেন আইছরে কুলা নওশার বরণে
এতদিনে ছিলেরে ধান গেরোস্তের গোলাতে
আজ কেন আইছোরে ধান নওশার বরণে"

৪. মনসা পূজা

রামপাল উপজেলার রামপা ইউনিয়নের টেংরাখালী গ্রামে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা।

প্রয়াত জগবন্ধু মণ্ডল তার নিজ বাটিতে এই মনসা পূজার শুরু করেন মহা ধুমধামে। তার বাবাও মনসা পূজা দিতেন। বর্তমানে প্রয়াত জগবন্ধু মণ্ডলের ছেলে সঞ্জয় মণ্ডল এই মনসা পূজা দেন। প্রথমে গাছতলায় এই পূজা হতো। বর্তমানে সেখানে উঠেছে একটি পাকা মন্দির। জগবন্ধু বাবু মারা গেছেন ২০০১ সালে। তিনি এলাকায় ওঝা ও কবিরাজ হিসাবে খুব খ্যাতিমান ছিলেন।

মাটির প্রতিমা করা হয় মনসা দেবীর। চারটি হাত থাকে। সাপের মূর্তি থাকে। প্রতিমার গলায়ও সাপ থাকে। প্রতিমা তৈরি করতে ৩০০০ টাকা লাগে। প্রতি দুই বছর অন্তর আবার রং করতে হয়। রং করতে ৪০০/৫০০ টাকা খরচ হয়। পূজার দিন এলাকার লোকজন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে ১০০০/১২০০ লোকের সমাগম হয়। এর মধ্যে ৪০০/৫০০ লোক সঞ্জয় বাবুর বাড়িতে পূজা দেখে খাওয়া দাওয়া করে যায়। সাধারণত নিরামিষ রান্না করা হয়।

www.pathagar.com

পূজার জন্য একজন ব্রাহ্মণ আসেন যিনি পূজায় মন্ত্র পাঠ করেন। দুপুর থেকেই পূজা শুরু হয়। প্রথমে একদল বাজনাদার বাজনা শুরু করেন। ঢাক, ঢোল, কাসি, করতাল, কর্নেট ও ক্লানেট সানাই থাকে।

বিকালে মনসা মঙ্গল বা পদ্ম পূরণ থেকে মনসা দেবীর ভাসান পাঠ করেন সঞ্জয় বাবু নিজে এবং তার দুজন সাথী মিলে। এ জন্য মাইক ব্যবহার করা হয়। এরপর ব্রহ্মণ পূজায় বসেন। পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরণের ফল, চাল, গুড়, কলা, বাতাসা, মিষ্টি। পূজায় লাল ফুল ব্যবহার করা হয়। যারা পূজা দেখতে আসে তারাও এসব নিয়ে আসে।

সন্ধ্যায় দুধ, কলা , ডিম মনসা দেবীর প্রতিমার পায়ের কাছে রাখা হয় দুটি ছোট্ট মাটির ঘট সহকারে। সবার বিশ্বাস রাত্রে সাপ এসে এই দুধ কলা, ডিম খেয়ে যাবে।

রাত্রে স্থানীয় লোকজন মনসা দেবীর মন্দিরের আঙ্গিনায় ত্রিনাথের মেলা দেয়। মেলায় শিব ঠাকুরের উদ্দেশে গান গাওয়া হয়। ত্রিনাথের মেলায় নিম্নলিখিত আসর বন্দনা করা হয়।

প্রথমে বন্দিলাম আমি বাবা মায়ের চরণ
তারপর বন্দিলাম আমি ত্রিনাথের চরণ
দিননাথ তোমার আসরেতে করোরে আগমণ
তাপর দশদিক বন্দিলাম আমি দেব দিবাকর
পশ্চিমে বন্দিলাম আমি ঠাকুর জগন্নাথ
উত্তরে বন্দিলাম আমি হিমালয় পর্বত
দক্ষিণে বন্দিলাম আমি গঙ্গা ভগীরথ
পাতালে বন্দিলাম আমি বাসুকির চরণ
সর্গেতে বন্দিলাম আমি সর্বদেবের পায়
সর্বশেষে বন্দিলাম আমি ভক্তবৃন্দের পায়।

তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে ত্রেনাথের মেলা
এক পয়সার তেল কিনে তিন বাতি জ্বালিয়ে
বসে আছে তার চেলা
এক পয়সার পান কিনে তিন খিলি বানায়ে বসে আছে তার চেলা।
এক পয়সার গাজা কিনে তিন কলকি সাজায়ে বসে আছে তার চেলা।
ও গাজায় দিচ্ছে দোম আর করছে বোম বোবায় বলে ভোম্বলা।

পার্শ্ববর্তী ৪/৫ গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে পূজার খরচ চালানো হয়। সঞ্জয় মণ্ডল নিজেই ভিক্ষা করতে যান। তিনি আবার তার বাবার মতোন সাপে কামড়ানো রুগীর ঝাড় ফুঁক করেন।

এলাকার ভয় পাওয়া, বাচ্চা না হওয়া, ক্ষতি করা, ভুত-পেত্নীতে পাওয়া রোগের কবিরাজি চিকিৎসা করেন। পূজায় বাজনাদারদের ১০০০/১২০০ টাকা পারিশ্রমিক দেয়া

www.pathagar.com

হয়। ব্রাহ্মণকে দেয়া হয় টাকা চাল, কলা, প্রসাদ, শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি। পঞ্জিকার তারিখ অনুয়ায়ী ভাদ্র মাসে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাতে যে মনসা মঙ্গল বা পদ্মপুরাণ বই থেকে পাঠ করা হয়।

৫. রাধা বয়ড়ার বনবিবির পূজা

বাবা-মা আদর করে ছেলের নাম রেখেছিলেন রাধাকান্ত। গ্রামের লোকেরা কান্ত বাদ নিয়ে শুধু রাধা নামেই ডাকতেন। রাধা জন্ম থেকেই বয়ড়া ছিলেন, কানে শুনতেন না। রাধা বড় হলে গ্রামের লোকেরা তাকে রাধা বয়ড়া নামে সম্বোধন করতেন কানে কম শোনার জন্য বাবা-মা, ছেলেকে আর স্কুলে পাঠাননি। রাধার বয়স যখন বিশ বছর তখন তার বাবা-মা মারা যায়। রাধা বেকার হয়ে পড়েন, সংসারে একা রান্না খাওয়া ঠিকমত হয় না। এমন সময় বুড়ির ডাঙ্গা গ্রামের হরষিত ঢালী একটি নৌকা তৈরি করলেন, সুন্দরবন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনার জন্য। হরষিত তার নৌকার কাঠুরদের রান্না করে খাওয়ানোর জন্য রাধা বয়ড়াকে ঠিক করলেন। কথা বললে রাজি হলেন। হরষিত ঢালির নৌকা গিয়ে পৌঁছল ভেদা খালীর চরে। রাধা বাড়ি রওনা হবার সময় সঙ্গে দুটি টেংরা মাছ মারার ছিপ নিয়ে গিয়েছিলেন। চরের পাশ্বের ছোট খালে রাধা ছিপ ফেললেন, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রাধা খারাই বোঝাই করে ফেললেন টেংরা মাছ। নৌকায় আনা বেগুন দিয়ে রাধা, টেংরা মাছের তরকারী রান্না করলেন। কাঠুরেরা মাছের তরকারীর খুব প্রশংসা করলেন, এবং খাওয়া সেরে কুঠার নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য। রাধা নৌকার গলুইয়ে কিছু সময় বসলেন, তারপর ভাবলেন, রাতে রান্না করার জন্য আরও কিছু মাছ ধরা দরকার। রাধা ছিপ নিয়ে নৌকা থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে গিয়ে ছিপ ফেললেন, রাধার বর্শিতে টপাটপ মাছ ধরতে লাগলো, এমন সময় ধবধবে সাদা কাপড় পাড়া এক দুগ্ধ রাধার কাছে এসে ছিপ ফেললেন, রাধার বর্শিতে মাছ ধরে কিন্তু বৃদ্ধের বর্শিতে একটি মাছও ধরল না। রাধা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো একটি মাছও পেলে না, বাড়ি গিয়ে রান্না করবে কী? আমার কাছ থেকে কয়েকটি টেংরা মাছ নিয়ে যাও। তোমরা কয়জন? আমি একা, উত্তর দিলেন বৃদ্ধ। রাধা কানে শোনে না, কিন্তু বৃদ্ধের সকল কথা সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রাধা বৃদ্ধকে নৌকায় নিয়ে গেল, সেখান থেকে বৃদ্ধকে দুটি বেগুন, ৪ টি কাঁচা মরিচ ও ৪ টি টেংরা মাছ দিলেন। বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে রাধাকে বললেন, চলো আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসেবে। রাধা বৃদ্ধের পেছন পেছন হাটতে লাগলেন, জঙ্গলের ভিতর বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর একটি ছোট নালা সামনে পড়ল, সেখানে কচু গাছের ডগা দিয়ে একটি সাঁকো তৈরি করা আছে, বৃদ্ধ অনায়াসে সাঁকো পার হলেন, রাধা দাঁড়িয়ে রইলেন, বৃদ্ধ বললেন, ভাঙ্গবে না তুমি পার হয়ে এসো, এবার রাধা বৃদ্ধের কথামতো সাঁকোতে পা রাখলেন এবং নালা পার হয়ে বৃদ্ধের পেছন পেছন হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর ঘোলপাতার ছাউনিযুক্ত একটি সুদৃশ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর দেখতে পেলেন রাধা। ঘরের বারান্দার খুঁটির সঙ্গে শিকল দিয়ে একটি বিশাল আকৃতির বাঘ বাধা। রাধা ভয় পেলেন। বৃদ্ধ বললেন, ভয়ের কিছু নেই, ও আমার পোষা কুকুর, ওর নাম ভুলো। বৃদ্ধ বাঘের গায়ে হাত বোলালেন, রাধার বাঘের গায়ে হাত দিলেন, কিন্তু

www.pathagar.com

সে কিছু বলল না বরং জিভ দিয়ে রাধার পা চাটতে লাগল। বৃদ্ধ রাধাকে চিড়া, মুড়ি ও বাতাসা খেতে দিল, রাধা কিছুটা খেল বাকিটা নৌকায় নেবে বলে কাপড়ে বাঁধল। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, রাধা নৌকায় ফিরে আসল, এবং দেখলো সকল কাঠ কেঁটে নৌকায় ফিরে এসেছে। হরষিত রাধাকে জিজ্ঞাসা করল, এত সময় কোথায় ছিলি, হরষিত উত্তর দিল জঙ্গলে এক বৃদ্ধের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, এই দেখ চিড়া, মুড়ি, বাতাসা আমি কিছুটা খেয়েছি বাকিটা নিয়ে এসেছি। নৌকার সকলে মিলে রাধাকে সাথে নিয়ে বৃদ্ধের বাড়ি খোঁজ করল, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না, হরষিত বুদ্ধিমান, বললেন, মা বনবিবি রাধার সরলতার মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখা দিয়েছে, আমরা আগামী দিন জঙ্গলের এই স্থানে মা বনবিবির পুজো দেবো, আর সেই পুজোর পুরোহিত হবে স্বয়ং রাধা।

৬. বুড়ির বাসা

অগ্রহায়ণ মাস যাওয়ার দিন ছেলেমেয়েরা ফাঁকা জায়গায় খুঁটি পুতে তাতে কলার শুকনো পাতা, খেজুরের ছোবড়া (এ সময় গ্রামে খেজুর গাছ ছোলা হয়) জড়ো করে খড়ের গাদার মতো করে। পরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে মশার প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। ধারণা করা হয় মশা ওই গাদার মধ্যে গিয়ে জড়ো হয় এবং তখন আগুন ধরিয়ে দিলে মশা মারা পড়ে। এর ফলে গ্রামের আবর্জনাও পুড়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। সন্ধ্যায় কাতার দড়িতে নারকেলের শুকনো মালা এবং খেজুরের ছোবড়া বেঁধে তাতে আগুন ধরিয়ে ফাঁকা মাঠে গিয়ে খুব জোরে তারা বাজির মতো ঘোরানো হয়।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

মানুষের মৌলিক চাহিদার প্রধানটি হচ্ছে খাদ্য। তবে অঞ্চল, জাতি-গোষ্ঠী এবং প্রচলনের জন্য এর প্রকারভেদ ঘটে। মূলত যোগান অনুসারে মানুষের প্রধান খাদ্য নির্বাচিত হলেও এতে রয়েছে দারুণ বৈচিত্র্য। আর পৃথিবীব্যাপী খাদ্যের পার্থক্য ঘটে কখনও পুরো কখনও আংশিক। প্রায়শ এলাকাভেদে কোনো খাদ্য প্রচলিত থাকে যা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এটা স্বাদে-পুষ্টিতে সামান্য বা বিশেষ যাই হোক তা লোক খাদ্য হিসেবে পরিচিতি পায়। বাগেরহাট এলাকায় এমন দুএকটি লোকখাদ্য প্রচলিত আছে। 'থুবড়ো জাউ,' 'ভদোমেড়া', 'কাড়ার পিঠে' এমন সব খাদ্য।

বাংলাদেশের অন্য এলাকার মতো বাগেরহাট অঞ্চলেও মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের চাহিদা প্রচুর। পূজা-পার্বণ, বিয়ে, নববর্ষের মতো শুভ কাজসহ যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে মিষ্টি এখানে অনিবার্য অনুষঙ্গ। আত্মীয় সমাগম এবং অনুগমনে মিষ্টির হাড়ি হাতে থাকা ঐতিহ্য। বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ধরণের পিঠা তৈরিও বাগেরহাট এলাকার বৈশিষ্ট্য। শীতের দিনে তেলপিঠা, ভাপাপিঠা, চিতইপিঠা, রসেভেজা ইত্যাদি তৈরি হয়। বর্ষার দিনে তৈরি হয় তালপিঠা, কলাপিঠা ইত্যাদি। আবার উৎসবাদিতে যেসব মিষ্টান্ন তৈরি হয় অন্য সময় তা হয় না। এমন কিছু খাদ্য আছে যা বাগেরহাট অঞ্চলেই হয়ে থাকে এবং এখানেই প্রিয় খাদ্য-তালিকায় থাকে সেগুলো। শিশুদের বয়স ৬ দিন হলে ষষ্ঠী পূজা করে হিন্দু সম্প্রদায়। সেদিন ভাজা চালের গুঁড়ি, দুধ, গুড়, কলা, নারকেল, আদা-মসলা, কর্পূর ইত্যাদির মিশ্রণে তৈরি হয় ভদোমেড়া। এটাকে ভেড়ামেড়া, ছাতু ইত্যাদি নাম অভিহিত করা হয় এখানে। হাতের মুঠিতে যতখানি ধরে ততখানি নিয়ে তালুতে চেপে ডিমের মতো পরিমানে এবং আকারে করা হয় ভদোমেড়া। এতে আঙ্গুলের ফাঁকের এবং রেখার ভাজগুলো স্পষ্ট শিরার মতো দেখা যায়। লোকখাদ্যের এ এক অতি উত্তম নিদর্শন।

বাগেরহাটের দক্ষিণে গ্রীষ্মের শেষে ছোট ছোট কাকড়া পাওয়া যায় বিস্তর পরিমানে। আমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় এগুলো জলের উপর ভেসে যখন সাঁতার কেটে সমুদ্রে নামতে শুরু করে তখন এমনও হয় যে, খালে বিলে জল দেখা যায় না, শুধু কাকড়া। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এই কাকড়া ধরে এর ঘিলু বের করে ঝাল-মসলা দিয়ে পিঠা বানায়। এটা খুবই উপাদেয়।

থুবড়ো জাউ হচ্ছে গরীবের পায়েস। মোটা চালের সাথে গুড়-নারকেল দিয়ে রাধা সাধারণ মিষ্টান্ন।

তালপিঠা

ভাদ্র মাসে তাল পাকে। তখন তালের সঙ্গে নারকেল, চিনি ও মসলাসহ পিঠা করা হয়। প্রথমে তালের মিশ্রণটি কলা-পাতার একটি খণ্ডের উপর মেলে দিয়ে আর এক খানা

www.pathagar.com

কলাপতার খণ্ড উপরে দিয়ে উনুনে উত্তপ্ত কড়াই বা তাওয়ায় এপিঠ ওপিঠ সেকে তৈরি হয় এই পিঠা। কলাপাতার বদলে মাদারপাতাও ব্যবহার করে অনেকে। পিঠার উপরে পাতার শিরার ছাপ পড়ে একটি সুন্দর অলঙ্করণ তৈরি হয়। এটা দেখতে খুব সুন্দর। তালপিঠা খেতেও খুব মজার। সহজে এই পিঠা অল্প উপকরণে তৈরি করা যায়। এজন্য দরিদ্র পরিবারগুলোতে এর প্রচলন খুব বেশি।

তেলপিঠা

চালের গুঁড়ি, গুড় এবং সরিষার তেল এই পিঠার প্রধান উপকরণ। বাগেরহাটের ধনী-গরিব সকল পরিবারে এর প্রচল রয়েছে। চালের গুঁড়ি এবং গুড় একসঙ্গে কিছু জলে মিশিয়ে ঘন করে গুলে রাখা হয়। পরে কড়াইয়ে উত্তপ্ত সরিষার তেলের মধ্যে এক কাপ পরিমাণ মিশ্রণটি ঢেলে দিলে তেলপিঠা তৈরি হয়। মিশ্রণটি কড়াইয়ে ঢালার জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয় নারকেলের মালা বা আচা দিয়ে তৈরি 'ওড়োং।' ডুবোতেলে ভাজা হয় বলে এই পিঠা প্রাকৃতিকভাবে কয়েকদিন সংরক্ষণ করা যায়। গৃহস্থ পরিবারে নতুন মাটির হাড়িতে কলাপাতা দিয়ে সংরক্ষণের প্রচলন ছিল। এতে বেশি দিন ঘরে পিঠা রাখা যায় বলে ধারণা।

চিতই বা সরাপিঠা

শুধু চালের গুঁড়ি জলে ঘন করে গুলে বানানো পিঠাই চিতইপিঠা। প্রথমে ভেজানো নরম চাল একটু শুকিয়ে ঢেঁকিতে গুঁড়া করে নেওয়া হয়। সেই গুঁড়া জলে ঘন করে গুলে রাখা হয় একটি পাত্রে। পরে মাটির তৈরি ছাচে সিদ্ধ করে তৈরি হয় চিতইপিঠা। ছাচে ডিম্বাকৃতি এবং গোল করে কয়েকটি অংশ থাকে। তার মধ্যে বাটি বা ওড়োংয়ে করে চালের গোলা সরা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ তাপ দিলেই চিতইপিঠা পাওয়া যায়। অনেক সময় চালের গুঁড়ির সঙ্গে কোরানো নারকেল দিয়েও এই পিঠা করা হয়ে থাকে। এই পিঠা গুড় দিয়ে খেতে হয়। একটু ঝোলাগুড়ের সঙ্গে চিতইপিঠা খাওয়া নিয়ে অনেক প্রবচনও প্রচলিত আছে এলাকায়। সহজ উপকরণের এই পিঠাটিও দরিদ্রদের জন্য পরম উপাদেয়।[১]

রসেভেজা পিঠা

রসেভেজা পিঠা আলাদা করে কিছু নয়– চিতইপিঠাকে খেজুরের রসে ভিজিয়ে নরম ও সুস্বাদু করার পর এর নাম হয় রসেভেজা পিঠা। এই পিঠা বানানোর জন্য আগে থেকে খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে 'তাত রস' করা হয়। 'জিড়েন কাটের' খেজুরের রস কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে লাল রঙয়ের অপেক্ষাকৃত ঘন রস তৈরি হয়। এর মিষ্টি ঘ্রাণের তুলনা হয় না। স্বাদের জন্য এর মধ্যে দুধ এবং সুগন্ধ তৈরির জন্য দেওয়া হয় তেজপাতা, এলাচিসহ কিছু মসলা। তারপর চিতইপিঠা তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে এই সিরার মধ্যে দিয়ে একরাত ভিজিয়ে রাখা হয়। সকালে এই পিঠা সুস্বাদু নরম এক অপূর্ব স্বাদের হয়ে ওঠে যার তুলনা মেলা ভার। বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও বরিশাল এলাকায় এই পিঠার বিশেষ আয়োজন হয়ে থাকে। নতুন জামাতাদের আপ্যায়নে এর জুড়ি নেই। আর নরম বলে বৃদ্ধদের জন্যেও এই পিঠার আলাদা কদর রয়েছে।

www.pathagar.com

কলাপিঠা

কলাপিঠার কোন বিশেষ কাল নেই। তবে যেহেতু শীতকালে অন্য অনেক পিঠা হয়ে থাকে তাই শীত ছাড়া অন্য সময়ও এটা তৈরি হয়। চালের গুঁড়ি, গুড় বা চিনি, কলা এবং নারকেল এই পিঠার প্রধান উপকরণ। উপকরণগুলো একসঙ্গে কিছু জলের সঙ্গে মেখে নরম করে রাখা হয়। পরে কড়াই বা তাওয়ায় গরম তেলের উপর অল্প অল্প করে দলা দিয়ে উলটে-পালটে ভেজে নিলে তৈরি হয় কলাপিঠা। এই পিঠায় কলার সুন্দর ঘ্রাণ থাকে। স্বাদের জন্য এতে কিছু অন্য উপাদানও মেশানো যেতে পারে।

পাটিসাপটা

পাটিসাপটা তৈরির জন্য অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি কাজ করতে হয়। আর এটা কিছুটা অভিজাত এবং সচ্ছল পরিবারে বেশি করা হয়ে থাকে। তৈরির জন্য প্রথমে চালের গুঁড়ি এবং গুড় বা চিনি জলে গুলে একটু নরম করে সামান্য তেলে সেকে রুটির মতো করা হয়। এই রুটির মধ্যে নারকেল ও গুড় ভাজা দিয়ে পেচিয়ে নিলেই পাটিসাপটা তৈরি হয়। স্বাদ এবং রুচি অনুসারে এর মধ্যে ক্ষীরের পুর বা অন্য কিছুও ব্যবহার করে অনেকে।

ভাপাপিঠা

বাগেরহাটের পল্লী এলাকায় সাধারণ ঘরের মায়েরা যখন ভাপা-পুলি তৈরি করে শিশুদের হাতে তুলে দেয় তখন সে আনন্দ স্বর্গীয় আবেশ সৃষ্টি করে। সাধারণত এ পিঠা বছরে দু'এক বারের বেশি বাড়িতে তৈরি হয় না বলে এর একটা উৎসবমুখর চাহিদা থাকে। সেই চাহিদা থেকেই এর বিশেষত্ব যুক্ত হয় তৈরি এবং খাওয়ায়। খুবই সাধারণ হলেও ঐতিহ্যে ভাপাপিঠার অবস্থান অনেক উপরে। চালের গুঁড়ি, নারকেল এবং গুড় এর প্রধান উপকরণ। ভাপা পিঠা করার জন্য একটি মাটির হাড়িতে জল ফুটিয়ে তার উপরে একটি ফুটো সরা চিৎ করে রাখতে হয়। সরার ফুটো দিয়ে গরম বাষ্প বের হওয়ার মুখে উপকরণগুলোর মিশ্রণ একটি কাপড়ে করে রেখে আর একটি সরা দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখলেই তৈরি হয় ভাপাপিঠা। এই পিঠায় আখেরগুড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পুলিপিঠা

বাগেরহাট এলাকায় পুলিপিঠাকে কুলিপিঠাও বলে। এটার নির্মাণ কৌশল কিছুটা পাটিসাপটার মতো। তবে রুটিটা এক্ষেত্রে বেলে নিতে হয় এবং শুধু পেচিয়ে না রেখে কারুকাজ করা হয়। আর নারকেল-গুড়ের ভাজা পুর আটকে দিয়ে সিদ্ধ করা হয় গরম বাষ্পে। এর ফলে স্বাদে ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়ে থাকে। খেতে পুলিপিঠা খুবই সুস্বাদু। পরিবেশনের সময় কারুকাজ করা পুলি পাত্র সাজাতে খুব উপযোগী।

তথ্যনির্দেশ

১. অনিলকৃষ্ণ দাম, মালগাজী; মংলা; বাগেরহাট, ৪ মার্চ ২০১৫

www.pathagar.com

লোকনাট্য

যাত্রা

পারিবারিক রাম যাত্রার দল

মংলা উপজেলার চাঁদপাই ইউনিয়নের কালিকাবাড়ি গ্রামে গড়ে উঠেছে একটি রাম যাত্রার দল। যার পাত্র পাত্রি প্রায় সবাই একটি বাড়ির সদস্য সদস্যা। এলাকার উক্ত বংশের নাম চৌকিদার বংশ।

১৯৮১ সালে অক্টোবরের ১৭ তারিখে চৌকিদার বাড়ির সুনীল মণ্ডল ও উক্ত গ্রামের সুনীল গুপ্তের উদ্যোগে রাম যাত্রা দলটি গড়ে ওঠে।

মোট ২৫ জনের দলে ১৮ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী। বালকরা বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করে। ১০ জন পুরুষ, ৯ জন মহিলা, ৪ জন বালক ও ২ জন বালিকা। চৌকিদার বাড়ির ১৯ জন গ্রামের ৬ জন। মোট ৫টি পালা অভিনয় করে এই দলটি। (১) সীতার বিবাহ (২) অশ্বমেধ যজ্ঞ (৩) মহিরাবন বধ (৪) তরুণী সেন বধ (৫) রাজা হরিশ চন্দ্র।

সীতার বিবাহ ও মহিরাবন বধ পালাটি লিখেছে কৌতুক অধিকারী যার বাড়ি রামপাল উপজেলায়, বাকি ৩ টি পালা লিখেছেন দলের মালিক এবং পরিচালক সুনীল মণ্ডল। পালার গান গুলো লিখেছেন সুনীল মণ্ডল ও কৌতুক অধিকারী। পালাগুলো রয়েল ড্রেস, ক্রিট,জোড়া,কোচ,পাঞ্জাবী, ধুতি, শাড়ি, নামাবলী, গেরুয়া পোশাক ব্যবহার করা হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম, ঢোল, চাকি, ঝিপসী, ক্যাসিও ও কর্নেট বাঁশি ব্যবহার করা।

সাধারণত মংলা উপজেলা, রামপাল উপজেলা এবং দাকোপ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে এই দলটি অভিনয় করে। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা বা সংসারের মঙ্গল কামনা করা কারো কোন মানত থাকলে তারা এই রাম যাত্রা দলটিকে বায়না করে।

প্রথমে ১০০০ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এই দলটি একটি পালা অভিনয়ের জন্য ৮০০০ হাজার টাকা নেয় যা তারা তাদের দলের শিল্পী ও মিউজিশিয়ানদের মান অনুযায়ী বণ্টন করে। দলের মালিক, পালার পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক সুনীল কুমার মণ্ডলের বয়স বর্তমানে ৫০ বছর। নিচে তাঁর একটি পালা লিপিবদ্ধ করা হল :

পালার নাম : অশ্বমেধ যজ্ঞ

উদ্বোধনী সংগীত

নমি তোমায় নমি, মায়ের মতো অবিরত লালন কর তুমি, আমার জন্মভূমি ২

১॥ অনেক তুমি দিয়েছ মা, তোমার দানের নেইকো সীমা, তাইতো আমি বারে বারে তোমার চরণ চুমি, আমার জন্মভূমি ২॥

২॥ মাগো তোমার আলো হাওয়ায় আমার জীবন বাঁচে, তোমার কোলে জনম লভি মন আনন্দে নাচে।

৩॥ তোমার সবুজ মাটির বুকে, ঘুমাই আমি পরম সুখে, তোমার কোমল পরশে মা জীবন জুড়াই আমি, আমার

জন্মভূমি ২

আসরী সংগীত

হে ভগবান (৩)

তৃষিত সুধা বুকে, কর বারি দান (৩) নীল গগন কোনে, সাজাও মেঘেরী মেলা,অংকীত মেঘসনে করুক বিজলী খেলা, চাতকীর মতো জ্বালা কর অবসান (৩)

চরিত্র লিপি

১। রাম
২। লক্ষ্মণ
৩। ভরত
৪। শত্রুঘ্ন
৫। সুমন্ত্র
৬। দূত
৭। ইন্দ্র
৮। পবন
৯। চন্ডাল
১০। ধনা
১১। ভূইয়া
১২। অড়াই
১৩। দুত্তর
১৪। ঘোষ
১৫। কাঠুরিয়া
১৬। মারতী
১৭। লব
১৮। কুশ
১৯। বাল্মীকি
২০। বশিষ্ট মুণি
২১। অগস্ত মুণি
২২। পোটল দাস
২৩। অষ্টবক্র

২৪। স্বর্ণ সীতা
২৫। অশ্ব
২৬। সীতা
২৭। শিষ্য
২৮। বিবেক

অশ্বেমেধ যজ্ঞ
প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য

রামের প্রবেশ

রাম : আমি যখন পিতৃসত্য পালন করতে গিয়েছিলাম বনে জনক নন্দিনী সীতা মোর ছিল মম সনে ॥ সীতাকে হরে নিল দুষ্ট দশানন। সীতা উদ্ধার করিল বীর পবন নন্দন ॥ উ : আমি কি নিষ্ঠুর, আমি কি পাষাণ যে সীতা চৌদ্দ বৎসর আমার সঙ্গে বনবাস যাপন করল সেই সীতাকে আমি নির্বাসনে দিয়েছি। সীতার শোক আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ : হ্যারো আর্য। কেন হেরী তব বিষণ্ন বদন, কেনই বা চোখে তব অশ্রুধারা বুঝিতে না পারি?

রাম : ভাইরে লক্ষ্মণ। ও কিছু নয়। প্রজার মনোরঞ্জন করা রাজার ধর্ম। সেই ধর্ম পালন করতে হলে, স্নেহ দয়া, মায়াকে বিসর্জন দিয়ে কঠোর কুঠারে বুকটাকে বাঁধতে হয়।

লক্ষ্মণ : আর্য, ঐ বুঝি দিবসের কর্মক্লান্ত সূর্য রশ্মি ধীরে ধীরে তমসার গর্ভে ডুবে যাচ্ছে। তেমনি অযোধ্যার সুখ সূর্য ও ধীরে ধীরে ডুবে যাবে অতল সলীলে।

রাম : কেনরে লক্ষ্মণ, তোমার এই দিশাহারা বাণী?

লক্ষ্মণ : দাদা, জানকীকে সবে দিয়েছিনু নির্বাসন তমসার তীরে। হা রাম বলিয়া কত কেঁদেছিল সেই জনক দুহিতা সীতা। মনে হলে সেই স্মৃতি মোর মনে হয় ভীষণকার মুখ ধরি দোর্দণ্ড টংকারে কণ্ঠে ছাড়ি ঘোরসিংহনাদ। নিমেষে করব লয় অযোদ্ধা ভূবন।

রাম : স্থীর হও ভাইরে লক্ষণ। অযোদ্ধার রাজা আমি প্রজাপালন কর্তব্য আমার। এই গুরুভার শিরে আমি করেছি ধারণ। প্রজার মঙ্গল যদি হয় প্রয়োজন অযোদ্ধার রাজ সিংহাসন দিব বিসর্জন ঐ ধূলিকণা মাঝে।

বশিষ্টের প্রবেশ

বশিষ্ট : মহারাজ রামচন্দ্রের জয় হোক।

রাম : আসুন, আসুন গুরুদেব। এই রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করি শ্রান্তি দূর করুন। আর এই অধমের প্রণাম গ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

বশিষ্ট : না, না রামচন্দ্র। তোমার প্রণাম গ্রহণ করলে মহা পাপের সঞ্চয় হবে। তোমার প্রণাম গ্রহণ করতে আমি পারব না।

রাম : গুরুদেব, একি শুনি নিদারুণ বাণি। প্রাণ কাপে থর থর। বলুন গুরুদেব, বলুন প্রকাশিয়া, কিবা পাপে লিপ্ত আমি হয়েছি সূর্য কুলোদভাবে।

বশিষ্ট : তবে শোন রামচন্দ্র। তুমি বিশ্ব শ্রবা মুণির পুত্রকে হত্যা করে ব্রক্ষহত্যা পাপে জড়িত হয়েছে। তোমার প্রণাম গ্রহণ করলে আমি ব্রক্ষহত্যা পাপে জড়িত হব।

রাম : গুরুদেব। একি শুনি নিদারুণ বাণী। সূর্য কুলোদ ভব রাম চন্দ্র ব্রক্ষহত্যা পাপে হয়েছে জড়িত,বলুন গুরুদেব, বলুন প্রকাশিয়া, কি করলে এই মহা পাপের হাত থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

বশিষ্ট : তবে শোন রামচন্দ্র। এই মহাপাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে একমাত্র যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই।

লক্ষ্মণ : বলুন গুরুদেব, বলুন প্রকাশিয়া যজ্ঞর বিহীত তব।

বশিষ্ট: শোন তবে। এই নগরে যত মুণি ঋষিগণ আছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রন করে তাদের নিকট থেকে যজ্ঞর বিধান নিতে হবে।

রাম : আচ্ছা গুরুদেব আমি তাই করব। কোথায় সুমন্ত্র। সুমন্ত্রের কি আদেশ মহারাজ।

রাম : যাও সুমন্ত্র এই নগরে যত মুণি, ঋষি আছে সবাইকে নিমন্ত্রন করে নিয়ে আস। আমার যজ্ঞ করতে হবে (সুমন্ত্রের প্রস্থান)।

(অগস্তের প্রবেশ)

অগস্ত : দয়াময়, আমাকে একটু বসতে দিন।

রাম : আপনি কে? কী নাম আপনার?

অগস্ত : আমার নাম অগস্ত।

রাম : অগস্ত। বসুন ঐ স্থানে।

(পোটল দাসের প্রবেশ)

পোটল : দয়াময় , আমাকে একটু বসতে দিন।

রাম : আপনি কে? কি নাম আপনার?

পোটল : আমার নাম দাস বাবাজি।

রাম : ও পোটল দাস বসুন ঐ স্থানে।

(অষ্টবক্রের প্রবেশ)

আষ্টবক্র : দয়াময়, আমাকে একটু বসতে দিন।

রাম : আপনি কে? কী নাম আপনার?

আষ্ট : আমার নাম আষ্টবক্র।

রাম : তা হবে কেন অষ্টবক্র।

অষ্ট : ঐ হলো আর কি। অষ্টবক্র।

রাম : ও মুনির শ্রেষ্ট অষ্টবক্র। আপনি বসুন ঐ স্থানে।

www.pathagar.com

৩ জন : দয়াময় আমাদের আহবান করছেন কি জন্য।

রাম : আমি যজ্ঞ করব। ব্রহ্ম হত্যা পাপ থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য আমার যজ্ঞ করতে হবে। কি যজ্ঞ করলে আমি মুক্তি পাব সেই যজ্ঞের বিধান আপনারা বলে দিন।

অগস্ত : দয়াময়, আমি একটা যজ্ঞের কথা বলতে পারি। এই যজ্ঞে মহাপূণ্য হবে।

রাম : এই যজ্ঞে কি কি লাগবে?

অগস্ত : বেশি কিছু লাগবে না, এটি গো হত্যা করতে হবে।

রাম : একে করেছি ব্রহ্ম হত্যা, আবার করব গোহত্যা। না না আমি তা কিছুতেই পারব না। অন্য যজ্ঞ থাকে তো বলুন।

পোটল : দয়াময়, আমি বলি একটি ছাগমেধ যজ্ঞ করতে হবে। এতে বেশি কিছু লাগবে না। মাত্র একটি ছাগল হত্যা করতে হবে।

রাম : না না, এ অসম্ভব। একে করেছি ব্রহ্মহত্যা, আবার করব ছাগ হত্যা। না না তা আমি কিছুতেই পারব না। অন্য কোন যজ্ঞ থাকে তো বলুন।

অষ্ট : দয়াময়, আমি একটি যজ্ঞের কথা বলতে পারি। এই যজ্ঞে মহাপূণ্য হবে।

রাম : সে আবার কি যজ্ঞ?

আষ্ট : এটি হচ্ছে একটা রাজসূয় যজ্ঞ।

রাম : এই যজ্ঞে কী কী লাগবে?

অষ্ট : এই যজ্ঞে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজার মুণ্ডু কেটে যজ্ঞের পূণ্যাহুতি দিতে হবে।

রাম : এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা তো আমি। তাহলে নিজের মুণ্ডু কেটে যজ্ঞের পূণ্যাহুতি দিতে হবে।

অষ্ট : প্রয়োজন হলে তাই দিতে হবে।

রাম : না না , এ আমি পারব না। গুরুদেব , অন্য কোন যজ্ঞ থাকে তো বলুন।

বশিষ্ট : রামচন্দ্র , তুমি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ কর।

রাম : সে যজ্ঞে আবার কি লাগবে?

বশিষ্ট : সে যজ্ঞে বেশি কিছু লাগবে না। অষ্টম বর্ণের অশ্ব লাগবে।

রাম : সেই অশ্ব আমি কোথায় পাব।

বশিষ্ট : কেন পূর্ব দেশে মেঘ রাজার রাজ্যে সেই অষ্টম বর্নের অশ্ব আছে।

রাম : বলুন গুরুদেব, এই অশ্ব আনতে আমি কাকে পাঠাই।

বশিষ্ট : কেন, তোমার পবন পুত্র বীর হনুমান কে পাঠিয়ে দাও। সে অবশ্যই অশ্ব আনতে পারবে।

রাম : আচ্ছা, আমি তাই করব। ভাইরে লক্ষ্মণ, এখনই তুমি সারতিকে জানিয়ে এস। আমি অশ্ব মেধ যজ্ঞে ব্রতি হব। সারতী যেন মেঘ রাজার রাজ্য হতে অষ্টম বর্ণের অশ্ব নিয়ে অবিলম্বে আমার রাজ প্রাসাদে হাজির হয়। অশ্বের মূল্য স্বরুপ পাঁচ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেব। আর তুমি ত্রিভূবন নিমন্ত্রণ করে আসবে। সবাই যেন অযোদ্ধায় আসে এই যজ্ঞ দেখতে।

লক্ষ্মণ : হে আর্য। তব আজ্ঞা শিরোধার্য মোর (প্রস্থান)।

www.pathagar.com

অগস্ত : দেখেছ ভাইসব। রঘুনাথ আমাদের কথায় কর্ণপাত না করে ওনার কুলগুরু বশিষ্ট ঠাকুর যা বলেছেন তাই শিরোধার্য করে নিয়েছেন। আমাদের অপমান করেছেন। এই যজ্ঞে ভীষণ বাঁধার সৃষ্টি করতে হবে।

রাম : মুণিগণ, আপনারা কী নিয়ে গণ্ডগোল করছেন?

অগস্ত : আপনার এই যজ্ঞে কিছুতেই পূর্ণ হবে না। কেননা আমরা একে একে তিনটি যজ্ঞের কথা বলেছি। আপনি তাতে কর্ণপাত না করে আপনার কুলগুরু বশিষ্ট ঠাকুর যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছেন। এ যজ্ঞে কিছুতেই পূর্ণ হবে না।

রাম : গুরুদেব। এ যজ্ঞে কিছুতেই পূর্ণ হবে না। এখন আমি কী করব?

বশিষ্ট : রামচন্দ্র। তুমি একটা কাজ কর। ওদের তুমি ভালরূপে বিদায় কর। ওরাই তোমারে যজ্ঞের বিধান বলে দেবে।

রাম : ওহে ব্রাহ্মণগণ। আপনাদের আমি ভালরূপে বিদায় করব। আপনারা আমার যজ্ঞের বিধান বলে দিন।

অগস্ত : ভাইসব - আমরা ব্রাহ্মণ জাতি। বিদায়টা ভালরুপে পেলেই আমাদের মিটে গেল। কোন গণ্ডগোলের প্রয়োজন নেই।

২ জন : তাতো বটেই। বিদায়টা পেলেই আমাদের সারে।

অগস্ত : ভাইসব - তোমরা যাও। আমি যজ্ঞে বিধি বলে দিয়ে বিদায়টা নিয়ে আসি।

২ জন : ঠিক আছে। আমরা তাই যাচ্ছি (উভয়ের প্রস্থান)।

অগস্ত : দয়াময় - আপনি স্বর্ণ সীতা বামে রেখে যজ্ঞ করুন। তা হলে যজ্ঞ পূরণ হলেও হতে পারে। এইবার আমাদের বিদায়টা দিন।

রাম : এই নিন আপনাদের পুরস্কার। (পুরস্কার দিল)

অগস্ত : দয়াময় - এখন আমি আসি। (প্রস্থান)

বশিষ্ট : রামচন্দ্র। এবার স্বর্ণ সীতা এনে তোমার বামে রেখে যজ্ঞ আরম্ভ কর। আমি এখন আসি। সময়ান্তে আবার সাক্ষাৎ করব। (প্রস্থান)

রাম : উ: সীতা আজ তুমি কতদূরে তোমারে বীণা শূণ্য মোর অযোধ্যা ভূবন। ধন্য ধন্যরে প্রজাগণ। তোমাদেরই মনোরঞ্জন করবার জন্য বিনা দোষে জনক নন্দিনি সীতাকে আমি দিয়েছি নির্বাসন ঐ বাল্মীকীর তপোবনে।
(বিবেকের প্রবেশ)

বিবেক- গীত : এ যজ্ঞ হবে না পূরণ শোন বলি দয়াময় ॥ তোমার লক্ষী, বীণা তোমার ২ যজ্ঞ হওয়া বিষম দায়॥ জগৎ লক্ষী দিয়ে বনে, যে চিন্তা করেছ মনে।
স্বর্ণ সীতা লণ্ডভণ্ড, ২ করবে সে তোমায়॥ (প্রস্থান)

রাম : না না আমি - মানিব না এ কথা। তারে বীণা ধর তব বাক্যে গেছে দূরে, মম মোহ কুজ্জটিকা। সূর্য বংশের কুলগুরু বশিষ্টের কাছে প্রতিশ্রুতি আমি। হয় যদি প্রয়োজন যজ্ঞ কুণ্ডে প্রাণ আমি দিব বিসর্জন। (প্রস্থান)
১/২
(মারতী ও লক্ষণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ : মারতীরে, শ্রী নাথ রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন। প্রভু তোমায় স্মরণ করেছেন। এই নাও পাঁচ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। এই মুদ্রা দিয়ে মেঘ রাজার রাজ্য

www.pathagar.com

হতে অষ্টম বর্ণের অশ্ব ক্রয় করে নিয়ে অতি সত্তর রাজ সভায় যাও। আমি চল্লেম ত্রি ভূবন নিমন্ত্রন করতে (প্রস্থান)।

মারতী : এ আমার লীলাময়ের কোন লীলা। যাকে পাবার জন্য কত যোগী ঋষি মুণি তপস্যি কত যাগ যজ্ঞ করছেন। সেই সর্ব যজ্ঞেশ্বর রামচন্দ্র আজ কিনা অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এই যজ্ঞের ফল যে শুভ হয় তা আমার মনে হয় না। যা হোক প্রভূ যখন স্মরণ করেছেন, তখন একবার রাজ সভায় যাই (প্রস্থান)।

(স্বর্ণ সীতার প্রবেশ)

নেপথ্যে মারতী : সীতা নাই, সীতা নাই। অযোদ্ধায় লক্ষী নাই। লক্ষী ছাড়া অযোদ্ধা নগরী। লক্ষী ছাড়া অযোদ্ধার লোক।

মারতী : এ্যা, ও কি স্বর্ণ সীতা। অযোদ্ধার সিংহাসনে আজ স্বর্ণ সীতা। বিসর্জিয়া মা জানকী তৃণ মুষ্ঠি পূজা করে হেন সাধ্য কার। হনু বিদ্যমানে স্বর্ণ সীতা নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে পূরণ তা হবে না। আজ ভাঙ্গিব ঐ স্বর্ণ সীতা। রাম ভক্ত হনুমান আজ রাম রাম বলি ধ্বংস করিবে স্বর্ণ সীতা। আরে আরে পাতকির দল, সাধ্য থাকে রক্ষা কর। ভঙ্গিলাম আজ এই যজ্ঞ পাশ (ভাংগিতে উদ্যত)।

শরাশন সহ

লক্ষ্মণ : ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও বৎস্য ধৈর্য ধর।

মারতী : কেরে - কেরে তুই কি সেই মহাপাপি লক্ষ্মণ। ওরে - ওরে নিষ্ঠুর, এই জন্যই কি রাবণের বিশাল শক্তি সেল বক্ষে ধারণ করেছিলি? এই জন্যই কি চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় খেকে মা জনকীকে উদ্ধার করেছিলি? সেই মাকে আজ কেমনে নির্বাসনে রেখে - ফিরে এলি অযোদ্ধা ভূবনে।

লক্ষ্মণ : মারতীরে - সত্যই আমি মহাপাপি। অমি মাকে নির্বাসীতা করে এসেছি ঐ তমসার তীরে এ কলঙ্কিত জীবন আমি আর রাখব না। এই তোকে আমি শরাশন দিচ্ছি। এই মূহুর্তে তুই আমার বক্ষ সন্ধান কর। এই কলংকিত জীবনের আজ হউক অবসান। আয় আয়রে মাতৃভক্ত সন্তান। এই আমি বক্ষ বিস্তার করে দিচ্ছি।

রাম ও বশিষ্টর প্রবেশ

রাম : ভাইরে লক্ষ্মণ। তুমি এখানে কি করছ? একি মারতী - তুমি ও এসেছ?

মারতী : প্রভূ গো - প্রণাম তব শ্রী (পাদ পদ্মে) চরণে।

লক্ষ্মণ : আর্য - মারতী যে স্বর্ণ সীতা এক দণ্ডও সইতে পারছে না।

রাম : মারতী - আমি ব্রক্ষ হত্যা পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতি হয়েছি। এই যজ্ঞ পূর্ণ হতে হলে ব্রাহ্মণের বিধি অনুযায়ী স্বর্ণ সীতার প্রয়োজন। এ ছাড়া আমার যে, আর কোন উপায় নাই বৎস।

মারতী : না না প্রভূ - এ আমি সইতে পারব না জনম দুখিনী মা জননিকে নির্বাসনে দিয়ে তার স্থানে স্বর্ণ সীতা? এ দৃশ্য আমি দেখতে পারব না। (গেট)

www.pathagar.com

রাম : অবুঝ হইও না বৎস। আমি যে রাজা, প্রজার সুখেই আমার সুখ। প্রজার মনোরঞ্জন করাই আমার ধর্ম। তুমি যাও বৎস। অবিলম্বে আমর পুরী হতে অষ্টম বর্ণের অশ্ব নিয়ে এস।

মারতী : যথা আদেশ তব। (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ : হে আর্য - আমি ও যাই যজ্ঞের আয়োজন করি গিয়ে। (প্রস্থান)

রাম : গুরুদেব - এখন আমাকে কি করতে হবে?

বশিষ্ট : হনুমান অশ্ব নিয়ে ফিরে এলে বীর যোদ্ধাসহ ঐ অশ্ব চতুরদিকে জয় করতে পাঠাও, চতুরদিক জয় করে ফিরতে পারলে তবেই হবে তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ পূরণ।

রাম : ঠিক আছে গুরুদেব। আপনার আদেশ আমার শিরধার্য। এখন চলুন গুরুদেব আমরা বিশ্রামাগারে যাই।

বশিষ্ট : তাই চল বৎস - তাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(পবনের প্রবেশ)

পবন : অমরা পুরির দৃশ্য বড়ই মনোরম। যাতি যুতি, পলাশ, মল্লিকা ইত্যাদি পুস্পে উদ্যানগুলি শুষভিত। ধন্য মোরা ধন্য এই অমর ভূবন।

(মারতীর প্রবেশ)

মারতী : কেরে তুই অমর ভূবনে? ও তুই বুঝি অমরার দ্বারী? প্রভূ কি তোর দেবেন্দ্র বাসব?

পবন : সংযত হয়ে কথা বল। কোথায় এসেছ জান? এটা অমর ভূবন। আর আমি কে জান? আমি দেবেন্দ্র বাসবের দ্বারী। নাম পবন।

মারতী : পবন, আমি এখানে কেন এসেছি জান।

পবন : না বললে জানব কেমন করে?

মারতী : তবে শোন। শ্রী নাথ রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন। সেই যজ্ঞে অষ্টম বর্ণের অশ্বের প্রয়োজন। সেই অশ্ব আছে এই অমর ভূবনে।

পবন : হ্যাঁ হ্যাঁ - সেইটা তো আমাদের প্রধান অশ্ব।

মারতী : তাহলে আর দেরি কেন বাবধন। শীঘ্র করে অশ্বটি দিয়ে দাও।

পবন : কি এত সাহস। কোন অভিপ্রায় বলিলিরে এ হেন বারতা। দূর হ, দূর হয়ে যা কুলাঙ্গার।

মারতী : সাবধান পবন। আমি রাম ভক্ত হনুমান ভয় নাহি করি আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারীশুরে।

পবন : এতই যদি মরণের সাধ। আয় তবে সমর প্রাঙ্গনে দেখাইব বীরের বীরত্ব।

মারতী : এস তবে অমার দ্বারী, অবিলম্বে মিটাইব তব সমর পিপাসা।

(উভয়ের যুদ্ধ পবনের পলায়ন)

মারতী : কোথায় যাও কোথায় যাও অমরার দ্বারী একটু দাড়াও তোমার সমর পিপাসা ভাল করে মিটাইয়া ছাড়ি। (দ্রুত প্রস্থান)

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

www.pathagar.com

ইন্দ্র : আমার অন্তর আজ পদ্ম পত্রসিঞ্চিত বারীর ন্যায় চঞ্চল হয়ে উঠল কেন? কিছুতেই শান্তি লাভ করতে পারছি না। নন্দন কাননে গেলাম, ভেবে ছিলাম উদ্যান বিহারে মন চাঞ্চল্য দূরিভূত হবে কিন্তু হয়ে অমরাবতীর গৌরবময় নন্দন কানন আজ শ্মশান বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। সুস্নিগ্ধ মলয় নীল সেসব আজ অনল স্বর্ণের ন্যায় অনুভূত হচ্ছে তাহলে কি শচীর সঙ্গে প্রেমালাপে শান্তি পাব?

(চিন্তা করিয়া) না না তাতেও আজ শান্তি নেই। নৃত্য গীত? না না তাতেও আজ শান্তি নেই। কোথা রাম,প্রাণারাম, নয়নাভিরাম। (বিচলিতভাবে পদ চরণ)

(দ্রুত পবনের প্রবেশ)

পবন : সেরেছে - মরেছি দেবরাজ। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

ইন্দ্র : কি হয়েছে পবন। তোমার এ হেন অবস্থা করল কে?

পবন : দেবরাজ - কোথা হতে একটা বানর এসেছে। সে আমাদের অষ্টম বর্ণের অশ্বটি নিতে চায়। আমি তাকে বাঁধা দিয়ে ছিলাম। সে জন্য সে আমাকে ভীষণভাবে মারপিট করেছে।

ইন্দ্র : কি এত বড় স্পর্ধা একটা বনের বানরের। আসিয়া অমর ভূবন করিয়াছে ঘোর অত্যাচার। এস পবন এখনি যাইব আমি সমর প্রাঙ্গনে। (রেগে উভয়ের প্রস্থান)

(সারতীর প্রবেশ)

সারতী : হ্যা প্রভূ দয়া রাম। একি বিপদে পরলাম আমি। প্রভূগো বাহুতে শান্তি দাও। বুকে সাহস দাও।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র : কেরে তুই। মৃত্যু আলিঙ্গিতে কুণ্ডলী ফুনিপুচ্ছ করিলি ধারণ। কোন অন্ধ দুর্বুদ্ধিরে তুই। আজ সেই দুর্বুদ্ধির বসে অন্ধ হয়ে উত্তাল তরঙ্গে ক্ষিপ্ত বারিধার জলে জীবন তরণী তোর দিলিরে ভাসিয়ে।

সারতী : দেবরাজ - আমি এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমি এসেছি আপনার অষ্টম বর্ণের অশ্বটি নিতে। অযোদ্ধার রাজা রাম চন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতি হয়েছেন। সেই যজ্ঞে আপনার অশ্বটি প্রয়োজন।

ইন্দ্র : মারতীরে - বড় সৌভাগ্য আমার, আমি তো ঐযজ্ঞের জন্য এই অশ্বটি প্রতিপালন করে রেখেছি।

সারতী : দেবরাজ - তাহলে আর বিলম্ব কেন? (সত্তর) অশ্বটি দিয়ে দিন। আমি এখনি অযোদ্ধায় যাত্রা করব। অযোদ্ধার ভাগ্যকাশে আজ কাল ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। মাকে আমার বনে দিয়ে রাম চন্দ্র আজ মহানন্দে যজ্ঞ করতে যাচ্ছেন কিন্তু এই যজ্ঞের ফল যে শুভ হয় বলে আমার মনে হচ্ছে না।

ইন্দ্র : মারতী - রামের সেবক তুমি। আজ্ঞা বাহি দাস। নিয়ে যাও অশ্ব মোর।

সারতী : দেবরাজ। অশ্বের মূল্য স্বরুপ প্রভূ আমার পাঁচ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পাঠিয়েছেন। গ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

ইন্দ্র : মারতী- ঐ স্বর্ণ মুদ্রা অশ্বালয়ে রেখে যাও। যারা এই অশ্বটি প্রতিপালন করেছেন এই মুদ্রাগুলি তাদেরই প্রাপ্য।

সারতী : তাই হোক দেবরাজ। হে দেবেন্দ্রে বাসব দানিয়ে অশ্ব মোরে পূর্ণ কর রাম যজ্ঞ অযোদ্ধা নগরে।

ইন্দ্র : এস মম সনে। তোমা লয়ে অশ্বালয়ে করিব গমন। এনে দিব অশ্ব মোর না করিও ভাবন। (উভয়ের প্রস্থান)

(কলম সহ) রাম, লক্ষণ ও বশিষ্টের প্রবেশ)

রাম : গুরুদেব বলুন প্রকাশিয়া। একি চঞ্চলতা হৃদয় মাঝে মোর। দুরু দুরু কাঁপে অন্তর। পেচকের ভিবৎস চিৎকার। শকুনী গৃধিনী উড়ে সৌধ চুড়ে। ডুবে যায় অযোদ্ধা বুঝি আজ ভূগর্ভ মাঝারে।

বশিষ্ট : স্থীর হও রাজেন্দ্র রাঘব। তুমি চঞ্চল হলে প্রতি পদে পদে প্রজার অমঙ্গল হবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ হইলে পূরণ অযোদ্ধার ভাগ্য লক্ষি আসিবে ফিরিয়া।

(অশ্ব লইয়া সারতীর প্রবেশ)

সারতী : হে দয়াল রামচন্দ্র। গ্রহণ করুন আপনার অষ্টম বর্ণের অশ্ব।

রাম : ভাইরে লক্ষণ। হনুমান কে নিয়ে তুমি বিশ্রামাগারে যাও। আমি যজ্ঞের বিহীত কর্মে অগ্রসর হই।

লক্ষ্মণ : এস বৎস হনুমান। আমরা বিশ্রামাগারে যাই।

(মারতী ও লক্ষ্মণর প্রস্থান)

রাম : বলুন গুরুদেব, এটা কেমন কার্য?

বশিষ্ট : রামচন্দ্র, অশ্বভালে জয় পত্র লিখে চতুর্দিক জয় করতে পাঠাতে হবে।

রাম : আপনি জয় পত্রের বর্ণনা বলুন। আমি লিখে দিচ্ছি।

বশিষ্ট : ঠিক আছে। আমি বলছি, তুমি লিখ।

(রামচন্দ্র লিখবে)

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন। চারি ভাই যজ্ঞ করে অযোদ্ধা ভূবন॥ যে জন রামকে করিবে ভজন। অশ্ব সহ আসিবে শত্রুঘ্ন সন॥

যে জন রামকে করিবে অহংকার। অশ্ব বধিয়া যুদ্ধ করিবে সত্তর॥

রাম : গুরুদেব লেখাতো শেষ হলো। এর সঙ্গে আমি নিজে একটু লিখে দেই।

বশিষ্ট : যদি তোমার অভিলক্ষ হয়ে থাকে, তবে দাও লিখে।

রাম : অহংকারে লিখিলাম - অশ্ব বাধিবে যার মাতা হয় সতী। সতী মায়ের পুত্র হলে অশ্বকে বাধিবে। অসতীর পুত্র হলে অশ্ব ছেড়ে দেবে। এই অশ্ব বাধতে নাই কো কারো বাধা। বাধতে পেরে যেনা বাধে তার বাপ গাধা॥

বশিষ্ট : বৎস। বড় কড়া হয়ে গেল যে?

রাম : গুরুদেব জয় পত্রের বর্ণনা একটু কড়া না হলে কোথায় কোন বীর জন্মগ্রহণ করেছে তা জানা যাবে না। এখন বলুন, কাকে পাঠিয়ে দেব দিক জিন্তে।

বশিষ্ট : তোমার ভাই শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দাও। তবে খুব সাবধান। এখন আমি আসি। সময়ান্তে আবার সাক্ষাৎ হবে। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

রাম : 'শত্রুঘ্ন। সে বালক। সে কি দিক চিনতে পারবে?

(শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন : কেন দাদা- আপনি কি আমার বীরত্বের কথা ভুলে গেছেন? শৈশবে আমি খেলিবার বাটুল দ্বারা স্বহস্তে দুর্জয় লবণ দৈত্যকে সংহার করে ছিলাম। সে কথা কি মনে নেই দাদা?

রাম : হ্যাঁ ভাই মনে পড়েছে তোমার শৈশবের কথা। যাও ভাই। অশ্ব নিয়ে দিক চিনতে করহ গমন। সীতার অভিশাপ আর প্রজার মঙ্গল এই দুয়ের ব্যবধানে পূর্ণ হোক অশ্বমেধ যজ্ঞ মোর। যাও ভাই সারথিকে ডেকে তোমার ভূবন বিজয়ী রথখানা সাজিয়ে নাও। তারপর দিক চিনতে করহ গমন। সাবধান থেক ভাই খুব সাবধান।

শত্রুঘ্ন : তাই যেন পারি দাদা। তব আশির্বাদ মস্তকে ধারণ করে চলিলাম আমি দিক জিন্তে। কোন সংশয় বাধা না আসে যেন মোর চীতে। তব আজ্ঞা পালিতে হাসি মুখে বিসর্জিব মম প্রান। তবু পরাজয়ের গ্লানি মেখে কভূ হব না পিছু আন।

রাম : তোমার শৈশবের বীরত্বের কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। তবু না জানি কেউ মন আমার কু গাইছে। তাই বলছি সাবধান থেকো ভাই খুব সাবধান। (প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন : আর বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন। এখনি আমি দিক জিন্তে করিব গমন। সারথি (সারথির প্রবেশ) আমার ভুবন বিজয়ী রথখানা সুসজ্জিত করো। আমি চতুর্দেশ জয় করতে যাব।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র : ছোট রাজা রথ সুসজ্জিত করে এনেছি। আপনি যাত্রা করুন।

শত্রুঘ্ন : সুমন্ত্র। অশ্ব নিয়ে অগ্রে কোন দেশে যাত্রা করা যায়।

সুমন্ত্র : ছোট রাজ অগ্রে পূর্ব দিকে গেলে ভাল হয়।

শত্রুঘ্ন : তবে ছুটাও অশ্ব পূর্ব দিকে।

সুমন্ত্র : অশ্ব এবার উল্কাপাতের ন্যায় পূর্ব দিকে ধাবিত হও।

(অশ্ব সহ শত্রুঘ্ন ও সুমন্ত্রের প্রস্থান)
(পোলো, জাল ও কোচ সহ)
(অড়াইয়ের প্রবেশ)

অড়াই : অরে ব্যাডা মাজগা। এখ্যা বিরি হাঙ্গাইয়া লইয়া আও।

দত্তর : (নেপথ্যে) আইতাছি ব্যাডা সাজগা।

(দুত্তরের প্রবেশ)

অড়াই : দে ব্যাডা বিরি দে।

দুত্তর : রাখ ব্যাডা। দিতাছি। এই আমার এক টান। এই মোর বাপের এক টান। এই মোর ঠাকুর দার আর এক টান। ল - ল - ব্যাডা। অহন ল।

অড়াই : ব্যাডা - হাঙ্গারাত ঘুমাইতে পারি নাই। অহন একটু ঘুমাইয়া লই।

www.pathagar.com

দুত্তর : হ ব্যাডা। ঠিক কথা কইছ। আও দুজনে একটু ঘুমাইয়া লই (দুই জনে শুইল)।

অড়াই : কি হিত বাপরে বাপ। ব্যাডা একটু জরগাইয়া রগাইয়া ধর (দুইজনে ঘুমাইল)।

অড়াই : এই ব্যাডা পাদছোস - কি গন্ধ।

দুত্তর : ব্যাডা মুই পাদি নাই।

অড়াই : তবে গন্ধ কিহের?

দুত্তর : তাহলে ব্যাডা তুই পাদছোস।

অড়াই : না না মুই পাদ্দি নাই। তুই পাদছোস।

(উভয়ের গণ্ডগোল এবং হাতাহাতি)

দুত্তর : হোন ব্যাডা হোন। কাল্যারা রাইতে, কাকরার কুরমুরি খাইয়া প্যাডে একটু ঠুনা ঠুনি বাধছে। হেই লাইগা পাদে বড্ড গন্ধ হইছে।

(অশ্বের প্রবেশ)

অড়াই : (দেখিয়া) আরে ব্যাডা মাজগা - ও ডা কি আহেরে গুল হাপ নাই?

দুত্তর : (ভাল করিয়া দেখিয়া) আরে ব্যাডা না। গুলহাপ অইব জান। ওডা তো একটা ঘোরা আইত্যাছে।

অড়াই : ঘোরা তা অইলে তো ভাল অইছে। ঘোরা বাদগা ফ্যাল।

দুত্তর : আরে ব্যাডা আউগা আউগা।

অড়াই : দারা দারা - র্ র

দুত্তর : ব্যাডা সাজগা- আউগা-একেবারে ঠাসকা ধর।

(ঘোড়া ধরিয়া বাধিল)

আরে ব্যডা-ওর কপালে দেহি একখান জয়পত্র লেহন আছে।

অড়াই : আরে ব্যাডা,একেবারে পইরা ক্যান।

দুত্তর : ব্যাডা-সুইতো লেহন পরন মোডো জানি না। লেহনের মধ্যে লিখছিল মোর ঠাকুরদা। তাও এক অক্ষর।

অড়াই : হোন তবে ব্যাডা,মুই পারি। শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শক্রুঘ্ন। চারি ভাই যজ্ঞ করে অযোদ্ধা ভুবন॥

যেজন রামকে করিবে ভজন। অশ্ব সহ আসি শক্রুঘ্ন সহ। যেজন রামকে করিবে অহংকার। অশ্ব বাধিয়া যুদ্দ কারিবে সত্তর॥

অড়াই : আরে ব্যাডা অহন যা লিখেছে তা মোডো পড়ন যায় না।

দুত্তর : আরে ব্যাডা। জরগাইয়া ঘরগাইয়া পরগা ক্যাল অশ্ব বাঁধিবে যার মাতা হয় সতী। সতী মায়ের প্রত্র হলে অশ্বকে বাধিবে। অসতীর পুত্র হলে অশ্ব ছেড়ে দেবে। এই অশ্ব বাধতে নাই কো কারো বাধা। বাধতে পেরে যেনা বাধে তার বাপ গাধা ॥

দুত্তির : কি এতবড় কথা। ব্যাডা অহন বাধগা রাখ। দেহি অশ্বের মালিক কে আহে।

(সুমন্ত্র ও শক্রুঘ্নের প্রবেশ)

www.pathagar.com

সুমন্ত্র : রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব কে বন্দন করেছে।

অড়াই - দুত্তর : মোরা বন্দন করছি। হরবা কি?

শত্রুঘ্ন : অশ্ব ছেড়ে দাও।

অ + দু : বিনা যুদ্ধে অশ্ব ছাড়ুম না।

শত্রুঘ্ন : কি জান তোমরা যুদ্ধের কৌশল।

অ + দু : জানি কি না জানি একবার ভেজগা দ্যাহো।

দুত্তর : এই কোচ দেখছোস। একেবারে কোপাইয়া ফুডাইয়া দিমু।

অড়াই : হ্যাতে যদি ঠেসে যাই। তবে এই পোলো দেখছোস। একবারে ঠাসকে ধরুম।

দুত্তর : হ্যাতে ও যদি না পারি। তবে নাক কামড়াইয়া ছিড়গা ফেলুম।

শত্রুঘ্ন : তবে আয়রে পাষণ্ডের দল।

(যুদ্ধ - অড়াই ও দুত্তরের পরাজয়)

অ + দু : - (স্বভয়ে) মো মো মোরা ম ম মৎস বেচে খাই।

শত্রুঘ্ন : রাজা রাম চন্দের যজ্ঞে যত মৎস লাগবে সব তোদের দিতে হবে।

অ + দু : তা - তা - তা দেবো। কিন্তু আমাদের মুক্তি হবে কিসে। দয়া করে একটু বলে দিন।

শত্রুঘ্ন : তোদের মুক্তি - তোদের মুক্তি হবে ঐ রাম দরশনে।

অড়াই : ব্যাডা তুই একটু দারা। মুই অশ্বটা ছারগা দিয়া আই। (অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া) আয় ব্যাডা আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন : সুমন্ত্র। অশ্ব এবার উত্তরদিকে ধাবিত কর।

সুমন্ত্র : অশ্ব। এবার উল্কা বেগে উত্তর দিকে ধাবিত হও। (অশ্বসহ সকলের প্রস্থান)

(ঘোষের প্রবেশ)

ঘোষ : লাগবে ঘোল। ঘোল লাগবে। ভাল সাঠা পঁচা ঘোলা আছে। অনেক পথ হেটে এগেছি। একটু বিশ্রাম করা যাক। (ঘুমাইল)

(অশ্ব প্রবেশ করিয়া ঘোল খাইতে লাগিল)

ঘোষ : (হঠাৎ দেখে) এই ঘোল ঘোড়া খাস না। এই ঘোড়া ঘোল খাস না। এ্যাঁ ও কি। এ দেখি জয় পত্র লেখা। দেখি একবার পড়েই দেখি।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন। চারি ভাই যজ্ঞ করে অযোদ্ধা ভূবন। যেজন রামকে করিবে অহংকার অশ্ব বাধিয়া যুদ্ধ করিবে সত্বর। অহংকারে লিখিলাম পত্র অখিলের পতি। এই অশ্ব বাধিবে যার মাতা হয় সতী। অসতী মায়ের পুত্র হলে অশ্ব ছেড়ে দিবে। অশ্ব বাঁধতে নেইকো কারো বাঁধা। বাঁধতে পেরে যে না বাধে তার বাপ গাধা।

ঘোষ : কি এত বড় কথা। ঠিক আছে। আমি এই অশ্ব বাঁধব। দেখি কে আসে এই অশ্বের মালিক। অশ্ব থাক এই স্থানে (অশ্ব বন্ধন করিল)।

www.pathagar.com

(সুমন্ত্র সহ শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

সুমন্ত্র : রাজা রাম চন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব কে বন্ধন করেছে।

ঘোষ : আমি বন্ধন করেছি।

সুমন্ত্র : ছেড়ে দাও অশ্ব।

ঘোষ : বিনা যুদ্ধে ছাড়ব না অশ্ব।

শত্রুঘ্ন : কি জান তুমি যুদ্ধের কৌশল।

ঘোষ : জানি কি না একবার পরীক্ষা করে দেখ।

শত্রুঘ্ন : এস তবে।

(যুদ্ধ - ঘোষের পরাজয়)

শত্রুঘ্ন : এই বার বল তোর পেশা কি?

ঘোষ : ঘোল বিক্রি। কিন্তু আমার মুক্তি হবে কিসে দয়া করে একটু বলে দিন।

শত্রুঘ্ন : তোর মুক্তি হবে ঐ রাম দরশনে।

সুমন্ত্র : এখন অশ্ব ছেড়ে দে।

ঘোষ : তাই দিচ্ছি (অশ্ব ছাড়িল) এখন আমি আসি মহারাজ। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

শত্রুঘ্ন : সুমন্ত্র। অশ্ব এবার পশ্চিম দিকে ধাবিত কর।

সুমন্ত্র : অশ্ব। এবার তীর বেগে পশ্চিম দিকে ধাবিত হও।

(সকলের প্রস্থান)

(অগ্রে অশ্ব পশ্চাতে কাঠুরিয়ার প্রবেশ)

কাঠুরিয়া : মনে হয় পথ ভুল করে এসেছি। ওকি ওটা আবার কি। ওঠা যেন একটা ঘোড়া। যাক ভালই হল। ঘোড়াটা আমার দরকার। কিন্তু ওকি ওর ললাটে দেখি একখানা জয় পত্র লেখা আছে দেখি পড়ে। ওতে কি লিখেছে।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন। চারি ভাই যজ্ঞ করে অযোদ্ধা ভূবন। যে জন রামকে করিবে ভজন। অশ্ব সহ আসিবে শত্রুঘ্ন সন। যে জন রামকে করিবে অহংকার অশ্ব বাধিয়া যুদ্ধ করিবে সত্বর। অহংকারে লিখিলাম পত্র অখিলের প্রতি। অশ্ব বাঁধিবে যার মাতা হয় সতী। সতী মায়ের পুত্র হলে অশ্বকে বাঁধিবে। অসতীর পুত্র হলে অশ্ব ছেড়ে দেবে। এই অশ্ব বাঁধতে নেইকো কারো বাধা। বাধতে পেরে যেনা বাধে তার বাপ গাধা॥

কাঠুরিয়া : তাইতো এখন আমি কি করি। অশ্বকে যদি না বাধি তাহলে মা হবে অসতী। আর বাবা হবে গাধা। তবে আর দেরি করি কেন। অশ্বটিকে এখনি বেঁধে ফেলি (অশ্ব বাধিল)।

এই আমি অশ্ব বন্ধন করলাম দেখি অশ্বের মালিক কে আসে।

(সুমন্ত্র ও শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

সুমন্ত্র : রাজা রাম চন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব কে বন্ধন করেছে?

কাঠুরিয়া : আমি বন্ধন করেছি।

সুমন্ত্র : ছেড়ে দাও অশ্ব।

কাঠুরিয়া : বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না অশ্ব।

শত্রুঘ্ন : তুমি কি জান যুদ্ধের কৌশল?

www.pathagar.com

কাঠুরিয়া : জানি কি না জানি, একবার পরীক্ষা করে দেখ।

শত্রুঘ্ন : মরণের যদি এতই সাধ। তবে এস।
(উভয়ের যুদ্ধ - কাঠুরিয়ার পরাজয়)

শত্রুঘ্ন : কি মিটেছে তোমার যুদ্ধের পিপাসা? একবার বল তোমার পেশা কি?

কাঠুরিয়া : আমি একজন কাঠুরিয়া। জংগল হতে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রয় করে কোন রকমে দিনাতিপাত করি।

শত্রুঘ্ন : রামচন্দ্রের যজ্ঞে যত কাঠ লাগবে সব তোমাকে দিতে হবে।

কাঠুরিয়া : দেব মহারাজ দেব। কিন্তু আমরা মুক্তি কিসে হবে, দয়া করে একটু বলে দিন।

শত্রুঘ্ন : তোমার মুক্তি হবে ঐ রাম দরশনে। এবার অশ্ব ছেড়ে দাও।

কাঠুরিয়া : তাই দিচ্ছি মহারাজ। (অশ্ব ছাড়িল) এখন তাহলে আমি আসি মহারাজ (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)।

শত্রুঘ্ন : সুমন্ত্র। আমি ত্রিদেশ জয় করেছি। বাকি আছে মাত্র একটা দিক। সেটা হলো দক্ষিণ দিক। এবার ঐ দক্ষিণ দিক জয় করে স্বগর্ভে ফিরে যাব আমি অযোদ্ধা ভূবন। সুমন্ত্র - এবার ছুটাও অশ্ব দক্ষিণ দিকে।

সুমন্ত্র : অশ্ব - এবার উল্কা পাতের ন্যায় তড়িৎ গতিতে দক্ষিণ দিকে ধাবিত হও।
(উভয়ের প্রস্থান)
(বাল্মীকিও তার শিষ্যের প্রবেশ)

বাল্মীকি: জয় নারায়ণ শ্রী মধুসূদন (৩) শিষ্যরে - আমি যোগবলে জানতে পারলাম যে, রামচন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব ত্রি দিক জয় করে ফেলেছে। বাকি আছে মাত্র একটি দিক। সেবা এই দক্ষিণ দিক। এই দিকটা জয় করতে পারলে অবশ্য তার যোগ্য পূরণ হবে। বলত শিষ্য এখন আমি কি করি।

শিষ্য : এর আপনি আবার করবেন কি? ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র অশ্ব মেধ যজ্ঞ করেছেন। তার যজ্ঞ পূরণ হবে এত বড় আনন্দের কথা। তাতে আপনার আপত্তিটা কি?

বাল্মীকি: আপত্তি যে কি - সে তুমি বুঝবে না মূর্খ। রাম জন্মের ষাট হাজার বছর পূর্বে আমি রামায়ণ রচনা করেছি। আজ যদি সেই যজ্ঞাশ্ব দিক জিতে কিরে যায়, তাহলে আমি যত কিছু লিখেছি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিষ্যরে,আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হই, আমার যদি কিঞ্চিৎ তপস্যা বল থাকে, তবে আমি আমার এই তপোবনে রাম যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাব। (অদূরে অশ্ব দেখিয়া) ঐ দেখ শিষ্য বলতে না বলতেই একটা মনোরম তুরঙ্গ এসে বনমাঝে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ওকি। অশ্ব ভালে ওটা কি?

শিষ্য : গুরুদেব। অশ্ব ভালে একটা জয় পত্র লেখা আছে।

বাল্মীকি: জয়পত্র! কি লিখেছে ঐ জয়পত্রে। একবার পড়েই দেখি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন। চারি ভাই যজ্ঞ করে অযোদ্ধা ভুবন। যে জন রামকে করিবে ভজন। সে জন রামকে করিবে অহংকার। অশ্ব বাধিয়া যুদবধ করিবে সত্তর। অহংকারে লিখিলাম পত্র অখিলের পতি। অশ্ব বাধিবে যার মাতা হয় সতী। সতী মায়ের পুত্র হলে অশ্বকে বাধিবে। অসতীর পুত্র হলে

www.pathagar.com

অশ্ব ছেড়ে দেবে। এই অশ্ব বাধিতে নাইক কার বাধা। বাধতে পেরে যেনা বাধে তার বাপ গাধা ॥

বাল্মীকি : জয় পত্র তো খুব কড়া লিখেছে। কিন্তু এখন আমি কি করি? সতী মা কোথায় পাই? (চিন্তা করিয়া)

পেয়েছি- পেয়েছি সতী মায়ের সন্তান। আমার তপোবনে জনক নন্দিনী সীতাই তো একমাত্র সতী মা এবং কুশিলবই তার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র। যদি সেই সীতার

কুশিলবকে সপ্তাহ দিবসের জন্য ভিক্ষা করে আনতে পারি, তাহলে এই উপেক্ষিতা বাল্মীকিস্প্রথিত রামকে সমুচিৎ শিক্ষা দিতে পারবে। শিষ্য তুমি আশ্রমে ফিরে যাও। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি সেই দুঃখিনীর বক্ষ্যনিধী পুত্র দুটিকে ছল করে আনতে পারি কি না? চলো শিষ্য (উভয়ের প্রস্থান)।

(ধীরে ধীরে সীতার প্রবেশ)

সীতা : হ্যাঁ প্রভু রঘুনাথ। জনম দুঃখিনী জান কি কে তুমি কি জন্মের মতো নির্বাসন দিলে। আমার জনম কি হা প্রভু, হা প্রভু বলে, কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে যাবে! প্রভুগো একবারও দেখলে না কেমন করে তোমার স্নেহের যুগল কুমার কুশিলব তপোবনে ফলে জলে জটা বাকলে জীবন-যাপন করছে।

বাল্মীকি: (নেপথ্যে) ঐ-ঐতো জনম দুঃখিনী মা আমার, আপন মনে বিরস বদনে - বিরহ বেদনা বুকে নিয়ে কার চিন্তায় মগ্ন? এই চিন্তাময়ী রামের চিন্তা ছাড়া আর কার চিন্তাই বা করবে? আহা মায়ের আমার কি রূপ? গায়েতে পরেছে আমারই তপোবন। হ্যাঁ প্রভু রামচন্দ্র এমন সৌন্দর্যের খনি প্রিয়া প্রতিমাকে কেমন করে ভুলে আছ? হতভাগা বাল্মীকিতোমার দ্বারে উপস্থিত (বাল্মিকীর প্রবেশ)।

সীতা : কে! পিতা - আসুন আসুন পিতা, আসন গ্রহণ করুন আর এই জনম দুঃখিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম) পিতা - কি জন্য আমার পূর্ণ কুঠিরে পদার্পণ করেছেন? প্রকাশিয়া বলুন পিতা?

বাল্মীকি: মাগো আমি বড় বিপদাপন্ন হয়ে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার জন্য এসেছি তোমার দ্বারে।

সীতা : কি বললেন পিতা! কিঞ্চিৎ ভিক্ষা! আজ আমি অরণ্য চারিণী। বসনের পরিবর্তে পরেছি গাছের বাকল। আমার এমন কি ধন আছে যা আপনাকে দিতে পারি? যখন অযোদ্ধার রাণী ছিলাম তখন কত প্রার্থী আমার কাছে ভিক্ষা করতে আসত। আমি দুহাত ভরে মনের তৃপ্তি মিটিয়ে ধন বিতরণ করেছি। প্রার্থীগণ রাম সীতার জয়ধ্বনী করতে করতে বিদায় হয়েছে। আজ আমি অরণ্য চারিণী। আপনাকে দেবার মতো আমার তো কোন ধন সম্পদ নেই বাবা! আপনাকে আমি কি ধন ভিক্ষা দিব?

বাল্মীকি: মাগো তোমার যে ধন আছে সেই ধন পেলেই আমি কৃতার্থ হয়ে চলে যাব।

সীতা : উঃ পিতা! একি নিদারুণ বাণী শোনালেন আমায়। কুশিলব যে আমার একমাত্র নয়নের মনি। তিলার্ধকাল না দেখলে আমি যে স্থির থাকতে পারব না।

www.pathagar.com

পিতা-আমি আপনার দুটি পায়ে পড়ি কুশিলবকে আপনি নেবেন না, ওরা ছাড়া এই জনম দুঃখিনীর আর তো কেউ নেই। আমার কোল শুন্য করে ওদের আপনি নিয়ে যাবেন না। তাহলে আমি প্রাণে বাঁচব না।

বাল্মীকি: তাহলে কি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাব মা?

সীতা : কি করব পিতা - আমি যে নিরুপায়। ওদের আমি কিছুতেই দিতে পারব না। কিছুতেই না (প্রস্থান)।

বাল্মীকি: তাই তো এখন আমি কি করি? কুশিলবকে না পেলে রাম যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটানো কিছুতেই সম্ভব নয়। (চিন্তান্বিত)

(কুশিলবের প্রবেশ)

কুশিলব : একি মুনিঠাকুর! আপনি বিরস বদনে একা একা কি চিন্তা করছেন?

বাল্মীকি: (স্বাগত) মার তো দয়া হলো না। দেখি বালক দুটিকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যেতে পারি কি না?

(প্রকাশ্যে) ও হে কুশিলব। স্বর্গ হতে আমার একটা নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। ভাবলাম একা একা যাব তার চেয়ে দুঃখিনীর পুত্র দুটিকে সংগে করে নিয়ে যাই। মায়ের কাছে কত আকুল প্রার্থনা জানালাম কিন্তু মা কিছুতেই দিতে রাজি হল না।

কুশি : মুনিঠাকুর আমরা আপনার সঙ্গে যাব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা দুটি ভাই মায়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আসি। এসো দাদা (কুশিলবের প্রস্থান)

বাল্মীকি: জাল যখন ফেলেছি তখন মাছ ধরা পড়বেই। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়? (প্রস্থান)

(সীতা প্রবেশ)

সীতা : হ্যাঁ প্রভু রগুনাথ তুমি আজ কোথায় কত দূরে? তব অদর্শণে বিরহ বেদনা বুকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার জীবন কি শেষ হয়ে যাবে? একটিবারও কি তুমি দেখা দেবে না প্রভু? দেখা দাও, দেখা দাও, প্রভু, শুধু একটিবার দেখা দাও।

(কুশিলবের প্রবেশ)

কু+ল : মা, মাগো আমাদের প্রণাম গ্রহণ করো মা (প্রণাম)।

সীতা : উঠ, উঠ বাবা কুশিলব। তোমরা আমার কাছে এসো বাপ। কারো কথায় কারো প্ররোচনায় তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে কোথাও যেও না। তোমাদের ছেড়ে আমি যে এক দণ্ড স্থির থাকতে পারিনা।

কুশি : তা হয় না মা! আমরা যে ঐ মুণি ঠাকুরের সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে যাব।

সীতা : কুশি রে প্রানান্তেও তোদের আমি কোথাও যেতে দিতে পারব না।

কুশি : মাগো তুমি আমাদের নিষেধ কর না মা। জীবনে আমরা কোনদিন ভালমন্দ খাবার খাই নাই। আজ যখন সুযোগ পেয়েছি তখন আমরা ঐ মুণিঠাকুরের সংগে যাবই।

www.pathagar.com

সীতা : ওগো ঠাকুর, অবুঝ বালক। আজ আমি কি বলে ওদের বুঝাব। রাজার নন্দন হয়েও জীবনে কোন দিন ভাল খাবার আমি ওদের মুখে দিতে পারিনি (ক্রন্দন)।

লব : মাগো তোমাকে কিছু বলতে গেলেই তুমি শুধু কাঁদ কেন মা?

সীতা : ওরে বাপ কুশিলব, কেন যে কাঁদি সে কথা তোমাদের আমি বোঝাতে পারব না। তবে শোন, একান্তই যদি তোরা যেতে যাস-তাহলে ঐ মুনিঠাকুর কে একবার আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়। আমি দুটো কথা বলে দেই।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকি: ডাকতে হবে না মা তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন? মাত্র সপ্তাহ দিবস পরে তোমার কোলের ধন আবার আমি তোমার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

সীতা : সবই বুঝি পিতা কিন্তু প্রাণে যে ধৈর্য মানে না। এই বন মাঝে ওরা ছাড়া আমার আর কে আছে কলতে পারেন। ওরা আমার একমাত্র অন্ধের যষ্টি, নয়নের মনি। ওদের মুখের দিকে চেয়ে আমি এখনো বেঁচে আছি বাবা। কিন্তু ওদের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি তো আর প্রাণে বাঁচব না। তাই তো ওদের তিলেক দণ্ড না দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

ধুয়া : তিলেক না দেখিলে সরি রে ওরে আমার বাপধন পরাণ তোরে, তিলেক না দেখিলে ও পিতা গো ---

বোল : শোন, শোন ওগো পিতা করি নিবেদন। ধীরে ধীরে লয়ে যেও আমারি বাপধন॥ বাপধন আমার শিশু বালক দণ্ডে দণ্ডে খান। ছেড়ে গেলে অভাগিনীর না রবে জীবন। (পতন)

ও পিতা গো -------------------

কুন্দল : মা মাগো তুমি যদি এমনিভাবে চোখের জলে প্লাবিত হও তাহলে তো আমরা মুণিঠাকুরের সঙ্গে গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারব না। তার চেয়ে তুমি আমাদের হাসি মুখে বিদায় কর মা।

সীতা : বাবা কুশিলব - প্রাণে যে ধৈয মানে না। তবু আমি বলছি তোমার যাও। পিতা কর্তব্যের অনুরোধে আমার ক্ষণিধী পুত্র দুটিকে আপনার হাতে সমর্পন করলাম। আপনি এদের দেখবেন।

বাল্মীকি : কোন চিন্তা করো না মা। কুশিলব যেমন তোমার দুটি পুত্র আমিও তো তেমনি তোমার একটি পুত্র মা। তুমি হাসিমুখে এদের বিদায় কর মা। আমি থাকতে তোমার পুত্রদ্বয়ের কোন কষ্ট হবে না। যাও বৎস কুশিলব বিদায় বেলা মাকে প্রণাম করে এসো।

লব : কুশি এসো যাবার বেলায় মাকে প্রণাম করে যাই। (গীত)

(প্রণাম তোমার) করুনাময়ী প্রণাম তোমারে আমি তোমারে প্রণমি, ওগো মা জননী, তোমারে প্রণমি আমি ॥

ছেড়ে যেতে মন মোর চায় না তোমায়

www.pathagar.com

বুক ভেঙ্গে যায় মা দারুণ ব্যথায়। শুন গো জননী বলি যে তোমায় ভাসিও না আর আখি নীরে ॥

বাল্মীকি : এসো বৎস কুশিলব। তোমরা আমার সঙ্গে এস। মাগো তুমি কোন চিন্তা করো না মা সপ্তাহ কাল পরে তোমার কোলের ধন আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

কু + ল : তাহলে আমরা আসি মা। চলুন মুণি ঠাকুর।

বাল্মীকি: চলো (ধীরে ধীরে প্রস্থান) বিদায় মাগো।

সীতা : ওগো প্রভু, তোমার ধন তোমার নামেই পিতার সমর্পণ করলাম। তুমি ওদের দেখ প্রভু, তুমি ওদের দেখ। (প্রস্থান)

(বাল্মীকি ও কুশিলবের প্রবেশ)

বাল্মীকি: বৎস কুশিলব। তোমরা তো আমার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে চলেছ। কিন্তু সেখানে তো কোন অদীক্ষিত লোকের যাওয়া চলবে না। তোমাদের কি দীক্ষা-শিক্ষা কিছু হয়েছে।

কুশি : দাদা, দিক্ষা শিক্ষা সে আবার কী জিনিস?

লব : ভাই, কুশির দিক্ষা হচ্ছে গুরুমন্ত্র। দিক্ষা-শিক্ষা না নিলে মনের পবিত্রতা আসে না। মুণি ঠাকুর আমাদের শিক্ষা দীক্ষা কিছুই হয় নাই। আপনি আমাদের দীক্ষা শিক্ষা দেন?

বাল্মীকি: আচ্ছা তাই হবে। তোমরা ওই সরজ হতে স্নান করে এস। আমি তোমাদের দীক্ষা শিক্ষা প্রদান করব।

কু + ল : ঠিক আছে। আপনি তিষ্ঠ ক্ষণ কাল। আমরা ঐ হতে স্নান করে আসি। (প্রস্থান)

বাল্মীকি: হে সূর্যকুল চূড়া রাখবন্দ্রে রাম। বাল্মীকি কী উপেক্ষা করা স্বয়ং ত্রিদেবেত্ত শক্তি নেই। এইবার তোমাই আস্ত্রে তোমাই পতন অনিবার্য।

(কুশিলবের প্রবেশ)

মুণিঠাকুর। এইতো আমরা স্নান করে এসেছি। এখন আমাদের কী করতে হবে তাই বলুন।

বাল্মীকি: কিছুই করতে হবে না। তোমরা এখানে বসো। আমি তোদের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করি।

(মন্ত্র প্রদান)

আচ্ছা কুশিলব তোমাদের কি কোন অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা আছে?

লব : না, মুণিঠাকুর। আমাদের তো কোন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা নেই। আপনি আমাদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাও দিন। বাল্মিকী: হা, হা, তাই দেব। তিষ্টক্ষণকাল কুশি এই নাও কোদণ্ড। আর এই নাও কৌশিক বাণ এবং অক্ষর তুন পরে দেব তোমার তুন হতে কোন দিন বাণ ফুরাবে না। লব, এই নাও কোদণ্ড। আর এই নাও মোহবাণ।

www.pathagar.com

আচ্ছা বৎস কুশিলব। আমি তো তোমাদের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করলাম এবং অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দিলাম। এখন সম্পর্কে আমি তোদের কী হলাম।

কু + ল : সম্পর্কে আপনি আমাদের গুরুদেব হলেন। গুরুদেব আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

বাল্মিকী: আচ্ছা ব্যস, কুশিলব। আমি যদি তোমাদের গুরু হলেম তাহলে গুরুকে কিঞ্চিৎ গুরু দক্ষিণা প্রদান করতে হয়।

লব : গুরুদেব। আমরা এই বনের মাঝে ফলে-মুলে জটা বাকলে জীবন-যাপন করছি। ধন-দৌলত টাকা পয়সা কিছুই তো আমাদের সঙ্গে নেই। আমরা কেমন করে আপনার গুরু দক্ষিণা দেব।

বাল্মীকি: তা বললে কি হয় কুশিলব? তোমরা যদি আজ গুরুকে গুরু দক্ষিণা না কর তাহলে এই ত্রি জগতে কেউ কোনদিন কারো গুরুকে গুরু দক্ষিণা করবে না। তাই বলছি কুশিলব এই বনমাঝে কত যোগি, ঋষি, মুণি তপস্যি আছেন তোমরা তাদের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করে এনে আমার গুরু দক্ষিণা দাও।

কুশি + লব : গুরু দেব আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি কিঞ্চিৎ ভিক্ষা পাই কি না। হে সাধু বৈষ্ণবগণ, আজ আমরা বড় বিপদাপন্ন হয়ে আপনাদের কাছে এসেছি আমাদের কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করুন। আমরা গুরুকে গুরু দক্ষিণা করব। (গীত) (থালা দিতে হবে)

আমায় ভিক্ষা দাও হে বনবাসি ॥ পাবে গঙ্গা গয়া কাশি ॥ শ্রী গুরুর দক্ষিণার লাগি ॥

কুশি + লব : গুরুদেব। এই নিন আপনার গুরু দক্ষিণা।

বাল্মিকী: বৎস কুশিলব। তোমাদের গুরু দক্ষিণায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু কুশিলব। আমি তোমাদের এনেছি কেন তা কি জান?

কুশি : না বললে জানব কেমন করে।

বাল্মিকী: তবে শোন। আমার এই তপোবন তোমাদের রক্ষা করতে হবে।

কুশি : কেমন করে রক্ষা করব গুরুদেব।

বাল্মিকী: আচ্ছা এই বনে যদি কোন অশ্ব আসে তাহলে তোমরা কী করবে?

কুশি : কি আর করব? ইচ্ছা মতো খেয়ে চলে যাবে।

বাল্মিকী: উহু- তাহলে আমার বন রক্ষা করা হলো কে?

লব : তাহলে আমরা কী করব গুরু দেব?

বাল্মিকী: তোমরা দুভাই সেই অশ্বটিকে বন্দন করবে।

কুশি : কী দিয়ে বন্দন করব?

বাল্মিকী: গজ শূণ্য লতা, পাশে করিবে বন্দন।

কুশি : যদি অশ্ব বন্দন না মানে।

বাল্মিকী: তাহলে মা সীতার দোহাই দিয়ে অশ্ব বন্দন করবে। তবেই দেখবে অশ্ব বন্দন মেনেছে। আচ্ছা কুশিলব আর একটি কথা। তোমাদের দুই ভাইয়ের নিকট যদি কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তখন তোমরা কী করবে।

www.pathagar.com

কুশি : কেন? আমাদের পরিচয় দেব।

বাল্মিকী: এই এখানে একটু মিথ্যা কথা বলতে হবে, বলবে মায়ের নামটি মা আমাদের ভবে পিতা কেহ নাই। মুণির বর পুত্র আমরা দুটি ভাই, কেমন, পারবে তো?

কুশি : নিশ্চয়ই পারব গুরুদেব।

লব : আমি পারব না গুরুদেব।

বাল্মিকী: কেন পারবে না লব।

লব : মিথ্যা কথা বলতে গেলে আমার জিহ্বা জড়ো হয়ে আসে গুরুদেব। মুখ দিয়ে শব্দ উচ্চারণ হয় না। সারাজনম দুঃখে কাটাব, তবু আমি মিথ্যা কথা বলতে পারব না।

কুশি : আমি একা বললে হবে না গুরুদেব।

বাল্মিকী: তা হবে। শোন, কুশি যদি কেউ তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তাহলে শুধু তুমিই বলবে। আর বৎস লব, তুমি কিন্তু নিরব থাকবে। প্রাণান্তেও পরিচয় দেবে না। খুব সাবধানে থেকো কুশিলব। খুব সাবধানে এখন আমি চিত্র কুট পর্বতে তপস্যায় গমন করলাম, খুব সাবধান, খুশি। আসল পরিচয় কাউকে দেবে না। (প্রস্থান)

কুশি : দাদা এসো আমরা একটু খেলা করি। (লতা লাগবে)

লব : তবে তাই এসো ভাই। (যুদ্ধ) (অশ্বের প্রবেশ)

কুশি : দাদা, দাদা দেখ, অব্যর্থ গুরুর বাক্য। দেখিতে দেখিতে মনোরম এক তুরঙ্গ এসে প্রবেশিল মুণির তপবনে। রঙ্গিত বিশাল বপু বিবিধ বরণে। মনে হয় বহু ভাগ্যবান হবে এই অশ্ব অধিকারী। এসো গুরু আজ্ঞা মতে বন্দন করিয়ে এই অশ্ব রেখে দেই বৃক্ষ তলে।

লব : অশ্ব ভালো জয়পত্র লেখা আছে। পড়ে দেখ তো কী লিখেছে জয়পানে।

কুশি : শ্রী রাম, লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন। চার ভাই যজ্ঞ করে অযোদ্ধা ভুবন। যে জন রামকে করিবে ভজন অশ্বসহ আসিবে শত্রুঘ্ন সন ॥ যে জন রামকে করিবে অহংকার। অশ্ব বাধিয়া যুদ্ধ করিবে সত্তর ॥ অহংকারে লিখিলাম পত্র অখিলের পতি। অশ্ব বাঁধিবে যার মাতা হয় সতী ॥ সতী মায়ের পুত্র হলে অশ্বকে বাঁধিবে। আর অসতীর পুত্র হলে অশ্ব ছেড়ে দিবে ॥ এই অশ্ব বাঁধতে নেইকো কারো বাধা। বাঁধতে পেরে যে না বাঁধে তার বাপ গাধা ॥ আমরাই তো সতী মায়ের পুত্র।

লব : ভাইরে কুশি, খরিতেছে তীব্র বিষ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে, জগতের ক্ষত্রিয় নিকটে। করি হেয় জ্ঞান, গর্ব ভরে জয়পত্র প্রচার করেছে রাম। পৃথিবীর সতীপুত্র তারা চারভাই, আর বুঝি সতীপুত্র ত্রিজগতে নাই। দিতে হবে রামকে দণ্ড সমুচিত। ধরি এই অশ্ব রাখিব কৃতার্থ ভুবন মাঝারে। অশ্বটিকে বন্দন কর।

কুশি : কী দিয়ে বন্দন করব।

লব : গুরু আজ্ঞা মতে গজ শূণ্য লতা, পাশে করহ বন্দন। (অশ্ব বন্দনের চেষ্টা)

কুশ : দাদা পুনঃ পুনঃ বন্দন করছি, তবু অশ্ব বন্দন মানছে না।

www.pathagar.com

লব : মা সীতার দোহাই দিয়ে বন্দনা কর। দেখবে অশ্ব নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে।

কুশি : ঠিক আছে, তাই করছি। শুন শুন অশ্ব আমি বলি তব ঠাই। লতার বাধন ছেড় যদি মা সীতার দোহাই। দোহাই মা সীতা (৩) (অশ্ব বন্দন)
দেখেছ ভাই, যখনি আমাদের মায়ের নাম নিয়ে বন্দনা করেছি, অমনি অশ্বটি দুচোখের জ্বল ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের মায়ের নামের কত গুণ।

লব : মায়ের মহিমা দাদা জান নাকি তুমি? চার বেদে মাকে বলে ব্রহ্মা সনাতনী। মা আমাদের আদ্দা শক্তি, জগৎ জননী। জগতের সফল শক্তির আধার। অশ্ব থাক এই স্থানে। দেখি তোমার প্রভু কে আসে। চলো। (সকলের প্রস্থান)
(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র : একি দেখিতে দেখিতে অশ্বটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কি করি, কোন দিকে যাই, কোথায় সন্ধান করি। (অশ্ব দেখিয়া) না না ঐ তো অশ্বটি লতায় পাতায় জড়িয়ে আছে। আচ্ছা আমি অশ্বটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।
(অশ্ব ছাড়াইতে গেল)

কুশি : (নেপথ্যে) : দাদা, দাদা, ঐ দেখ, অশ্বটিকে কে যেন ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটি বাণ মেরে ওকে আমি সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেই। এই দেখ দর্পি এক বাণে তোকে আমি সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দেই। (বাণ মারিল)

সুমন্ত্র : উ. কেরে তুই, অতর্কিত আমাকে বাণ নিক্ষেপ করলি? কোথায় ছোট রাজ একবার এসে দেখে যাও। আততায়ীর শরাঘাতে আমার আজ কি অবস্থা হয়েছে।

(শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন : একি সুমন্ত্র! কে তোমার এমন অবস্থা করলে?

সুমন্ত্র : ছোট রাজ ঐ দেখুন, বৃক্ষমূলে বালক যুগল। ওরাই অতর্কিতে আড়াল থেকে আমাকে বাণ মেরেছে।

শত্রুঘ্ন : কি? এত বড় দুঃসাহস? রে দুর্মতি বালকদ্বয় সাধ্য থাকে সম্মুখসংগ্রামে এগিয়ে আয়। পালিয়ে থেকে আঘাত করা উচিতও না হয়। সম্মুখযুদ্ধে এসে দে রে বীরের পরিচয়।

কুশি : (নেপথ্যে) শুনেছ ভাই! কোথা থেকে এক বীর এসে আমাদের কটূক্তি করছে। চল ভাই, আমরা ওকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসি।
(লব ও কুশির প্রবেশ)

শত্রুঘ্ন : এ্যা, এ আমি কি দর্শন করছি সুমন্ত্র?

সুমন্ত্র : কি দর্শন করছেন ছোটরাজ?

শত্রুঘ্ন : এ যে অবিকল রামের মূর্তি। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো সুমন্ত্র। ওরে বালকদ্বয়। তোরা কি রামের ------
না, না, এ আমি কি বলছি। ওরে বালকদ্বয় তোদের সত্য পরিচয় দে।

কুশি : আমার নাম কুশি।

লব : আমার নাম লব।

শত্রুঘ্ন : তোদের নাম তো শুনলাম। তোদের পিতা মাতার পরিচয় দে।

www.pathagar.com

কুশি : মায়ের নামটি মা আমাদের। ভবে পিতা কেহ নাই। মুণির বরদ্বয় পুত্র আমরা দুটি ভাই।

শত্রুঘ্ন : তোদের পিতার নাম কী?

কুশি : যুদ্ধ করতে এসে অত পরিচয়ের প্রয়োজন কি? অত পরিচয় আমরা দিতে পারব না। তোমাদের অশ্ব বন্দন করেছি। এখন যুদ্ধ করবে এসো।

শত্রুঘ্ন : ওরে বালকদ্বয়! কেন যে পরিচয় জানতে চাইছি তা তোরা বুঝবি না।

কুশি : ঐ বীরের প্রাণে এখন ভয় এসে গেছে।

শত্রুঘ্ন : কী বলছ বালকদ্বয়? আমাকে বিদ্রুপ করছ? আমার বীরত্বের পরিচয় তোমরা কি জান? শৈশবে খেলিবার বাটুল দ্বারা লবণ দৈত্যকে আমি স্বহস্তে সংহার করে ছিলাম। কারো বিদ্রুপ সহ্য না হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে বীরত্বের পরিচয় দাও।

শত্রুঘ্ন : রে বালকদ্বয়। একান্তই যখন তোদের মরবার সাধ। আয় দেখি তোদের বাহুতে কত শক্তি।

কুশি : এসো তবে। (যুদ্ধ) (শত্রুঘ্নের পরাজয়)

শত্রুঘ্ন : আঃ ওরে বালকদ্বয়। পারলাম না, পারলাম না, তোদের ঐ কোমল অঙ্গে আঘাত করতে। সুমন্ত্র তোমার কাছে আমার শেষ মিনতি। আমার দাদাকে গিয়ে বল, তোমার শত্রুঘ্ন দুটি বালক করে নিহত হয়েছে। আঃ

সুমন্ত্র : আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য।

(শত্রুঘ্নকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

কুশি : প্রথম যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হয়েছে, এসো আমরা একটু কোলাকুলি করি।

লব : তাই এসো। (কোলাকুলি)

চল এখন আমরা আমাদের মায়ের কাছে যাই। অশ্বটিকে নিয়ে চল।

কুশি : অশ্ব, চলো আমাদের সঙ্গে। (উভয়ের প্রস্থান)

(রামের প্রবেশ)

রাম : ভাই শত্রুঘ্ন গিয়েছে দিক জিন্তে, এখনও কোন শুভ সংবাদ পাইনি জানিতে। তাই প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

(দ্রুত সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র : মহারাজ, মহারাজ, বড় সর্বনাশ হয়েছে।

রাম : কী সর্বনাশ হয়েছে সুমন্ত্র!

সুমন্ত্র : আপনার প্রিয় ভাই শত্রুঘ্ন।

রাম : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার প্রিয় ভাই শত্রুঘ্ন।

সুমন্ত্র : দুটি বালক করে চিরতরে লয়েছে বিদায়।

রাম : উঃ একি শুনি অগ্নি দগ্ধ জলন্ত শলাকা। হিমাদ্রির চুর্ণ চূড়া, নিভে গেল নিভে গেল, রবি শশি, গ্রহ, তারার দল, আঁধারে আঁধারে ডুবিল বিশ্ব, দৃশ্যে নাহি হেরী কিছু আর। উঃ প্রাণের ভাই শত্রুঘ্ন, আজ আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোন অচিন দেশে চলে গেলি ভাই। সুমন্ত্ররে ভাই শোকের জ্বালা আমি যে আর

www.pathagar.com

সইতে পারছি না, মনে হচ্ছে প্রাণ প্রিয় ভাইয়ের মর্মভেদী হাহাকার যেন শুনি দিকে দিকে। ছাই চাপা আগুনের মতো জ্বলে থেকে থেকে। কাটিলে কদলী যেমন ধুলাতে লুটায়, তেমনি মতে ভাইরে আমার গড়াগড়ি যায়। সুমন্ত্র সহিতে না পারি আমি ভাই শোকের জ্বালা। এতদিনে ফুরাইল অযোদ্ধারী আশা। সীতা গেলে সীতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে, গুণের ভাই হারিয়ে গেলে আমি ভাই বলিব কারে।

সুমন্ত্র : প্রভু ধৈর্য ধরুন। পাষাণে বুকটাকে বাঁধতে হবে। নইলে যে অযোদ্ধার বুকে দাবাগ্নি জ্বলে উঠবে।

রাম : ওরে সুমন্ত্র, আমি কেমন করে সইব এই ভাই শোকের জ্বালা। বলেছে বলতো ওরে সুমন্ত্র, কোথায় গেলে আমার ভাই কে পাব?

(লক্ষণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ : হে আর্য, কেন হেরী তব বিষণ্ন বদন। কেনই বা আখিতে তব অশ্রুধারা, বুঝিতে না পারি ধরি পদে। ত্যাজ শোক, মোহ আখিজল। তব বিন্দু মাত্র নয়ন অশ্রু শত শত শেল সম বক্ষে বেধে মোর। হে আর্য, বীর গতি লভিয়াছে ভাই শত্রুঘ্ন, বৃথা শোক কেন তাহার কারণ। দাও অনুমতি নিমিষে বধি সেই দূরন্ত বালকে। ভ্রাত্রি হত্যার প্রতিশোধ করিব গ্রহণ। সঙ্গে নেব অগ্রজ ভরতে। ভ্রাতি হত্যার প্রতিশোধ করিব গ্রহণ। সংগে নেব অগ্রজ ভরতে। অনুমতি দাও দাদা অরাতি নাশিতে।

রাম : শুনিব না বারণ তব। নিমিষে বধে সমুচিত শিক্ষা দেব সেই দুরন্ত বালকে। চল সুমন্ত্র সেই সমর প্রাঙ্গনে। উল্কার মতো ছুটে যাই, দাবাগ্নির মতো জ্বলে উঠি দেখি বালকের ভুজবলে কত শক্তি।

সুমন্ত্র : চলুন সেই মুনির তপবনে, যেথায় আছে চির নিদিত বীর শত্রুগনে।

(সুমন্ত্র লক্ষণের প্রস্থান)

রাম : হায়! হায়! তখন মারতি বার বার বলেছিল, এই যঙ্গের পল যে শুভ হয়, তা মনে হয় না। আমার সেই প্রিয় ভক্ত মারতির কথা আমি অবহেলা করেছি। জানিনা কি আছে আমার অদৃষ্টে। (প্রস্থান)

(কুশিলবের প্রবেশ)

কুশি : এস আমরা একটু খেলা করি। তুমি একটি বাণ ছোড় আমি ঠেকাই আর আমি একটি বাণ ছুড়ি তুমি ঠেকাও।

লব : ঠিক আছে। তাই এস। (যুদ্ধ)

(সুমন্ত্র ও লক্ষণ নেপথ্যে)

সুমন্ত্র : ঐ দেখুন ঠাকুর, সেই বালকযুগল খেলা করছে।

লক্ষ্মণ : এ আমি কি দর্শন করছি। এসো রাম রুপের প্রতিচ্ছবি। অযোদ্ধায় বসে আছে এক রাম, আর এই মুণির তপোবনে দেখছি দুই রাম। ঠিক আছে। আমি বালকদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করব। (প্রবেশ) ওহে বালকদ্বয় তোমাদের নাম কী?

www.pathagar.com

কুশি : আমার নাম কুশি।

লব : আমার নাম লব।

লক্ষ্মণ : ওরে বালকদ্বয়, এই বনে তোদের পিতা মাতা কে কে আছে? আমাদের কাছে সত্য পরিচয় দে।

কুশি : মায়ের নামটি মা আমাদের ভবে পিতা কেহ নাই, মুনির বরদ্বয় পুত্র আমরা দুটি ভাই।

লক্ষ্মণ : মিথ্যা প্রবঞ্চনা করো না বালক। সূর্য পাংশু জালে আচ্ছাদিত হলেও তার রূপজ্যোতি ফুটে ফুটে বেরোয়। তেমনি উভঝুটি আর গেরুয়া বসন পরলেও জনম দুঃখিনীর রূপের আভা তোদের অঙ্গ হতে ফুটে বেরোচ্ছে। তাই বলছি সত্য করে বল, এই বনে তোদের পিতা মাতা কে কোথায় আছে?
(সুর : রাম কে চেন)

ধুয়া : ঐ ও কে আছে রে এই ও কে আছে -----------------বেল : পরিচয় দে, রে বালক তোদের, দে রে পরিচয়। নিয়ে যারে যজ্ঞের অশ্ব, তোদের যদি হয় ॥ অযোদ্ধার রাম বুঝি, তোদের হবে পিতা। মা জননী হবে বুঝি, জনম দুঃখী সীতা ॥
পঞ্চ মাসের রেখে ছিলাম, এই বনো মাঝে ॥
সেই উদরে জন্ম নিছিস তোরা দুটি ভাই। কোলে করে তোদের নিয়ে অযোদ্ধাতে
যাই ॥
ওরে বালকদ্বয়, তোরা একটি বার আমার কোলে আয়।

(লবকে কোলে করিল)

কুশি : নেমে এস। কোলে যেতে হয় কুশি যাবে। যুদ্ধ করতে হয় কুশি করবে। (লবকে টানিয়া লইয়া গেল)

লব : মা যে লক্ষণের নাম নিয়ে দণ্ডে দশবার কেঁদে থাকে - আমার মন বলছে এ নিশ্চয়ই সেই লক্ষণ।

লক্ষ্মণ : বালকদ্বয় তোমরা চুপি চুপি কী পরামর্শ করছ।

কুশি : পরামর্শ করছি, কী করে তোমাকে হত্যা করা যায়।

লক্ষ্মণ : আমাকে তো হত্যা করবে কিন্তু জান আমি কে?

কুশি : বিশেষ করে জনি। কুম্ভকর্ণ নয়কো মোরা নিদ্রাতে আকুল। সুর্পণখা নয়কো মোরা কাটবে নাক চুল।

লক্ষ্মণ : স্বাগতম আশ্চর্য। এই বালকদ্বয় কি করে জানলো আমি কুম্ভকর্ণকে হত্যা করেছি এবং সুর্পণখার নাক চুল কেটেছি। নিশ্চয় মা জানকী কুটিরে বসে আমার কীর্তি কাহিনী গান করে।

কুশি : বলি ও লক্ষ্মণ রাজা, তুমি কেমন ধারা বীর যুদ্ধ ভয়ে ভীত হয়ে কাকতি মিনতি করছ। তুমি তো ক্ষত্রিয় সন্তান নও।

লক্ষ্মণ : কি বললে, আমি ক্ষত্রিয় সন্তান নই। ক্ষত্রিয়ের রীতি নীতি তোমরা কি জান?

www.pathagar.com

কুশি : বিলক্ষণ জানি। ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধ দেখে ভয় করে যে জন, শাস্ত্রেতে লেখা আছে সে বেজন্নায় লক্ষণ।

লক্ষ্মণ : স্তব্ধ হও দুর্মতি বালক। হীন বাক্য নাহি কর পুনঃ উচ্চারণ। জীবনের ধ্রুবতারা জননী আমার। স্বর্গাদপী গরীয়সী সে দেবী প্রতিমা। কর যদি তার নিন্দাবাদ রাম আত্মজ বলে করিব না ক্ষমা। ঐ হীন বাক্য উচ্চারিবে যে রসনা হতে সে রসনা ছিড়িয়া নখাঘাতে, বাক শক্তি চিরতরে স্তব্ধ করিব তোমার।

কুশি : চুপ কর কাপুরুষ, সিংহ শিশু দোহে মোরা। শত শত শৃগালের নাহি করি ভয়। এস রণে পাঠাই নরকে।

লক্ষ্মণ : ওরে বালক, এতই কি তোদের মরণের সাধ? স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিবি জলন্ত পাবকে।

কুশি : ইষ্ট নাম স্মরণ কর রাজা। যম তোমার সম্মুখে এসে দাড়িয়েছে। (বাণ মারিতে উদ্ধত)

লব : (বাধা দিয়া) তুমি লক্ষ্মণকে বাণ মেরো না। আমার মন যে থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে। ঐ লক্ষণ বুঝি আমাদের কোন আত্মীয় হবে।

কুশি : তুমি ভুল বুঝছ। মা যে লক্ষণের নাম নিয়ে কাঁদে, এ লক্ষণের সে লক্ষণ নয়।

লক্ষ্মণ: রে বালকদ্বয়! তোরা এখন যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দিয়ে তোদের মায়ের কোলে ফিরে যা। আমি বুঝতে পারছি রণ ভয়ে ভীত হয়েছিস তোরা।

কুশি : কি বললে রণভয়ে ভীত মোরা? তবে আর রক্ষা নাই। এই বার নির্বাপিত হবে তোমার জীবন প্রদীপ।

লক্ষ্মণ : উত্তম, দেখা যাক কার বাহুতে কত শক্তি।

(যুদ্ধ এবং লক্ষণের হাত হইতে বাণ পড়িয়া গেল)

লক্ষ্মণ : ওরে বালকদ্বয় পারলাম না, পারলাম না। তোদের কোমল অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে। ওরে তোরা একবার আমার বক্ষে আয়।

লব : (লব কুশিকে ধরিয়া) লক্ষ্মণকে আর মেরো না। তুমি যুদ্ধ বন্ধ কর। আমি একবার লক্ষ্মণের কোলে উঠি।

লক্ষ্মণ : আয়, আয়রে বালক, তোকে আমার বক্ষে ধারণ করে আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি। (লবকে কোলে করিল)

কুশি : নেমে এস। কোলে যেতে হয় কুশি যাবে, যুদ্ধ করতে হয় কুশি করবে। (লবকে ধরিল)

লক্ষ্মণ : ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রে কুশি। লবকে ছেড়ে দে! ওকে কোলে নিয়ে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি।

কুশি : সেটি হচ্ছে না লক্ষ্মণ বীর। আমাদেরকে মায়ায় মোহিত করে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে সেটি হচ্ছে না। আজ তোমার শেষ দিন।

লক্ষ্মণ : কুশিরে আমি যে শক্তিহীন। কেমন করে তব অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করি। তুই আর কটূবাক্য প্রয়োগ করিস না। তুই তো জানিস না কুশি। আমি লক্ষ্মণ বীর। আমার একটি বাণ সইবার মতো ক্ষমতা ত্রি জগতে কারুর নেই।

www.pathagar.com

কুশি : ওগো লক্ষ্মণ রাজা, তুমি যে একজন বীর সেটা আমরা কেমন করে বুঝব? যখনি আমরা বাণ মারি ভয়ে জড়মড় হয়ে বাণ ছেড়ে দিতে কাকতি মিনতি কর। যুদ্ধে এসে মিত্রতার ভাব দেখান কাপুরুষের লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ : রে দুর্তি বালক, ক্ষত্রিয় সন্তান আমি, হয় যদি প্রয়োজন প্রাণ দিব সমর প্রাঙ্গণে এস যুদ্ধে, হয় মরি, না হয় মারি।

কুশি : লক্ষ্মণ রাজার প্রথম কথাটি সত্য। আজ তোমার শেষ দিন। {উভয়ের যুদ্ধ লক্ষ্মণের হাতি হতে পুনরায় বাণ পড়ে হব}

লক্ষ্মণ : না, না, আমি পারব না। তোদের অঙ্গে আমি বাণ নিক্ষেপ করতে পারব না। যদি তোরা জনম দুঃখির পুত্র হয়ে থাকিস, তোদের ক্রোধে মাকে আমি কি জবাব দেব।

কুশি : ওগো লক্ষ্মণ রাজা, সমর প্রাঙ্গনে এসে বার বার অস্ত্র পরিত্যাগ না করে প্রাণ নিয়ে দেশে পালিয়ে যাও যদি অন্য কোন বীর থাকে তাকে পাঠিয়ে দেও।

লক্ষ্মণ : রে দুর্মতি বালক, হীন বাক্য না কর উচ্চারণ ক্ষত্রিয় সন্তান আমি পরাজয়ের গ্লানি মেখে কভু ফিরিতে না পারি। (ধনুর্বাণ ধরিয়া) আয় তবে দুর্মতি বালক যে রসনা হতে হীন বাক্য করিলি উচ্চারণ সেই রসনা ছিড়িয়া নখাঘাতে বাকশক্তি চিরতরে স্তব্ধ করিব তোমার।

কুশি : তাই এস লক্ষ্মণ রাজা, দেখি সতী মায়ের পুত্রের বাহুতে কত শক্তি। (উভয়ের যুদ্ধ কিছুক্ষণ পর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত বধের বাণ হাতে লইয়া)

লক্ষ্মণ : রে দুর্মতি বালক। এই বার ধনুকে জুড়িলাম আমি, যে বাণে বধে ছিলাম বীর ইন্দ্রজিতে। (বাণ দেখিয়া লবকুশি ভয় পাইয়া মা সীতাকে ডাকিতে লাগল)

কু + ল : কোথায় মাসীতা রক্ষা কর, রক্ষা কর। লক্ষ্মণ ঠাকুরের হাতে আজ বুঝি আমাদের প্রাণ যায়।

লক্ষ্মণ : ওহে বালকদ্বয়, কি বাণি শুনালি কর্ণে, পোড়া শেল সম বিধিল অন্তরে, না না, আর আমি যুদ্ধ করিব না। এই আমি ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করলাম। (ধনুর্বাণ পরিত্যাগ)

যে মাকে উদ্ধার করিবার জন্য রাবনের বিশাল শক্তি শেল বক্ষে ধারণ করে ছিলাম চৌদ্দ বৎসর অনাহার, অনিদ্রায় বনবাস যাপন করে ছিলাম আজ কেমন করে তারই পুত্রদ্বয়ের বক্ষে আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ব করি। ওরে বালকদ্বয়, এই আমি শরাসন পরিত্যাগ করলাম। তোরা এই মূহুর্তে আমার বক্ষ্য সন্ধান কর। আমার কলঙ্কিত জীবনের হউক অবসান। আয়, আয়, ওরে মাতৃভক্ত বালক, এই আমি বক্ষ বিস্তার করে দিচ্ছি।

কুশি : তবে তাই হোক লক্ষ্মণ রাজা। (বাণ মারিতে উদ্ধত)

লব : (বাধা দিয়ে) লক্ষ্মণকে তুমি মের না দাদা।

কুশি : তুমি সরে যাও যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ করতেই হবে। এইবার, এইবার ইষ্ট নাম স্বরণ কর লক্ষ্মণ রাজা। (বাণ মারিল)

লক্ষ্মণ : আঃ বিদায়, বিদায়, দাদা আমি পারলাম না। সুমন্ত্র কোথায়? সুমন্ত্র।

(দ্রুত সুমন্ত্রের প্রবেশ)

www.pathagar.com

সুমন্ত্র : একি ঠাকুর আপনার একি মর্মান্তিক দৃশ্য?

লক্ষ্মণ : সুমন্ত্ররে, পারলাম না, পারলাম না সুমন্ত্র। শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।

সুমন্ত্র : ঠাকুর, অযোদ্ধায় গিয়ে আমি মহারাজের নিকট কেমন করে এই নিদারুণ সংবাদ দিব।

লক্ষ্মণ : সুমন্ত্ররে বিধির বিধান তো কেউ রোধ করতে পারে না। আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই ঘটেছে। আমি যে আর দাড়াতে পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে একটু শুইয়ে দেও।

সুমন্ত্র : চলুন ঠাকুর সামনের ঐ গাছটার নিচে আপনাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

লক্ষ্মণ : তাই চল; সুমন্ত্র তাই চল, (উভয়ের প্রস্থান)।

{রামের প্রবেশ}

রাম : ঘোর ভয়ংকর রজনি। আকাশের গায়ে তারা নবকুল কুসুম সম দুলিতেছে। কি বা মনোহর। কি বা মাধুরিরে দূর্বা দলে সবিতেছে শিশিরের কণা। সন সন বহিতেছে সমীরণ। নিস্তব্দ প্রকৃতি চোখে মোর ঘুম নেই সীতার লাগি। রে অযোদ্ধা সীতার অভিশাপে বুঝি ডুবে যাবে ঐ ভূগর্ভ মাঝারে।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র : (প্রবেশ করিয়া নত মস্তকে দাড়ায় রহিল কুশি)

রাম : একি! একি সুমন্ত্র, তুমি অবনত মস্তকে দাড়িয়ে আছ কেন সুমন্ত্র? বল, বল সুমন্ত্র, যুদ্ধের সংবাদ বল।

সুমন্ত্র : দয়াময় সেই নিদারুণ সংবাদ আমি কেমন করে বলব।

রাম : ওরে সুমন্ত্ররে আর কিছু হবে না। বলিতে বুঝিয়াছি সব। এতদিনে অযোদ্ধ্যার সুখ সূর্য গেল অস্তাচলে। খিরিল অম্বরতল ঘনঘটা গনে। দেব সম ভাই মোর একে একে দিব্যধামে করিল গমন। একা আমি এই রাজপুরী মাঝে। আজ আমার কেহ নাই। ওরে সুমন্ত্র - তুই কি বলতে পারিস, আজ আমি কি নিয়ে এই অযোদ্ধায় পড়ে থাকব। সীতা নেই, জোড়ের ভাই সব একে একে আমার হারিয়ে গেলে সে ভাইকে তিলার্ধকাল না দেখলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার কাছে শুন্য বলে মনে হয়। সেই ভাই আজ আমার জন্মের মতো হারিয়ে গেল। ওরে সুমন্ত্র, কেমন করে আমি এই ভাই শোকের জ্বালা সহ্য করব।

সুমন্ত্র : প্রভু আপনি এই অযোদ্ধার অধিশ্বর। আপনার এই দুর্বলতা সাজে না। রাজ্য রক্ষার্থে এবং প্রজা লালনার্থে আর বুকটাকে পাষাণে বাধতে হবে। ভাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।

রাম : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুমন্ত্র, আমি ভাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেব। আমি যুদ্ধে যাব। তুমি মারতিকে গিয়ে বল সে যেন রাজা গোবর্ধনকে যুদ্ধে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে আস।

সুমন্ত্র : যথা আদেশ তব (প্রতিস্থান)।

রাম : রে দুর্মতি বালকদ্বয়, একে একে মোর তিনটি ভাইকে করিল সংহার। এইবার আমি দেখব তোদের অস্ত্রে কত ধার (প্রস্থান) ।

www.pathagar.com

(সারতির প্রবেশ)

সারতি : ঐ ঐ বুঝি সুর নলের বেড়া, ঐ বুঝি হবে সেই চণ্ডাল পাড়া, প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন, রাজা গোবর্ধনকে নিমন্ত্রণ করতে কিন্তু সেই চণ্ডাল জোর দর্শনতা আমি কোথাও পাচ্ছি না। ঠিক আছে ঐ যে একটা লোক এইদিকে আসছে। আমি থাকব এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি ঐ লোকটার নিকট গুহক চণ্ডালের সন্ধান মেলে কি না।

(চণ্ডালের প্রবেশ)

চণ্ডাল : আজ অনেক দিন হলো রাম মিতা আমাকে মনে করে না। আরে ওকে হাও না! সেই রকমতে মনে
হচ্ছে ওরে, ও ধনা, এদিকে আয়; দেখে যা কে এসেছে।

{(ধনার প্রবেশ) কিছু খাবার সহ}

ধনা : রাজজি কে এসেছে।

চণ্ডাল : ঐ দেখ কে এসেছে। আমার মনে হয় ওর পিছে পিছে আমার রাম মিতাও আসছে। তোরা একটা কাজ কর। তোরা সব মাথার উভঝুটি করে রাম নামের জয় ধ্বনি করে নাচতে থাক, বল তো হৌনা আমার রাম মিতা কেমন আছে? সীতা মিতানি কেমন আছে। ভত্রা, ছডা, কেমন আছে। আর তুই বা কেমন আছিস।

সারতি: (স্বগত) চণ্ডাল বলে কি? ভগবান রামচন্দ্রকে বলছে রাম মিতা ও মা জান কি কে বলছে সীতা মিতানি। ভরত সভু কে বলছে লোহা। আর আমার তো একেবারে ধপারপা করে ছেড়েছে। আমাকে বলছে কিনা হৌনা। কেবল যে প্রভুর আদেশ নেই। নতুবা এক মুষ্ঠাঘাতে দুষ্টদ্বয়ের ভবলীলা শেষ করে দিতাম। কোন কথা বলব না থাকব এই খানে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

চণ্ডাল : ওরে ও ধনা, হৌনা যে কথা বলছে না। ওর মনে হয় ক্ষুধা পেয়েছে। দে দে, ওকে কিছু খেতে দে।

ধনা : ধর হৌনা। কিছু জল পান কর। তোর জন্য এনেছি এই ঢ্যাপ শলুক আর ঘেচু। নে নে খেয়ে নে কিছু (খাবার দিল)।

সারতি : সবই তো দেখলাম। এখন দেখতে হবে এরা কেমন খাদ্য খায় (খাবার খেল)।

চণ্ডাল : বলতে হৌনা কেমন লেগেছে?

সারতি : তোরা যেমন চণ্ডাল জাত, তেমনি তোদের চণ্ডালের খাদ্য। শুধু খাচুর খুচুর করে আর ডোবরা গন্ধ কয়।

চণ্ডাল : আবে দুর বোকা, প্রভুর নামে নিবেদন করে খেয়েসিছ?

সারতি : তাইতো ঘেচু বলে তুচ্ছ করে আমি তো প্রভুর নামে নিবেদন করিনি। আমি বড় অন্যায় কর্ম করেছি। ধনা আমাকে আর কিছু খাবার দেও (খাবার লইয়া)। শোন শোন প্রভু আমার গোলকের গোসাই তো মার নামে নিবেদন করে এই খাদ্য খাই (খাবার খেল)।

www.pathagar.com

একি এমন খাদ্য তো আমি জন্মেও খায় নাই। সরাজা গোবর্ধন এ তোমার খেচুর গুণ নয় এ আমার প্রভুর গুণ।

চণ্ডাল : এখন বলতো হৌনা আমার রাম মিতা কেমন আছে।

সারতি : সেই কথা বলতেই কে এসেছি। প্রভুর বড় বিপদ। প্রভু আমার অশ্বমেধ সঙ্গে ব্রতি হয়েছেন। সেই অশ্ব তিন দেশ জয় করেঁ, বাল্মিকির তপবনে দুটি বালকের করে ধৃত হয়েছে। আর একে একে প্রভুর তিনটি ভাই সেখানে প্রাণ ত্যাগ করেছে।

এখন প্রভুর ইচ্ছা তিনি সবান্দবে যুদ্ধে যাবেন তোমার নিমন্ত্রণ রইল সৈন্য সামন্ত লয়ে (সত্তর) অযোদ্ধায় যায়। এখন আমি আসি (প্রস্থান)।

চণ্ডাল : ওরে ধনা, আমি অযোদ্ধায় যাচ্ছি। আমার রাম মিতার বড় বিপদ। আমি যতদিন না ফিরি ততদিন তুই রাজ্য রক্ষা করতে পারবি তো?

ধনা : হ্যাঁ, মামা, পারব বটে। কিন্তু তোমার যাওয়া হচ্ছে না। সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ।

চণ্ডাল : কি আমার যাওয়া হচ্ছে না শোন তবে।
ওঠো ওঠো বীরগণ ছাড়বে বিছানা
হাত মুখ ধুয়ে সবে খাওরে তামাক
মার দোম জোর মুখে
যেন চর চর করে কলকি যায় ছুটে।
ধর লাঠি আন বটি
কর সবে কুমড়া কাটা কাটি

ধনা : আরে বাপু আমি তোমার বীরত্বের কথা বলছি না। বলি যাবে কেমন করে।

চণ্ডাল : কেন হেঁটে যাব।

ধনা : তবে যাও।

চণ্ডাল : এই আমি চললাম (প্রস্থান উদ্ধত)

ধনা : ও মামা একটু দাঁড়াও। আমাকে সঙ্গে নেবে না?

চণ্ডাল : আরে দুর বোকা, তুই কেমন করে যাবি। তোর একটা ঠাং যে ল্যাংড়া।

ধনা : ও মা, মা তুমি আমাকে ব্যাঙ্গোক্তি করছ? ঠিক আছে যাও, তবে সরজু নদী পার হবে কেমন করে? সরজু নদী পার হবার সময় এই ধনার কথা মনে পড়বে।

চণ্ডাল : এ্যা তাইতো সরজু নদী তেতো কোন খেওয়া নেই। আচ্ছা ভাগনে তুই বলতো সরজু নদী পার হব কেমন করে?
(ভুইয়া গোদার প্রবেশ)

ভুইয়া : মামা, মামা, ও মামা, কেথায় যাবে বললে?

চণ্ডাল : আরে আমাকে রাম মিতার কাছে যাব ॥

ভুইয়া : মামা আমাকে একটু সঙ্গে নিয়ে চল।

চণ্ডাল : তোর ঐ গোদা পা দিয়ে হেঁটে যাবি কেমন করে।

ভুইয়া : মামা, আমি না গেলে তোমাকে সরজু নদী পার করে দেবে কে?

www.pathagar.com

চণ্ডাল : তুই আবার আমাকে কেমন করে পার করে দিবি?

ভুইয়া : কেন, আমি আমার এই গোদা পা দিয়ে এমনিভাবে পুল করে দেব। মানে যাকে বলে চার। মানে সাকো, আর তুমি সেই পুলের ওপর দিয়ে যাবে আর আসবে।

চাণ্ডাল : পারবি তো?

ভুইয়া : হ্যাঁ হ্যাঁ মামা। নিশ্চয়ই পারব।

চণ্ডাল : তাহলে তোরা সফলেই আমার সঙ্গে চল।

২ জন : তাই চলো, মামা তাই চলো (সকলের প্রস্থান)।

(সীতার প্রবেশ)

সীতা : আজ আমার মন এমন কু গাইছে কেন। না জানি কোন অমালে আশংকায় বুকটা বার বার কেঁদে উঠছে।
(কুশিলবের প্রবেশ)

কু + ল : মা, মাগো, দ্বিতীয় যুদ্ধেও আমাদের জয়লাভ হয়েছে।

সীতা : আয় বাবা কুশিলব, তোরা আমার বক্ষে আয়।

কুশি : মা মাগো, কত রাজপুত্রেরা রাজ আভরণ পরে যুদ্ধে আসে। আমাদের আজ রাজ আভরণ দিতে হবে মা।

সীতা : বাবা কুশিলব, তারা তো রাজার ছেলে, তাই তাদের রাজ আভরণ আছে। তোমরা দুঃখিনির পুত্র, তোমাদের আমি কোথা হতে রাজ আভরণ দেব।

ধুয়া : আভরণ কোথায় পাব জনম ও দুঃখিনি আমি রে।

বোল : জনম দুঃখিনি আমি দুখে গেল কাল। এ জনমে হলো না মোর সুখের কপাল। সবে বলে সীতা সতি পতি পাইছে ভাল, জগবন্ধু পতি পেয়ে আমার কান্দেতে জনম গেল। শোন কুশি কেন কর দাবি অকারণ। এই রণ মাঝে কোথায় আমি পাব আভরণ।

কুশি : তা বললে কি হয় মা রাজ আভরণ আমাদের দিতেই হবে।

সীতা : বাবা কুশিলব তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি তোমাদের রাজ আভরণ পরিয়ে দিচ্ছি (আভরণের সাজ পাঠাতে হবে)।

বোল : তীলেক চন্দন দিল জনমদুঃখী মায়া উভ ঝুটি বেধে দিল লবকুশির মাথায়। লতার মালা দিলাম তোদের সর্ব গায়। ফুলের মালা দিলাম আমি তোদের গলায়।

কুশি : মা আভরণ তো হয়েছে এখন আমাদের পায়ে নুপূর বেঁধে দেও।

সীতা : বাবা নূপুর আমি কোথায় পাব?

কুশি : তা বললে কি হয় মা, নূপুর আমাদের দিতেই হবে।

লব : তুমি এমনি করে মাকে আর জ্বালাতন করবো না।

কুশি : তুমি চুপ কর ভাই, নূপুর আমাদের চাই।

সীতা : ও ভগবান এখন আমি কি করি। ওগো প্রভু রঘুনাথ তুমি এমনি করে আমাকে আর কত কাঁদাবে। তোমারি পুত্রদ্বয় বন মাঝে ফলে জলে-জটা বাকলে কত কষ্টে দিনতি পাত করছে। তা তো তুমি একটি বারও দেখলে না।

www.pathagar.com

কুশি : কই মা, আমাদের নুপূর দেও।

সীতা : বাপ কুশিলব আমার কাছে এসো আমি তোমাদের নুপূর বেঁধে দিচ্ছি। (ফুলের নপুর বাঁধিয়া দিল)

কুশি : কই মা নূপুর তো বাজে না, নপুর বাজিয়ে দেও মা

সীতা : ওরে কুশিলব, এসো ফুলের নূপুর। এ নুপুর বাজে না।

কুশি : তা বললে কি হয় মা, নূপুর আমাদের বাজিয়ে দিতে হবে।

গীত

সীতা : বাজ বাজ ফুলের নুপূর বলি তব ঠাঁই আজ যদি না বাজে নুপূর শ্রী রামের দোহাই প্রভুর নামের সাড়া নুপূর যখনি পাইল ঝুনঝুন শব্দে নুপূর বাজিয়া উঠিল।

কুশি : বা! চমৎকার এইতো নুপূর বেজেছে। এবার একটু নেচে লই (নাচন) মা কত মুনি আমাদের নিকট পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। আমরা পরিচয় দিতে পারি না। আজ আমাদের পিতার পিতার পরিচয় বলে দিতে হবে।

সীতা : বাপ কুশিলব তোদের পিতার পরিচয় আমি কেমন করে বলব? তবে আকার ইঙ্গিতে আমি বলছি শোন।

গীত

তোদের পিতার নাম আছে ঐ পূর্ণ সপ্তকাণ্ডে।
ঐ নাম শুনিলে পাতকির পাপ খণ্ডে ॥
ঐ যপে ঐ সর্গ পেলেন গতি ॥
ঐ যপে ঐ সংকর পার্বতি ॥

কুশি : এই তো আমরা পরিচয় পেয়েছি। চল ভাই এই বার আমরা যাই।

লব : তাই চল দাদা (লব কুশ প্রস্থান)।

সীতা : প্রভু তোমার অধম সন্তানদের তুমি রক্ষা কর (প্রস্থান)।

স্বর্ণ সীতাস্থ রামের প্রবেশ

রাম : গভীর রজনী স্তব্দতায় প্রকৃতি নিরব। দূরে ঝিল্লীরব। পেচকের বীভৎস চিৎকার। সিংহাসনে আমি একা বসে। পাশে মোর স্বর্ণ সীতা। এই কি সেই অযোদ্ধা নগরী?

(খেচু ... { চণ্ডাল রাজের প্রবেশ}

চণ্ডাল : রাম মিতা প্রণাম নে। তে... মিতানী তোকে একটা উপহার দিয়েছে ধর খেয়েনে।

হনু : (নেপাতে) আজ আমি রাজ সভায় প্রভুকে লজ্জা দেব। (প্রবেশ) দেখি দেখি রাম গুণ মণি। তোমার মিতা তোমার হস্তে কি দিল খেচু নাকি?

রাম : হনুমান তুই আমাকে লজ্জা দিচ্ছিস। আমার মৈত্র গোবর্ধনকে অপমানিত করছিস। হনুমানরে তোর এখনো পশুবুদ্ধি গেল না। শাস্ত্রে বলে মৈত্র অভেদ। এই দেখ হনুমান মৈত্র আমাকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছে।

www.pathagar.com

হনু : প্রভু গো, জ্ঞান হারা পশুজাতি আমি। কেমন করে বুঝব তোমার লীলার মাধুর্য। যার নামের গুণে জ্বলে ভাসে শিলা। যার চরণের স্পর্শে কাষ্টের তরী হয় সোনা। পাষাণ হয় মানবী তার স্পর্শে ঘেচু স্বর্ণ মুদ্রা হবে এ আবার বিচিত্র কি। ধন্য প্রভু ধন্য তোমার লীলা। আমায় ক্ষমা কর প্রভু। বুঝলাম অহংচুর্ণ ভগবান তুমি।

(প্রস্থান)

চণ্ডাল : আমাদের কি জন্য স্মরণ করেছিস রাম মিতা।

রাম : মিতা আজ আমি বড় বিপদাপন্ন হয়ে তোমাদের স্মরণ করেছি। আমার যজ্ঞের অশ্ব তিন দেশ জয় করে বাল্মীকির তপবনে দুটি বালকের করে ধৃত হয়েছে। তিন তিনটি ভাই আমরা সেই অশ্ব, আনতে গিয়ে দুটি বালকের করে নিহতে হয়েছে। মিত্র, এখন তোমরা ভিন্ন আমার আর কোন উপায় নেই। যা করলে ভাল হয় তাই বুঝেসুজে কর।

চণ্ডাল : মিতা তাহলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন। অবিলম্বে যুদ্ধে যাত্রা করতে হবে। সাজাও সৈন্য বাজাও রণভেরি। দেখি সেই বালক দুটির বাহুতে কত শক্তি আছে। আরে ধনা, মনা, কান্সে, কানা তোরা কে কোথায় অছিস। সবাই তৈরি হয়ে নে। এক্ষুণি যুদ্ধে যেতে হবে। চল মিতা অবিলম্বে যুদ্ধে যাত্রা করি গিয়ে।

রাম : তাই চল (সকলের প্রস্থান)

(কুশিলব ও অশ্বের প্রবেশ)

কুশি : (অশ্বাবাধিয়া) অশ্ব, থাক এই স্থানে। দেখি অশ্বের মালিক আর কে আছে।

লব : দাদা আমাদের আর যুদ্ধ করে কাজ নেই। এই যুদ্ধে আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

কুশি : তুমি চুপ কর লব, যুদ্ধে এসে দুর্বলতা বীরের শোভা পায় না।

(কাফি সহ ভুইয়ার প্রবেশ)

ভুইয়া : আরে বালকদ্বয় আমাদের রাম মিতার যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেও।

কুশি : বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না অশ্ব।

ভুইয়া : কি বিনা যুদ্ধে অশ্ব ছাড়বে না? এই কাপি দেখছ কোপাইয়া একেবার ফেতরা ফেতরা করে দেব।

কু +ল : এস তবে তোমার সমর পিপাসা মিটাইয়া ছাড়ি।

(ফানসহ ধনার প্রবেশ)

ধনা : আরে বালকদ্বয় এই ফান দেখছ। একেবারে লগোগার মতো কয়ে লয়ে যাব।

কু +ল : এসো তবে। (যুদ্ধ)

(পোল সহ চণ্ডালের প্রবেশ)

চণ্ডাল : ওহে বালকদ্বয় আমার ঘোড়া ভাগনেদের পেয়ে তোদের গায়ের জোর বেড়ে গেছে। এবার আমরা তিনজনে যুদ্ধ করব। দেখি তোরা পালাস কোন পথ দিয়ে। (যুদ্ধ)

www.pathagar.com

ভুইয়া : ওরে বাপরে বাপ। মরেছি, ও মামা আমি আর পারছি না। আমার আর যুদ্ধ দিয়ে কাজ নেই। আমি পালাই আমি পালাই। (প্রস্থান)

ধনা : মামা আমিও মরে যাচ্ছি। তুমি যা হয় তাই কর। আমি চললেম। (প্রস্থান)

চণ্ডাল : মিতা শিগগির এস শীগগীর এস। আমি আর পেরে উঠছি না। পেরে উঠছি না। (প্রস্থান)

কুশি : দেখেছ ভাই প্রাণ ভয়ে একে একে সবাই পালিয়ে গেল। দেখা যাক আর কোন বীর আসে........

রাম : {নেপথ্যে} আরে আরে দুর্মতি বালকদ্বয় একে একে আমার সকল সৈন্য করলি নিহত। এবার সাধ্য থাকে এগিয়ে এসে কর প্রতিহত। (প্রবেশ) এ্যা, এ আমি কি দর্শন করছি। এ যে আমারি রুপের প্রতিমূর্তি। এদের এতো শ্যামল শান্ত মূর্তি নব দূর্বা দলকয়ে কনক রুচি, কমলায় তনু, উন্নত নাসিকা, চৌরস কপাল গলে বনমালা দোদুল্যমান। যেন নবীন মেঘে চললে করছে। সীতাকে আমি পঞ্চম মাসের গর্ভে অবস্থায় নির্বাসনে দিয়েছিলাম এই বাল্মীকি তপবনে। আমার মনে হয় এরা সেই জনম দুখিনির পুত্রদ্বয় হবে। ওহে বালকদ্বয়, তোদের সত্য পরিচয় দে।

কুশি : আমার নাম কুশি।

রাম : তোমার নাম?

লব : আমার নাম লব।

রাম : তোমাদের পিতামাতার নাম কি?

কুশি : মায়ের নামটি সীতা দেবী, আমাদের ভবে পিতা কেহ নাই, মুণিবর দায় পুত্র আমরা দুটি ভাই।

রাম : ওরে বালকদ্বয় মিথ্যা প্রবঞ্চনা করনা। তোমাদের পিতা মাতার সত্য পরিচয় দাও।

কুশি : আমাদের পরিচয় তো আমরা দিয়েছি, এখন তোমার পরিচয় দাও।

রাম : ওহে বালকদ্বয়, শোন তবে আমার পরিচয়। আমি সূর্যকুলোদ ভব রাজা রামচন্দ্র।

কুশি : রাম। কোন রাম? সুগ্রিবের যুদ্ধে যে রাম চোরাবাণে বালিকে বধেছিল, তুমি কি সেই রাম?

রাম : হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি সেই রাম।

কুশি : ওহে বীর, এ হেন হীন কর্ম যার দ্বারা হয়, তার মুখ দেখা কভু উচিত ও না হয়। এসো সম্মুখসংগ্রামে, তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেই।

রাম : ওহে বালকদ্বয়, তোদের ঐ কোমল অঙ্গে আমি কেমন করে আঘাত করব। আমার মন বলছে তোরাই আমার সেই সীতার পুত্রদ্বয়। তাই যদি সত্য হয় তাহলে আমার আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমি অযোদ্ধায় ফিরে যাই। আমার আর যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। তোদের পেলে আমি আর কিছুই চাই না, কিছুই চাই না।

কুশি + লব : ওহে রাম, তোমার দ্বারা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তুমি দেশে ফিরে যাও।

www.pathagar.com

ধুয়া : ফিরে যাও রাম, যাও রাম, ওহে ভীরু রাম ॥
শুন শুন শুন রাজা, বলি তব ঠাই।
যুদ্ধ ভয়ে ভীত তুমি, দেখিতে যে পাইনা।
আমি বলি সূর্য বংশের, মুখে দিলে কালি।
কোন লাজে চোরাবানে, বধেছিলে বালি ॥
তোমারও কু কীর্তির কথা ত্রিজগতে শুনি।
ফিরে যাওহে দেশে তুমি, রাম গুনমণি ॥

রাম : বালকদ্বয়, তোমাদের শেল সম বাক্য আমি যে আর সইতে পারছি না। তোমরা আমার পরিচয় কতটুকু জান?

কুশি : যতটুকু জানি, তাতেই বুঝে নিয়েছি যে, তুমি একজন কাপুরুষ। ওহে রাজা তোমার পরিচয় তো শুনলাম। কিন্তু তোমার পিতৃ পরিচয় তো দিলে না।

রাম : ওহে বালকদ্বয়, শোন তবে আমার পিতৃ পরিচয় আমার পিতা ছিলেন অযোদ্ধার রাজা রায় চক্রবর্তী রাজা দশরথ।

কুশি : দশরথ! কোন দশরথ। আমরা তো চারটি দশরথের কথা জানি। কোন দশরথ তোমার পিতা।

রাম : বালকদ্বয়। তোমরা কোন কোন দশরথের কথা জান?

লব : শোন তবে বলতেছি -

বোল : এক দশরথের কথা। শুনছি আদিকান্তে। আমার পিতার নাম জপিলে, তোমার পিতার পাপ খণ্ডে।

রাম : হা হা বালকদ্বয়, সেই দশরথই আমার পিতা, তোমরা আর কোন দশরথের কথা জান।

ল + কু : আর দশরথের কথা, তাও জানি মোরা। চারপুত্র বর্তমানে রাজা, হলো বাসি মরা ॥

রাম : হা হা সে দশরথও আমার পিতা।

ল +কু : আর এক দশরথের কথা, তাও মোরা শুনি। মৃগয়া করিতে গিয়ে রাজা, বধেছে সিন্ধু মুনি ॥

রাম : সেও আমার পিতা। তোমরা আর কোন দশরথের কথা জান।

ল + কু : আর এক দশরথের কথা, শুনি বড় ফাঁক। পরশু রামের ধনুক বয়ে রাজার, মাথায় পড়ল টাক।

রাম : সেও আমার পিতা। আমি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কুশি : দেখেছ ভাই। কেমন একটা কর্ম হয়েছে?

লব : কেমন কর্ম হয়েছে দাদা।

কুশি : একে একে আমরা চারটি দশরথের কথা বললাম সবাই ওনার পিতা হয়। ভাই শোকে রাজা উম্মাদ হয়ে গেছে। এখন আমাদের নামও যদি বলি দশরথ তাহলে আমরাও ওনার পিতা হয়ে যাব।

রাম : রে বালকদ্বয় ব্যাঙ্গোক্তি করো না। আমি তোমাদের উপহাসের পাত্র নই।

www.pathagar.com

কুশি : (গীত) শুন শুন রামচন্দ্র, বলি যে তোমারে। বিচারিয়া তুমি রাজা, ভেবে দেখ মনে ॥
চার ভাইয়ের দুই বর্ণ, দেখি কি কারণে। নিশ্চই জানিলাম হবে বেজম্মার লক্ষণ ॥

রাম : স্তব্দ হও দুর্মতি বালক। হেন কটূক্তি নাহি কর উচ্চারণ। আমার শৈশবের বীরত্বের কাহিনী শুনলে প্রাণ ভয়ে দুটি ভাই পালিয়ে যাবে।

কুশি : বল না মহারাজ, প্রাণটা আমাদের কাছে খেলার পুতুল। আমরা অবহেলে এ প্রাণ সমর প্রাঙ্গনে বিসর্জন দিতে পারি।

রাম : শোন তবে। যার শিরে ছত্র ধরে তিক্ষ্মকর রবি, যার ভয়ে ভীত সমীরণ। মৃদু মৃদু দোলায় ব্যঞ্জন যক্ষ্য রক্ষ্য গন্ধর্ব, কিন্নর আদি যার পদে নত করে শির আর তোমরা সামান্য বালক হয়ে আমায় কটূক্তি করছ। আমার বীরত্বের কাহিনী আর অনেক আছে। আমি পঞ্চম বৎসর বয়সে দুর্জয় তাড়কাকে নিধন করেছিল।

বোল : শোন শোন বালক আমার বীরত্বে কথা। এক বাণে বধেছি আমি দূর্জয় তাড়কা॥

কুশি : বান শিক্ষা করেছিলে বিশ্ব মিত্রের কাছে প্রথম যুদ্ধে নারী হত্যা করিলে কোন লাজে।

রাম : শুন শুন বালক আমার বীরত্বে কথা। এক বাণে কেটেছি আমি মুবাহুর মাথা ॥

কুশি : ব্রক্ষ্ম অস্ত্র বাণ গোটা বিশ্বমিত্রের শিক্ষা ব্রক্ষ্ম অস্ত্র না থাকিলে তুমি না পাইতে রক্ষা।

রাম : ওহে বালকদ্বয়, আমি আরো কি করেছি জান?

কুশি : কি করেছে রাজা?

রাম : শোন শোন বালক আমার বীরত্বে কথা। মিথিলাতে হরধনুক ভেঙ্গে আমি এনে ছিলাম সীতা ॥

কুশি : অনেক দিনের ধনুক খানাঘুনে বার বার তাহা ভেঙ্গে ব্যাখ্যা করছ রাম গদাধর॥

রাম : ওহে বালক অলংঘ সাগর আমি গাছ পাথরে বন্দন করেছিলাম।

কুশি : মিথ্যা কথা রাম চন্দ্র বল কি করেন। বানরগণে বাধল সাগর তোমার শুধু নাম।

রাম : শোন শোন বালক পূর্বের কাহিনী অহল্লা ব্রাক্ষণী ছিল গৌতম ঘরণী। অভিশাপের বিধান ছিল তব পদধুলি। আমি একখানা পাষাণ দেই রাম মানব কর তুমি।

রাম : একবাণে বধেছি আমি ঐবীর কুম্ভ কর্ণ।

কুশি : শোন রাম যদি তাহার নিদ্রা হত পূর্ণ ॥ অকালে জাগালে তাকে জাতি নিশাচরে।
নইলে কি আর কুম্ভকর্ণ তোমার বানে মরে ॥

www.pathagar.com

রাম : একবাণে বধেছি আমি ঐ দুর্জয় রাবণ।

কুশি : মিথ্যা কথা রামচন্দ্র বল কি কারণ ॥

রাম : কি আমি রাবণকে হত্যা করিনি?

কুশি : না না না শোন আমি বলছি।

(গীত)

কুশি : সন্ধি কথা বলেছিল সন্ধি বিভীষণ।
মৃত্যুবাণ ও এনে ছিল পবন নন্দন ॥ সেই বানেতে বধ করিলে লঙ্কার রাবণ।
উচিত কথা রামচন্দ্র বলিলাম এখন ॥

রাম : ওহে বালকদ্বয়, তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম। আমি কিছুই করিনি। এখন তোমরা আমার একটি কথা শোন,আমার যজ্ঞের অর্শ্ব তোমরা ছেড়ে দাও। আমি সূর্য কুলদভব রাজা রামচন্দ্র, প্রজার মনতুষ্টির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতি হয়েছি। যজ্ঞ আমার পূর্ণ করতেই হবে।

কুশি : সেটি হচ্ছে না রাজা রামচন্দ্র। অশ্বভালে অহংকারে জয়পত্র লিখেছ। সেটি কি মনে নেই।
অহংকারে লিখিলাম পত্র অখিলের পতি অশ্ব বাধিরে যার মাতা হয় সতী। সতী মায়ের পুত্র হলে অশ্বকে বাধিবে অসতীর পুত্র হলে অশ্ব ছেড়ে দিবে। এই অশ্ব বাঁধতে নাইকো কারো বাঁধা বাঁধতে পেরে যে না বাঁধে তার বাপ হয় গাধা আমরা দেখতে চাই এই ত্রিজগতে আমরা দেখতে চাই এই ত্রিজগতে তোমরা ভিন্ন সতী মায়ের পুত্র আর কেহ আছে কি না।

রাম : ওহে বালকদ্বয়, জীবনের ধ্রুব তারা জননী আমার স্বর্গা দপি গরীয়সী সে দেবী প্রতিমা কর যদি তার নিন্দা বাদ শিশু বালক বলে করিব না ক্ষমা ঐ হিন বাক্য উচ্চারিবে যে রসন থেকে সেই পাপ রসনা ছিড়িক নখাঘাতে বাকশক্তি চিরতরে স্তব্দ করিব তোমার ॥

কুশি : চুপকর কাপুরুষ সিংহ, শিশু মোর দোহে শত শত শৃগালের নাহি করি ভয় এসো রণে পাঠাই নরকে ॥

রাম : এস বালক মিটাই তব যুদ্ধের সাধ।
(যুদ্ধ ও রামের পলায়ন)
(ভূইয়া ধেনা ও চণ্ডাল রাজের প্রবেশ)

চণ্ডাল : শোন হে বালকদ্বয়, আজ আমরা যজ্ঞের অশ্ব ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। তোরা কতক্ষণ যুদ্ধ করবি।

কুশি : আয় তবে চণ্ডাল তোকেও ভবপারে পাঠিয়ে দেই। (যুদ্ধ)

ধনা : ওরে বাবা এ যে এ পিঠ ওপিঠ সমান করে দিলরে ॥ আমি পালাই (২) (প্রস্থান)

কুশি : এই বার ভবপারে যা চণ্ডাল। (পদাঘাত)

চণ্ডাল : আঁ এইবার গেছিরে বাবা। গৃহিণী তখন বারণ করে ছিল। শুনিনি তার কথা। এখন তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এখন পটলং চয়ই করি য্যে।
(টলিতে টলিতে প্রস্থান) (পরে কুশিলবের প্রস্থান)

www.pathagar.com

(রামের প্রবেশ)

রাম : নেপথ্যে : কোথায় সারথি আমার সৈন্য শেষ হয়ে গেল। আর তুমি নিরবে দাড়িয়ে আমার অপমান দেখছ। এগিয়ে এসে ঐ বালক দুটিকে বৃক্ষমূলে আছড়ে মেরে ফেল। (প্রস্থান)

(বৃক্ষ হাতে সারতি ও লবকুশের যুদ্ধরত প্রবেশ)

সারতি : (প্রবেশ পথে) : শোন শোন প্রভু আমার গোলকের গোসাই। এই দেখ প্রভু, আমি বন্দন হতে যাই। (যুদ্ধ করিতে করিতে) রে বালকদ্বয়, এইবার দেখ আমি তোদের মারিতে পারি কি না। [বৃক্ষ দ্বারা মারিতে উদ্ধত]
কিন্তু মারব না। তোরা যে মা জানকির সন্তান। তোরা যে আমার ভাই।

কুশি : দেখেছ দাদা কি দুরন্ত বানর ঐ বৃক্ষটা আমাদের মাথার ওপর ছেড়ে দিলে দুভাই মরে যেতাম। এসো দাদা এই ব্রক্ষজালে বানরের হস্তপদ বন্দন করি। (ব্রক্ষ্মজাল ছাড়িল)

সারতি : এ্যা ও কি ব্রক্ষ্মজাল এসো না আমার কাছে। একটানে তোমায় করিব খান খান। ছিড়িতে পারিনা ব্রক্ষ্ম বাক্য লংঘন হবে। কেবল সেই সংশয় মরি। এসো এসো ব্রক্ষ্ম জাল আমার হস্থপদ বন্দন কর। (হস্তপদ বন্দন) হা প্রভু রামচন্দ্র একবার দেখে যাও তোমার পবন নন্দন হনুমান আজ ব্রক্ষাজালে বন্দি। (অবসন্নভাবে বসিয়া রইল)

(রামের প্রবেশ)

রাম : একি একি সারথি তুমি ব্রক্ষজালে বন্দি।

কুশি : রামচন্দ্র তোমার সকল সৈন্য সামন্তত শেষ হয়েছে। এখন যুদ্ধ কর, না হয় পরাজয় স্বীকার কর।

রাম : ক্ষত্রিয় সন্তান আমি। পরাজয়ের গ্লানি মুখে মেখে দেশে ফিরতে পারব না আমি। এসো তবে পাঠাই যমালয়।

কুশি : উত্তম। এস তবে। (যুদ্ধ)

রাম : ক্ষণকালে তিষ্টরে দুর্মতি বালকদ্বয়। (দ্রুত প্রস্থান) (ব্রক্ষবাণ লইয়া পূর্ণ : প্রবেশ)
অব্যর্থ এই ব্রক্ষবাণ। এ যে বাণ চালিয়েছিল মোরে গুরু বিশ্বমিত্র। কিন্তু মানবের তরে ছাড়িতে নিষেধ। কর্তব্যের অনুরোধে আজ সেই বাণ রামচন্দ্র জুড়িল ধনুকে। ওঠো ব্রক্ষ্ম অগ্নি শিখা গগন স্পর্শীয়া। ঐ বালকের বক্ষস্থল সন্ধান কর গিয়া ॥ (বাণের মুখেছায়া সীতার আর্বিভাব)

সীতা : (নেপথ্যে) : প্রভু সম্বরণ কর ব্রক্ষবাণ। কুশিলব তোমারই সন্তান। বধিয়া কুশিলবে পুত্র হারা কর না আমায়। (অন্তরধান)

রাম : কে তুমি এসে দাড়ালে অব্যর্থ ব্রক্ষ্মবাণের সম্মুখে। জনম দুঃখিনী সীতা কি বলছ তুমি। কুশিলব তোমারই সন্তান? তাই যদি সত্য হয় তাহলে দূর হয়ে যা ধনুর্বাণ। (ধনুর্বাণ ত্যাগ)

www.pathagar.com

যায় যাক প্রাণ পুত্র করে। তবু পিতা হয়ে পুত্র হত্যা না পারি করিতে। দে তো বাপ কুশি। আমার বুকে একটি বাণ বসিয়ে দে। এই আমি বক্ষ বিস্তার করে দিচ্ছি। (বক্ষ বিস্তার)

লব : ভাই কুশিরে অগ্রে আমি একটি বাণ মারি।

কুশি : তাই মার দাদা।

লব : সত্যিই যদি আমাদের পিতা হন তবে এই বাণ বনফুলের মালা হয়ে ওনার গলে দুলবে।

(গীত)

লব : প্রথমে ছাড়িলাম ও বাণ নামে চন্দ্রকলা।
চরণে প্রণিপাত করে বাণ গলে বনমালা।

(লবের বাণ মালা হয়ে গলে ছো)

লব : ভাই কুশিরে ঐ দেখ বাণটি কেমন সুন্দর মালা হয়ে ওনার গলায় দুলছে ॥ ভাই কুশিরে, তুই আর ওনাকে বাণ মারিস না।

কুশি : না দাদা, তোমার কোন কথা আমি শুনব না। তুমি সরে যাও। এই বার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও রাম। (বাণাঘাত)

রাম : আ : কুশিরে তুই আমার বুকে বজ্রবাণ মারলি? আজ কেবল যে আমার প্রাণের ভাই লক্ষণ বেঁচে নেই।

কুশি : দাদা দেখ রাজার গায়ে মণিমুক্তাখচিত কত রাজ আভরণ। আমি বাণে বাণে সমস্ত আভরণ দেহচ্যুত করব।

(গীত)

প্রথমে ছুঁড়িলাম ও বাণ নামে চন্দ্রকুট ,
এই বাণে কাটিব রামের মস্তকের মুকুট।
তার পরে ছুঁড়িলাম বাণ নামে হুতাসন,
এই বাণে কাটিব রামের গায়ের আভরণ।

রাম : ওরে কুশি তোর বুকটা শুধু বজ্রদিয়েই গড়া। আমি অস্ত্রহিনা তবুও ঐ বজ্রবান আমার বুকে মারলি। ওরে লব একটিবার আমার কোলে আয় লব। তোকে কোলে লয়ে আমার পাপদগ্ধ হৃদয়ে একটু শান্তি লাভ করি। (লব কোলে আমি)

কুশি : নেমে এসো দাদা কোলে যেতে হয় কুশি যাবে, যুদ্ধ করতে হয় কুশি করবে।

রাম : ওরে কুশি, লবকে আমার কোল থেকে নিয়ে যাস না। লবের স্পর্শে আমার প্রাণটা শীতল হয়ে গেছে সমস্ত জ্বালা আমার মন থেকে মুছে গেছে। ওকে কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকতে দে।

কুশি : সেটি হচ্ছে না রাজা। ভেবেছ আমাদের মায়ায় ভুলিয়ে বেঁচে যাবে। তা হবে না। তোমাকে আমি শেষ করে তবেই খাণ্ড হব। চলে এসো দাদা।

www.pathagar.com

(লবকে টানিয়া লইল)

লব : ভাই কুশিরে, তুই আর রামকে বাণ মারিস না। আমার মন বলছে রাম যেন আমাদের কোন আত্মীয় হবে।

কুশি : আত্মীয় না, ছাই। সে যাই হোক দাদা। তুমি পিছে দাড়িয়ে দেখ। এই বাণে রামকে আমি শেষ করি।

(গীত)

তারপরে ছুঁড়িলাম ও বাণ নামে চন্দ্রকলা,
এই বানে কাটিব রামের গলেরও মালা
তারপরে ছুঁড়িলাম ও বাণ নামে ভূমন্ডল
এই বাণে কাটিল রামের কর্ণের কুন্ডল।

রাম : উ : কুশিরে তোর ঐ বজ্রসম বাণ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কোথায় কোথায় সীতা একবার এসে দেখে যাও। আজ তোমারি গর্ভের সন্তান, তোমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিচ্ছে।

কুশি : দাদা আর মাত্র একটি বাণের প্রয়োজন। এই বাণেই ওকে আমি শেষ করব।

লব : নারে ভাই কুশি, তোকে আর আমি বাণ মারতে দেব না।

কুশি : তুমি সরে যাও দাদা। কোন কথা শুনব না এই বাণে রামকে শেষ করব।

রাম : আঃ চললেম কুশিরে লব একটিবার, শুধু একটিবার আমার কাছে এগিয়ে আয় বাপ। তোর ঐ সুন্দর মুখখানা দেখতে দেখতে মহানিদ্রার কোলে ঘুমিয়ে পড়ি, আঃ (রামের পতন)।

লব : ভাই কুশিরে তুই একি অন্যায় কর্ম করলি। আমি আর তোর সঙ্গে যাব না। আমি ঐ রামের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দেব।
(রামের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

কুশি : ওঠ ওঠ দাদা, এত অধির হলে চলবে কেন?
দেখেছ দাদা, রামের গায়ে মনিমুক্তাখচিত কত অলংকার। এস আমরা এই অলংকার খুলে নিয়ে যাই। এইগুলি বিক্রয় করে আমরা আমাদের মায়ের দুঃখ মোচন করব।
(অলংকার খুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

সারতি : (স্বগত) এই তো আমার সু সময় বয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে হলে বালকদ্বয়ের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। (প্রকাশ্যে) ওরে বালকদ্বয়, মা ঐ স্বর্ণ অলংকার কখনো দেখেনি। আর এই বানরও কখনো দেখেনি আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। মা দেখেনি আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। মা দেখলে বড় সন্তুষ্ট হবেন।

কুশি : তবে তাই হউক। হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে যাই। এসো হনুমান। (প্রস্থান উভয়ের)

www.pathagar.com

পঞ্চদশ দৃশ্য

সীতার কুটির
সীতার প্রবেশ

সীতা : কেন মন হইতেছে অস্থির। হৃদয়ের বিষাদভাব ক্রমে এসে হয়ে বর্ধিত। সমস্ত হৃদয়টাকে যেন করেছে আবৃত। মুহুর মুহুর কম্পিত অন্তর মন উচুটন, মুহুর মুহুর কম্পিত অন্তর মন উচাটন, নিশ্বাস যখন, মনে হয় কি এক মহারত্নে ফেলেছি হারিয়ে। কেন হেন ভাবান্তর বুঝিতে না পারি।

{কুশি লবের প্রবেশ} (রামের আভরণ ...)

লব : মা মাগো প্রণাম তব চরণে। (প্রণাম)

সীতা : লবরে আজ আমার মন থেকে থেকে কেঁদে উঠছে কেন? মনে হয় আজ যেন আমার একটা মহার্য রত্ন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

লব : মা। তোমার এহেন অবস্থা কেন আমি বলতে পারি।

সীতা : কি বললি? বলতে পারিস? ওরে লব, বল, বল, বাবা কেন আজ আমার মন এমন কু গাইছে।

লব : মাগো এতদিন কুশি যা বলেছে সবই মিথ্যা কথা। শোন মা আমি সত্য ঘটনা বলছি। রাম নামে এক রাজা আছে অযোদ্ধা নগরে। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে চারি সহধরে সেই অশ্ব তিন দিক জয় করে মুনির এই তপবনে এসে ছিল। সেই অশ্বটি আমরা দুভাই বন্দন করেছিলাম।

সীতা : তারপর তারপর কী হলো? বল, বল বাবা, চুপ করে থাকিস না।

লব : প্রথমেতে যুদ্ধে এলো রাজা শত্রুঘ্ন আপনার আর্শিবাদে তাকে আমরা করেছি নিধন।

সীতা : নিধন করেছিস?

লব : তারপরে যুদ্ধে এল ভরত ও লক্ষণ।

সীতা : লক্ষণ!

লব : আপনার আশির্বাদে তাকে ও আমরা করেছি নিধন।

সীতা : উ. ভগবান। পারছি না। একি সর্বনাশ হলো আমার।

লব : তারপরে রাম রাজা যুদ্ধে এসে ছিল। ব্যাটা রণে নয় পরিপক্ক, ভয়ে পাতায় সম্পর্ক। বারে বারে বধে আমাদের হাতে। আমাদের সে চায় কোলে নিতে। আমি যখনি তার কোলে উঠতে যাই, তখনই কুশি আমাকে তার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসে। আমাদের সঙ্গে সে মোটেই যুদ্ধ করতে চায় নি। কত কাকতি মিনতি করে সে আমাদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমরা তার কোন নিষেধ শুনি নাই। আমি কুশিকে বলেছিলাম মন বলছে উনি আমাদের কোন আত্মীয় হবে। এ যুদ্ধে আমাদের কাজ নেই। কুশি আমার কোন কথা শুনল না।

সীতা : তারপর তারপর কি হলো?

www.pathagar.com

লব : যখন তার অঙ্গে বার বার বাণ নিক্ষেপ করি তখন কতই কান্না, সে কেঁদেছিল তুমি দেখলে হয়তো সহ্য করতে পারতে না।

সীতা : আর বলিস না, ওরে লব, আর বলিস না। আমি শুনতে পারছি না এই মর্মভেদী বাণী।

লব : তারপর যুদ্ধ করতে করতে সেই বীর অস্ত্র পরিত্যাগ করল। সেই সুযোগে কুশি তাকে বাণাঘাতে ধরাশায়ী করল।

সীতা : উ ভগবান একথা শুনবার পূর্বে কেন তুমি আমার মৃত্যু দিলে না, ঠাকুর আকাশ তোমার কোণে কি বজ্র নেই। তুমি কি পার না একটা বজ্র নিক্ষেপ করে আমার মাথাটা চৌচির করে দিয়ে। বসুন্ধরা তুমি দ্বিধা হও। তোমার কোলে আমার এই কলঙ্কিত মুখ লুকাই।

কুশি : মা তুমি এত অধিরা হচ্ছ কেন? (মাকে ধরল)

সীতা : দূর হয়ে যা কুলাংগার। আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যা। তোদের চাই না।

লব : মাগো, কি হয়েছে তোমার বল না মা? যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুকে নিধন করেছি এতে আমাদের অপরাধ কি?

সীতা : তা তোরা বুঝবি না কুশিলব, তা তোরা ঝুঝবি না। সে কথা আমি তোদের বোঝাতে পারছি না।

লব : মা গো, তুমি আমাদের ক্ষমা কর মা। তোমাকে এমনিভাবে আর কখনো আমরা দুঃখ দেব না।

কুশি : মা এই দেখ, আমরা কি এনেছি। রাজার রাজ আভরণ সব খুলে নিয়ে এসেছি।

সীতা : দেখি দেখি এইতো আমার প্রভুর আভরণ।

ধুয়া : কোন্ রণে বধে আলি আমার প্রাণনাথ। বোল : আরো পুত্র নয়রে শত্রু তোরা আমার সিঁদুর ভবে। আমি হলাম রাড়ি ॥ আর জনম দুঃখিনী আমি, আমার দুঃখে গেল কাল। এ জনমে হলো না আমার সুখের কপাল। আরো কেন বা স্তন্যের দুগ্ধ আমি, আমি দিয়েছিলাম তোরে। হয়ে কেন মরলি নারে, তোরা সুতিকারি ঘরে।

লব : মা, মাগো, আমরা অপূর্ব একটি বানর বেধে নিয়ে এসেছি? এমন সুন্দর বানর তুমি কখনো দেখ নাই মা, দেখবে চল।

সীতা : বানর এনেছিস? কোথায়? কোথায় রেখেছিস সেই বানর? চল চল একবার আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

লব : তাই চল মা। (সকলের প্রস্থান)

{সারথির প্রবেশ} (দূরে সীতা ও কুশিলব)

সারথি : ঐ, ঐ তো জনম দুঃখিনী মা আমার এদিকেই আসছে। ওরে ওরে ব্রহ্মজাল একটিবার শুধু একটিবার আমাকে মুক্তি দে। আমি মাকে প্রাণ খুলে একবার প্রণাম করি। কি শুনলি না আমার কথা। ব্রহ্মজাল একটানে তোমায় আমি ছিড়িবারে পারি। কিন্তু ব্রহ্মবাক্য লজ্ঘন হবে। সেই শঙ্কা করি।

www.pathagar.com

(সীতা ও লবকুশির প্রবেশ)

সারথি : মা, মাগো প্রণাম তব চরণে। (প্রণাম)

সীতা : এসো বৎস হনুমান। আমার কোলে এসো। (বন্দন খুলিল)

কুশি : মা, তুমি আমাদের দূরে ঠেলে দিয়ে বানরকে কোলে নিলে।

সীতা : ওরে কুশিলব তোরা জানিস না, এ কত কত গুণের পুত্র আমার।

(গীত)

আরো কত গুণের পুত্র তোরা, তোরা ভাই দুই জন।
তাহার চেয়ে অধিক গুণের পুত্র আমার পবন নন্দন ৷৷
আরো অলঙ্ঘে সাগর সে যে, সে যে লঙ্ঘন করেছিল।
লংকা দগ্ধ করে দিয়ে সে যে রাবণে বধিল।
আরো দুষ্ট দশাননে আমায়, আমায় হরণ করেছিল।
কর্মফলের জন্য তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিল।

কুশি : মাগো, তুমি বৃথাই অধির হচ্ছ। আমরা যে রামকে বিনাস করে এসেছি। সে রাম আমাদের পিতা নয়।

সীতা : শোন কুশি, হবে না আর মিথ্যা বলিতে। আজ নিশিতে আমি দেখেছি স্বপনে ৷৷
যদি সে রাম না হবে মমহস্তের কংকন ক্যানো খসিবে।

কুশি : মা, স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না।

সীতা : ওরে কুশি, এই দেখ, এই অংগরি দেখে আমি চিনে নিয়েছি এই সেই রাম।

(গীত)

আরো বিয়ের দিনে এই অঙ্গুরি পিতা করেছিল দান।
এই দেখরে লেখা আছে এতে দয়াল রামের নাম।
আরো আশিরতি সম সংখ্যা এই না সোনারও অংগার।
এই দেখ অংকিত আছে এতে রাম রাম সারি সারি ৷৷

সীতা : হনুমান জগবন্ধু কি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

সারতি : মাগো তোমার পুত্র হয়ে তোমার মাথায় দিল বাড়ি। মুছে ফেল সিঁথের সিঁদুর মাগো। তুমি হয়েছ রাড়ী।

সীতা : হনুমান, তুই পুত্র হয়ে আমায় রাড়ী বলে গালি দিলি।

সারথি : মাগো তুমি শুধু একা রাড়ী হও নি।

সীতা : হনুমান জগবন্ধু আমার কোন ধুলিশয্যায় শায়িত আছে আমাকে নিয়ে চল।

সারথি : মা গো, তুমি কি দেখতে পারবে সেই নিদারুণ দৃশ্য। সইতে পারবে এত বড় আঘাত।

সীতা : ওরে পুত্র আমি সব কিছু সইতে পারব। এ যে আমার কপালের লিখন। খণ্ডাইবে কে। ওরে পুত্র, তরা করি আমাকে নিয়ে চল যেথা আছে মোর রাম গুণ ধাম।

www.pathagar.com

(সীতা ও সারথির প্রস্থান)

কুশি : দাদা, মা আমাদের না বলেই চলে গেলেন।

লব : কুশিরে, মা বড় আঘাত পেয়েছেন। আমরা বড় অন্যায় কর্ম করে ফেলেছি।

কুশি : তুমি কোন চিন্তা করো না দাদা, চল আমরা এখন খেলতে যাই।

লব : তাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(সারতী ও সীতার প্রবেশ)

সীতা : কই হনুমান প্রভু আমার , প্রভু আমার।

সারতী : মা গো ঐ চেয়ে দেখ প্রভু তোমার ধুলায় লুটিয়ে রহেছেন।

সীতা : উ ভগবান। এ তুমি কি করালে ঠাকুর। এ দৃশ্য দেখার পূর্বে কেন তুমি আমার মৃত্যু দিলে না ঠাকুর। হতভাগিনীর আজ কী অবস্থা। কথা বল, কথা বল, একটিবার, শুধু একটিবার কথা বল। আমার ওপর অভিমান করে তুমি চলে গেলে। তুমি এই ভুবন বিজয়ী বীর সামান্য দুটি বালকের করে তোমার একি শোচনীয় পরাজয়।

সারতী : মা গো, মোছ আঁখি, ত্যাজ শোক, যে চলে গেছে শত কাঁদলেও সেতো ফিরবে না মা।

সীতা : ওরে হনুমান, তুই কি বলতে পারিস কি নিয়ে আজ আমি বেঁচে থাকব? আমার আর বাঁচবার সাধ নেই ॥ তুই চিতা জেলে দে। প্রভুর সঙ্গে একই চিতায় আমি আত্মাহুতি দেব।

(গীত)

আরো রামশূণ্য ধরা মাঝে, এই না সীতার
কি বা দাম
রামের সনে মুছে যাবে, আজি
সীতা দেবীর নাম ॥
আরো চিতা জ্বেলে দে রে বাছা
ঐ না পবনের নন্দন।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি আমি
ত্যাজিব জীবন ॥ (পতন)

{বাল্মীকির প্রবেশ}

বাল্মীকি : মা জানকী। ওঠ মা, তুমি আর দুঃখ কর না।

সীতা : পিতা আমার অজ একি হলো পিতা। আমি কিসের জন্য আর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকব। আমি আজ এ ছার পরাণ অনলে বিসর্জিব।

বাল্মীকি: না, মা, তুই আর দুঃখ করিস না। তোকে আর অনলে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে না। তোর স্বামীকে আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি। হে ঠাকুর, আমার সারা জীবনের সাধন ভজনের ফল যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে সেই পূণ্য ফলের বলে এদের সব পুনর্জীবন লাভ হোক। ওঠ বাবা রামচন্দ্র, মা সীতাকে সঙ্গে লয়ে তোমরা সবাই অযোদ্ধায় যাও। (রাম উঠিল)

www.pathagar.com

রাম : একি সীতা

সীতা : প্রভু

রাম : সীতা (আলিঙ্গন)

সীতা : প্রণাম তব চরণে প্রভু (প্রণাম)

রাম : ওঠো সীতা তুমি এখানে কেমন করে এলে।

সীতা : সে অনেক কথা প্রভু। পরে শুনাব।

রাম : সারতী সেই যুগল বীর কুমারদ্বয় কোথায়। তাদের তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

বাল্মীকি: তাদের সঙ্গে এখানে তোমার আর দেখা হবে না। রামচন্দ্র। তুমি সীতাকে নিয়ে অযোদ্ধায় যাও। আমি সময় মত সেই যুগলবীর কুমারদ্বয়কে নিয়ে অযোদ্ধার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হব। সেখানেই তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে।

রাম : কিন্তু আমার ভাই লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এরা সব কোথায়?

বাল্মীকি : তাকিয়ে দেখ, সবাইকে নিয়ে অযোদ্ধায় যাও, আমি এখন আসি। সময়ান্তে আবার সাক্ষাত হবে। (প্রস্থান)

(লক্ষণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতের প্রবেশ)

লক্ষণ : দাদা, দাদা!

রাম : আয়, আয়, ওরে স্নেহের দুলাল, বক্ষে আয় মোর, তোরা কোথায় ছিলি ভাই?

লক্ষণ : দাদা! এই সমর প্রাঙ্গনে শায়িত ছিলেম মোরা। কিন্তু কোথায় সেই বালক যুগল। সবাইকে দেখছি কিন্তু তাদের তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

বাল্মীকি (নেপথ্যে) : লক্ষণ তাদের পরিচয় তোমরা এখন পাবে না। তোমরা অশ্ব নিয়ে অযোদ্ধায় যাও। যজ্ঞ পূর্ণ কর। সেখানেই হবে পিতা-পুত্রের পরিচয় আর আমার এই তমসার তীরে সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি কর জয়বীর যুগল কুমারের জয় (৩)

সবাই : জয়বীর যুগল কুমারের জয়। {যবনিকা}

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

খেলাধুলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লোকের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এসব খেলাধুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলা হচ্ছে ফুটবল, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বউচি, কুতকুত, রাজা-প্রজা (চোর-পুলিশ নামেও কোন কোন এলাকায় পরিচিত), কানামাছি, লুকোচুরি, পাতাখুজি, ডাণ্ডাগুলি, খেলাবাড়ি, পুতুল বিয়ে, ভেতর-বাহির, দড়িলাফ, সাতচাড়া, এক্কা-দোক্কা প্রভৃতি।

এ জেলার প্রায় সব জায়গাতেই এসব খেলাধুলা হয়ে থাকে। বড় ধরনের খেলা, যেমন– ক্রিকেট, ফুটবল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রভৃতি প্রধানত বাগেরহাট স্টেডিয়াম, সরকারী পিসি কলেজ মাঠ, নুরুল আমীন স্কুলের মাঠ, কৃষ্ণনগর মাঠ, কচুয়া কলেজ মাঠ, সাইনবোর্ড স্কুল মাঠ ইত্যাদি মাঠে হয়ে থাকে। বিভিন্ন ক্লাবে খেলাচলে প্রায়ই। সূর্যশিখা ক্লাব, কৃষ্ণনগর ক্লাব, আবাহানী ক্লাব এসব নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এক গ্রামের সাথে অন্য গ্রামের খেলা সে এক মজার লড়াই।

১. লুকোচুরি

এই খেলটা সাধারণত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতের কাচের চুড়ি ভাঙা টুকরো গুলো নিয়ে খেলে থাকে। একটা সীমানা নির্ধারণ করা হয় প্রথমে। খেলাটা সীমানার মধ্যেই খেলতে হবে বাইরে যাওয়া যাবে না একজন চোখ বন্ধ করে রাখবে, অন্য জন কাচে টুকরাগুলো মাটিতে গর্তকরে লুকাবে। এমনভাবে লুকাবে যেন উপর থেকে বোঝা না যায়। ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত গোনা শেষ হলে চোখ খুলেই খোঁজা শুরু করবে খুঁজে পেলে চুরির টুকরাগুলো তার হয়ে যাবে, আর না পেলে গুনে গুনে সেই কয়টা টুকরা প্রতিপক্ষকে দিতে হয়ে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের একটি দলবদ্ধ খেলা এটি। আট-দশজন মিলে এ খেলা খেলতে পারে। হাতের পিঠ মেলানোর পদ্ধতিতে একজনকে চোর সাব্যস্ত হয়। চোরকে সবাই দূরের কোনো গাছ ছুঁতে বলে সেই ফাঁকে সবাই আড়ালে-আবডালে আত্মগোপন করে। চোর ফিরে এসে সবাইকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যাকে চোর আগে দেখে ফেলে, পরের বার সে চোর হয়। তবে চোরের চোখ এড়িয়ে কেউ যদি চোরের মাথায় হাত দিতে পারে তাহলে চোর আবারও চোর থেকে যায়। কেউ পরপর সাতবার চোর হলে তার চোখ বেঁধে তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করে। এ অঞ্চলে এ খেলাকে 'পলাপলি' বলা হয়।

২. সাতচাড়া

এটি আর একটি মজার খেলা কিন্তু পরিশ্রমী ও বুদ্ধির খেলা। প্রথমে দুটি দুটি দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে। একটি ইট ও সাতটি বড় বড় মাটির পাত্র ভাঙা চাড়াও একটি বল থাকবে। লটারিতে সে পক্ষ দান পাবে তাদের এ জন দাগের কাছে থাকবে অন্য কজন

নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নেবে। প্রথমে দাগের অন্য প্রান্তে একটি ইটের ওপর সাতটি চাড়া সাজিয়ে রাখতে হবে। প্রতিপক্ষ দলেরা ইটের চারপাশ ঘিরে দাড়িয়ে একজন ৭টি করে বল মারতে পারবে। এই বল মেরে বল চলে যাবে প্রতিপক্ষের হাতে। প্রতি পক্ষের বল থেকে নিজেকে রক্ষা করে ঐ ইটের ওপরে চাড়াগুলো সাজিয়ে রেখে আপ বলতে হবে। কিন্তু প্রতিপক্ষ লোকেরা কিছুতেই ইট থেকে দূরত্বে যায় না ইটের আশে পাশেই ঘোরে যাতে কেউ চাড়া তুলতে না পারে যদি কেউ কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে তবে তার গা বল ছুড়ে দেয়। লেগে গেলে সে এই দান থেকে সে বাদ পড়বে। আর না লাগাতে পারলে বল দূরে চলে যাবে সেই সুযোগে চাড়া সাজাতে পারলেই গেম।

৩. পুতুল বিয়ে

পুতুল বিয়ে সাধারণত মেয়েরাই বেশি খেলে থাকে। ছোট মেয়েরা নিজেদের খেলার সাথির সাথে পুতুলের বিয়ে দেয়। অনেকটা সত্যিকার বিয়ের মতোই গায়ে হলুদ হয়। পয়নামা পাঠায়, গুড়ের সিন্নি করে আসে পাশের খেলার সাথীদের খাওয়ায়। তারপর বর আসে বিয়ে হয়। খিচুড়ি রান্না করে, কেউ পায়েস রান্না করে, অনেকে আবার মুড়ি, চানাচুর দিয়েও পুতুল বিয়ে দেয়।

তবে এসব খেলা সাধারণত শীতকালে বেশি হয়ে থাকে। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এসব খেলার ধুম পড়ে যায়।

বাগেরহাট পৌরসভায় ঘূর্ণিফল নামক একটি ফল দিয়ে ১৬ টি গর্ত করে মাটিতে স্থানীয় ছেলে মেয়েরা রাজা-প্রজা নামক একটি খেলা খেলে। সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিপীড়নে এসব খেলা প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে মাটির চাড়া দিয়ে কিত কিত খেলা এখন তো প্রায় আর দেখাই যায় না। বাগেরহাট এর উল্লেখযোগ্য খেলাধুলা প্রধান হচ্ছে, ফুটবল, ক্রিকেট, হা-ডু-ডু- নৌকা বাইচ, গোল্লা ছুট, বৌচি, ডাংগুটি ইত্যাদি। প্রতিবছর বিভিন্ন উপজেলা থেকে বাহারীসব নৌকা আসে বাইচের অনুষ্ঠানে, ভৈরবের বুকে, তাদের উত্তাল নৃত্য দেখতে হাজার, হাজার মানুষ জড়ো হয় নদীর তীরে।

৪. এক্কাদোক্কা

এটি সাধারণত মেয়েদের খেলা। উঠান বা খোলা জাগয়ায় মাটির ওপর দাগ কেটে একটি আয়তাকার ঘর করা হয়। ঘরের ভেতরে আড়াআড়িভাবে সরল রেখা টেনে ছয়টি খোপ করা করা হয়। কোথাও কোথাও চার ও ছয় নম্বর ঘর খাড়া রেখা কেটে দুই ভাগ করা হয়। চার নম্বর ঘরটি হচ্ছে বিশ্রামগার (এ অঞ্চলে 'মালখোপ' বলে)। নিচ থেকে ঘর ঘুলির নাম যথাক্রমে এক্কা, দোক্কা, তেক্কা, চৌক্কা, পক্কা ও লাষ্ঠি। ভাঙা হাঁড়ি বা কলসির গোলাকার টুকরো (তরমুজের খোসা বা পুরোনো স্যান্ডেলে কেটে বানানো চাকতি) এ খেলার খেলার উপকরণ। খেলার সময় এক এক করে প্রতিটি ঘরে চাড়া ছুঁড়ে এবং এক পায়ে লাফ দিয়ে দাগ পার হয়ে ওই চাড়া পায়ের আঙুলের টোকা দিয়ে বাইরে নিয়ে আসা হয়। চাড়া কোনো দাগের ওপর থেমে গেলে অথবা দুই পাশের রেখা অতিক্রম করে গেলে সে দান হারায়। তখন দ্বিতীয় জন দান পায়। যে সফলভাবে সব ঘর পার হয়ে আসতে পারে তারই জিত হয়।

www.pathagar.com

৫. কড়িখেলা

চার-পাঁচজনের দলবদ্ধ বা একক খেলা। সমান আকারের ছোট চারটি কড়ি এর উপকরণ। প্রথমে একজন কড়ি দিয়ে চাল শুরু করে। সে কড়িগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে এমনভাবে মাটির ওপর গড়িয়ে ফেলে, যাতে সেগুলি পরস্পরেরর গা ছুঁয়ে কিংবা বেশি দূরে ছড়িয়ে না পড়ে। এরপর তর্জনীর টোকা দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় কড়িগুলি মারতে হয়। সফল হলে সে দুই পয়েন্ট পায়, আর বিফল হলে দান হারায়। এ ছাড়া দুই বা ততোধিক কড়ি গা ছুঁয়ে পড়লেও সে দান হারায়। তখন অন্য জন খেলার সুযোগ পায়। এভাবে পালাক্রমে কড়িখেলা হয়। কড়িখেলার কয়েকটি বিশেষ নিয়ম হলো এই যে, চালের সময় কড়িগুলো উপুড় হয়ে পড়লে ওই খেলোয়াড় এক পয়েন্ট পায়, আর যদি চিত হয়ে পড়ে, তাহলে সকলে দ্রুত সেগুলি তুলে চুম্বন করার চেষ্টা করে। যে সফল হয় সে প্রতিটি কড়ির জন্য এক পয়েন্ট পায়। এভাবে খেলে বেশি পয়েন্ট পায় সে জয়ী হয়, আর যে ব্যর্থ হয় তার হার হয়। এ পর্যন্ত হচ্ছে কড়ি খেলার প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে 'জোড়-বিজোড়' ধরা। এ ক্ষেত্রে মুঠ করা হাতে জোড়, না বিজোড় সংখ্যার কড়ি আছে, তা পরাজিত খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করা হয়। বলতে পারলে কড়ি তার দখলে যায়, না পারলে জয়ী খেলোয়াড় পয়েন্ট পায়। এভাবে হাত খালি হওয়া পর্যন্ত সে যত পয়েন্ট পায়, পরাজিত খেলোয়াড়কে তত কিল মারার সুযোগ পায়।

৬. কানামাছি

বাংলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত। উঠানের খোলা জায়গায় ছোট ছেলেমেয়েরা আলাদাভাবে কিংবা একসাথে এ খেলা খেলে। এ খেলায় প্রথমে কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বাঁধা হয়। সে হয় 'কানা'। অন্যরা 'মাছির মতো চারদিক থেকে ঘিরে তার গায়ে মৃদু টোকা দেয়, আর মুখে ছড়া বলে: 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ। চোখবাঁধা অবস্থায় সে তাদের একজনকে ধরার চেষ্টা করে। এ সময় সেও ছড়া কাটে; 'আন্ধা গোন্ধা ভাই, আমার দোষ নাই।' সে কাউকে ধরতে পারলে পরবর্তী খেলায় তাকে কানা সাজতে হয়। কানামাছি খেলার এটাই নিয়ম।

৭. গুলিখেলা

এটি মার্বেল খেলা নামেও পরিচিত। ব্রিটিশ আমলে এ দেশে কাঁচের গুলি বা মার্বেলের আমদানি হয়। তার আগে মাটির গুলি আগুনে পুড়িয়ে তার সাহায্যে খেলা হতো। গ্রামাঞ্চলে এখনো মাটির গুলির প্রচলন আছে। খোলা উঠোন বা মাঠে ছোট একটা গর্ত করে সাত-আট হাত দূরে দাগ কেটে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। তারপর দুই বা ততোধিক বালক মিলে গুলি খেলে। যে দান পায় সে সকলের গুলি নিয়ে দাগ থেকে ছুঁড়ে গর্তে ফেলার চেষ্টা করে। যার গুলি গর্তে পড়ে সে সরাসরি সেগুলোর দখল পায়; আর যেগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে সেগুলির যেকোনো একটি প্রতিপক্ষের নির্দেশমতো নিজের অপর একটি গুলি দিয়ে আঘাত করে। সফল হলে সে গুলিটিও তার দখলে আসে। আর মারার সময় যদি নিজের গুলিটি অন্য কোনো গুলিকে স্পর্শ করে, তাহলে

www.pathagar.com

শাস্তি স্বরূপ তাকে একটি গুলি দিয়ে দিতে হয়। দ্বিতীয় জন অবশিষ্ট গুলি নিয়ে একই পদ্ধতিতে খেলতে থাকে।

৮. গোলাপ-টগর

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধ খেলা। সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে দুই দলের মধ্যে এ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। দলের প্রধান দুজনকে বলা হয় রাজা। পনেরো-বিশ হাত দূরে দলদুটি মুখোমুখি অবস্থান করে। খেলার শুরুতে এক দলের রাজা ফুল-ফলের নামে নিজ দলের সব সদস্যের প্রতীকী নাম রাখে। তারপর সে বিপক্ষ দলের যেকোনো একজনের চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে 'আয়রে আমার গোলাপ ফুল' বা 'আয় রে আমার টগর ফুল' ইত্যাদি নামে ডাকে। সে তখন অতি সন্তর্পণে এসে বালকটির কপালে মৃদু টোকা দিয়ে নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। এরপর চোখ খুলে দিলে উক্ত খেলোয়াড়, যে কোটা দিয়েছে তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। সফল হল সে সামনের দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়, না পারলে সে কোটা দিয়েছে সে-ই এগিয়ে যায়। এবার বিপক্ষের রাজা একইভাবে খেলে। এভাবে লাফ দিয়ে মধ্যবর্তী সীমানা অতিক্রম করে প্রতিপক্ষের মাঠ দখল না করা পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে। যে দল সফল হয় সে দলের রাজাকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা হাতের দোলায় পদ্মাসনে করে সীমানা পারাপার করে।

৯. গোল্লাছুট

সাধারণত খোলা মাঠ অথবা বাগানে খেলা হয়। প্রথমে একটি ছোট গর্ত করে সেখানে একটি কাঠি পুতে রাখা হয়। একে বলে গোল্লা এবং একটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সীমানা। পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে কোনো গাছ কিংবা ইট-পাথরকে বাইরের সীমানারূপে চিহ্নিত করা হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে বাইরের সীমানার গাছ-পাথরকে স্পর্শ করাই এ খেলার মূল লক্ষ্য। আর এ থেকেই খেলার নাম হয়েছে গোল্লাছুট। পাঁচ-সাতজনের দুই দলের সমানসংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গোল্লাছুট খেলায় একজন প্রধান থাকে, তাকে বলা হয় 'রাণী'। সে গোল্লা ছুঁয়ে দাড়ায়, অন্যরা তার ও নিজেদের হাত পরস্পর ধরে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষ খেলোয়াড়রা সুবিধামতো স্থানে দাড়িয়ে ওঁৎ পেতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কারো হাত ছুটে গেলে সে দৌড়ে গিয়ে গাছ ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ছোঁয়ার আগে বিপক্ষের কেউ তাকে ছুঁয়ে দিলে সে 'মারা' যায় অর্থাৎ এবারের খেলা থেকে সে বাদ পড়ে। গোল্লা ছেড়ে শেষ পর্যায়ে রাণীকেও দৌড়াতে হয়। যে কজন সফল হয়, তারা গর্ত থেকে জোড় পায়ে সীমানার দিকে লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়। সব লাফ মিলিয়ে সীমানা ছুঁতে পারলে এক 'পাটি' হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দুই পক্ষের খেলা চলতে থাকে।

১০. ঘুঁটিখেলা

সাধারণত মেয়েদের খেলা। পাথরের পাঁচটি গোল টুকরো নিয়ে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে একটু বড় ঘুঁটিকে 'ডাগ' বলে। কড়ি খেলার মতো শুরুতে ঘুঁটিগুলো

www.pathagar.com

মাটির ওপর ছড়িয়ে ফেলতে হয়। জোড়া লাগলে দান হারাতে হয়। ঠিকমতো পড়লে 'ডাগ' তুলে ওপরে ছুড়ে মাটিতে পড়ার আগে দ্রুত এক বা ততোধিক ঘুঁটি কুড়িয়ে সেটি লুফে নিতে হয়। ডাগ মাটিতে পড়ে গেলে সে দান হারায়। এভাবে লোফালুফির নানা জটিল প্রক্রিয়ায় এটি খেলতে হয়। প্রক্রিয়াগুলি যে আগে শেষ করে, সে 'পাকে' অর্থাৎ জয়ী হয়। শেষ পর্যন্ত যার হার হয়, তাকে জোড়-বিজোড় পদ্ধতিতে কিল খেতে হয়। মনোযোগ ও হাতের ক্ষিপ্রতার ওপর এ খেলার জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সাধারণত বর্ষার দিনে মেয়েরা বারান্দায় বসে ঘুঁটি খেলে।

১১. ওপেনটি বায়োস্কোপ

দুজন সামান্য দূরত্বে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের হাত উঁচু করে ধরে। অন্যরা সারি বেঁধে ওই হাতের নিচ দিয়ে চক্রাকারে ঘোরে। আর সবাই মিলে 'ওপেনটি বায়স্কোপ' ছড়া আবৃত্তি করে। ছাড়র শেষ পঙ্‌ক্তির (আমার নাম জাদুমণি/ যেতে হবে অনেকখানি) শেষ শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ওই দুজন কাছের কোনো মেয়েকে ধরে ফেললে সবাই মিলে তাকে ওপরে তুলে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে। এভাবেই এ খেলা শেষ হয়।

১২. বাঘবন্দি

এতে দাবা খেলার মতো আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রতি লক্ষ রেখে গুটির চাল দিতে হয়। মাটির ওপর দাগ কেটে বাঘবন্দির ছক তৈরি করা হয়। আয়তাকার একটি ছকের অভ্যন্তরে আলম্ব ও উলম্বভাবে ষোলোটি সমানসংখ্যক ঘর করা হয়। এই ছকের চারটি মূল কেন্দ্রে পাঁচটি করে মোট বিশটি গুটি বসানো হয়। এগুলোকে বলা হয় 'বকরি'। 'বাঘ' নামে অপেক্ষাকৃত বড় দুটি গুটি অন্য যেকোনো স্থানে বসানো হয়। এরপর দুপক্ষের একজন বাঘ, অপরজন বকরি গুটির চাল দেয়। বকরির চেষ্টা হলো বাঘের গতি রোধ করা, আর বাঘের চেষ্টা হলো চালের সুযোগ নিয়ে একটি একটি করে বকরি শিকার করা। সরলরেখা বরাবর লাফ দিয়ে ফাঁকা ঘরে পৌঁছাতে পারলে একটি বকরি মারা পড়ে। ফাঁকা ঘর না পেলে বাঘ লাফ দিতে পারে না অর্থাৎ তার চাল বন্ধ হয়ে যায়। বাঘের চাল বন্ধ হলে বকরির জয়, আর সব বকরি শিকার করলে বাঘের জয় হয়। তাই ভেবেচিন্তে খুব সতর্কতার সঙ্গে গুটির চাল দিতে হয়।

১৩. পুতুলখেলা

এটি মেয়েদের খেলা। কাপড় অথবা মাটির তৈরি পুতুল দিয়ে এক একটি পরিবার বানানো হয়। পুরোনো কাপড়ের অংশ দিয়ে পুতুলগুলোর পোশাক, কাঁথা ও বালিশ বানানো হয়। তাদের আলতা, কাজল দিয়ে সাজানো হয়, গয়না পরানো হয়। একজন তার পরিবারের মেয়েকে অন্যজনের পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে দেয়। এভাবে নিজেরা আত্মীয়তা করে। সন্তান লালন, সংসার জীবনের খুঁটিনাটি অনুষঙ্গ এতে সুন্দরভাবে উঠে আসে। অনেক সময় একজন মেয়ে নিজে নিজে দুটি পক্ষ বানিয়ে পুতুল খেলে।

www.pathagar.com

১৪. ষোলোগুটি

ষোলোটি করে গুটি নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এ খেলা হয়। বাঘবন্দি খেলার ছকের দুই প্রান্তে অতিরিক্ত দুটি ত্রিভুজ আকৃতির কাঠামো থাকে। খেলোয়াড়রা নিজ নিজ সীমানায় এক এক করে গুটি সাজায়। তারপর একজন একটি গুটি সুবিধামতো সামনের ঘরে ঠেলে দিয়ে খেলা শুরু করে। লক্ষ্য হলো, প্রতিপক্ষের গুটি মারা। কেবল লাফ দিয়ে চালের সুযোগ পেলে গুটি মারা পড়ে। গুটি মেরে একপক্ষের ঘর শূন্য করতে পারলে অথবা তার চাল রোধ করতে পারলে খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এটি অনেকটা দাবা খেলার মতো। একে দাবা খেলার সরল সংস্করণও বলা যায়।

১৫. লাঠিখেলা

তিন-চার হাত লম্বা তৈলাক্ত মসৃণ লাঠি এ খেলার উপকরণ। খেলোয়াড়রা কখনো এককভাবে, কখনো দ্বৈতভাবে সামনে, পেছনে, পাশে, মাথার ওপর, দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে নানা কৌশলে ক্ষিপ্র গতিতে লাঠি ঘুরিয়ে এ খেলা দেখায়। এ খেলা সাধারণত যুবকেরা খেলে।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

১. পতিতাবৃত্তি

বাগেরহাট পৌরসভার বাজার মেইন রোড পিয়াজপট্টিতে অবস্থিত পতিতালয়। লাইট হলের পেছন এই পাড়াটায় ছোট বড় মিলিয়ে মোট ২৫০টি ঘর রয়েছে। আশ্চার্যজনক বিষয় হল এদের পাশেই গেরস্থ ঘর। এদের একই জায়গায় অবস্থান দেখলে মনে হয় সকলে একসাথে মিলে মিশে আছে। বাজার এদের এতোটা পাশে যে, প্রয়োজন মতো এরা যখন তখন বাইরে চলে আসতে পারে, কেনা কাটা সেরে আবার নিজেদের ঘরে ফিরে যায়। দেখলে মনে হয় না, যে এরা সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণির মানুষ।

একজন মাসীর নিয়ন্ত্রণে ৪-৫টি মেয়ে থাকে। মাসী তাদের থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে থাকেন। বিনিময়ে তারা তাদের দৈনিক আয় মাসীর হাতে তুলে দেয়। পুলিশের ঝামেলা থেকেও মাসী তাদের রক্ষা করে। বলা বাহুলা যে, মাসীও একটা সময় এই ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চাহিদা যখন কমে যায় তখন সে অল্প বয়সী মেয়েদের দায়িত্ব নেন, মাসী হয়ে ওঠেন।

এ পল্লীর একটি মেয়ে নাসরিন, বাড়ি নাজিরপুর, ৩ বোন ও বাবা মায়ের ছোট্ট একটা সুখের সংসার ছিল। দরিদ্রতা তাদের সংসারের সুখের চাবি কেড়ে নেয়। কাজের সন্ধানে শহরে আসে নাসরিন। সেখানে দেখা হয় মর্জিনার সাথে, মর্জিনা নিয়ে যায় গৌরি মাসীর কাছে। তখনও সে জানত না- তাকে কি কাজ করতে হবে। যখন সে জানতে পারল তার কাজের ধরণ, তখন আর কোন উপায় ছিল না। অর্থের প্রলোভন আর লোক লাজের ভয়ে শুরু করল পতিতা ব্যবসা। ভুলে গেল ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করা নাসরিন তার পরিবার পরিজনের কথা।

বাড়িতে নাসরিনের অসুস্থ পিতা মাতার ও ২ বোন অতিকষ্টে জীবন যাপন করছে। আয়ের পথ নেই, মা এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে যা পায় তাই নিয়ে কেটে যেতো, এখন আর না খেয়ে থাকতে হয় না। ওরা সবাই ভাল আছে। বাড়ির সবাই জানে, নাসরিন শহরে একটা এনজিওতে চাকরি করে বাসা নিয়ে থাকে। সত্যিটা জানলে হয়তো তারা তার টাকা ব্যবহার করত না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নাসরিনের বোন আদুরী শহরে বোনের কাছে বেড়াতে আসতে চায় কিন্তু নাসরিন আনতে চায় না। একদিন বাবা মায়ের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, শহরে এসে বোনের কাছে ফোন করে। নিরূপায় নাসরিন বোনকে নিয়ে আসে। ২দিন, ৩দিন আদুরী, একসময় আসক্ত হয়ে পড়ে এ কাজে। ওর বয়স ১৪ বছর। এমন বয়সে এই কাজ, কী হবে ওর ভবিষ্যত। নাসরিনও ওকে নিষেধ করেছে বারবার কিন্তু বোনের বসবাস, ব্যবসা কাঁচা টাকার গন্ধ ওকে সামাজিক বিধি নিষেধ সম্পর্কে বিবেকশূন্য করে দিয়েছে। ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি ওর নেই। আর কতইবা বয়স, কিবা বুঝবে।

www.pathagar.com

অর্থের সমস্যায় মানুষের বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে আর একটা জীবন নষ্টালজিয়ায় নিমজ্জিত হল। এতে ওদের ভেতর কোন চিন্তা নেই, কোন ভবিষ্যত ভাবনা নেই, শুধু বর্তমানকে নিয়ে ডুবে আছে সুখে থাকার স্বপ্নে।

এর পাশেই একটি স্কুল রয়েছে কিন্তু সেখানে পাঠানোর সময় হয় না এদের ছেলে-মেয়েদের। এসব বাচ্চারা এভাবেই বেড়ে ওঠে। ছেলে বাচ্চারা বড় হতে থাকে নেশার দ্রব্য নিয়ে খেলতে খেলতে আর মেয়ে বাচ্চার বয়স হওয়ার আগেই মায়ের ব্যবসার সহযোগী হয়। ছেলেরা বড় হলে ভাল মন্দ বুঝে গেলে বাইরে চলে যায়। বাইরের জগতে ইনকাম করে চলে। অনেকে মায়ের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায় কিন্তু এই বিচার বেশিক্ষণ থাকে না। নেশার আসক্ততা তাদের সন্ত্রাসী বা মাদক ব্যবসায়ী করে তোলে। মেয়েদের দালাল করে তৈরি করে। এই পাড়ার চারপাশে হিন্দু গেরস্তদের বাড়ি, তাই সহজেই এদের পূজা পার্বনের উৎসবগুলোতে এরা উৎসব করতে পারে আর মুসলিম উৎসবগুলো ব্যক্তিগতভাবে অনেকে পালন করে, তবে ওদের মতো করে। নেশা করে মাতাল সেজে পাগলামী করে উৎসব করে। এই কর্মীরা যখন আস্তে আস্তে বয়স্ক হয়ে যায় তখন তার আর কোন আয় থাকে না। কাস্টমার তাকে আর পছন্দ করে না। তখন তার আর কোন উপায় থাকে না, কেননা বাইরের সমাজেও তাকে কোন স্থান দেয় না। আর যে সব মেয়েদের টাকা থাকে, তারা আরও ৪-৫ মেয়েকে খাটায় তাদের দিয়ে ব্যবসা চালায় কিন্তু সকলে তো আর মাসী হয়ে উঠতে পারে না। তারা গোপনে রাস্তায় কাজ করে ভিক্ষা করে এভাবে কাটিয়ে দেয় বাকি জীবন।

রুনা, বয়স ১৬ বছর, এসেছিল বানিশান্তার ব্রয়েল থেকে। নতুন মেয়ে রমরমা ব্যবসা হচ্ছিল তার। এমন সময় নাগেরবাজার লেকের পারের মাছুম তার ঘরে আসে, আকর্ষণীয় চেহারা ও সাজগোজ তাকে মুগ্ধ করে তোলে। একদিন দুদিন এভাবে ভালো ভালো কথা বলে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। এক সময় রুনা মা হতে চলে, তবুও আশা ছাড়ে না সংসার বাঁধার। কিন্তু বিধি বাম, মাছুমের পরিবার বাঁধা হয়ে দাড়ায়। বাবা নেই মায়ের সুদে টাকা লাগানোর ব্যবসা থেকে সংসার চলে তার, তার উপর ছোট মেয়ে লিপির ২ সন্তান তার কাছে থাকে। এই সংসারে পাড়া থেকে সন্তান সম্ভাবা একটি মেয়েকে কিছুতেই বউ হিসেবে মেনে নিবে না। এভাবে ১ দিন ২ দিন করে আসে তবু বিয়ে হয়নি রুনার। সংসার সাজাতে পারেনি সে, কি হবে রুনার, কি হবে তার সন্তানের ভবিষ্যত, কেউ জানে না।

প্রথমে অনেকেরই এমনভাবে বাচ্চা জন্মায়। বাবার পরিচয়হীন এসব শিশু অবহেলিতভাবে বড় হচ্ছে। মা সারাদিন ব্যস্ত থাকে কাষ্টমার সামলাতে আর বাচ্চারা ঘরের বাইরে একা বা পাশের কোন বাচ্চার সাথে ধুলার মধ্যে খেলা করে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে সাজগোজ শুরু করে। সাজতে সাজতে নিজেকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে ঘর থেকে বেরিয়ে দোকানের পাশে বা গলির মোড়ে গিয়ে দাড়ায়। সেখানে নাসরিন আদুরীর মত আরোও ৬১ জন থাকে। শুরু হয় কাষ্টমার ধরার পালা। কাষ্টমার নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি, ঝগড়া লেগে যায়। বিচারে বসে মাসীরা, মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। অনেক সময় পুলিশ পর্যন্ত এই ঝগড়া

www.pathagar.com

মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করে। ছোট্ট গলিতে সারি সারি দাড়িয়ে থাকে তারা, কখন ১টা কাষ্টমার আসবে। অনেকে ফোন করে আগে থেকে সময় করে রাখে তারা তাদের পরিচিত জনের কাছে চলে যায়।

সকাল ৮ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা কাষ্টমারের যাওয়া আসায় কোন বিধি-নিষেধ নেই কিন্তু এরপরে আর বাইরের কাষ্টমার ভেতরে যেতে পারে না। কিছু কিছু কাষ্টমার আছে যারা ছলনা করে ওদের কাছ থেকে শারীরিক ও আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকে ভালোবাসার কথা বলে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়। পরে সমাজ পরিবারের চাপে সবকিছু ভুলে যায়। প্রচণ্ড হতাশা আর কষ্টে কাটে কিছুদিন তারপর আবার ফিরে আসে আগের জীবনে পুরোনো স্বপ্নে।

২. হিজরা

ওরা না পুরুষ, না নারী। প্রকৃতির এক বিশেষ সৃষ্টি। বাগেরহাট শহরের নাগেরবাজার এলাকার লেকের পাড়ে এরা আলাদা আলাদা ঘর ভাড়া করে থাকে। ওদের সাথে কেউ মেশে না। নিজেরা নিজেদের মতো করে থাকে। সব সময় হাসি, আনন্দ, ঝগড়া, ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে সময় কেটে যায়। সকাল বেলা রান্না সেরে কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে দোকানে চা পান খেতে, এর মধ্যে শাহানাজ, পায়েলও প্রস্তুত হয়ে চলে আসে গ্রামে গ্রামে ঘুরবে বলে। ওরা সমাজ থেকে আলাদা থাকে। সমাজের অন্য সবার মতো মিলে মিশে থাকতে পারে না। ওদেরকে সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চোখে দেখে। ওদেরকে সবাই হিজরা বলে সম্বোধন করে। যেহেতু না পুরুষ, না মহিলা- এজন্য বিয়ে বা সংসার করার প্রসঙ্গ আসে না, সংসারের সদস্য আর একজন তারই মতো হিজরা। সংসার পরিবার পরিজন ছেড়ে নিজেকে এইভাবে মানিয়ে নিয়েছে।

সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ে কার সদ্যজাত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। এটা তারা পাবে, এর বাইরে যেতে পারবে না। এদের কানে খবর পৌঁছে যায় যে, কোথায় বাচ্চা জন্মেছে। সেখানে গিয়ে তাদের চাহিদা জানায়, যেমন- বিল্ডিং বাড়িতে হাজার টাকা, শাড়ি, ১ কুলা চাল, আলু, পেয়াজও দাবী করে, এমন কি আদায়ও করে নেয়। আপত্তিকরভাবে ওরা চলা ফেরা করে, কেনা-কাটা করে, কোনরূপ তোয়াক্কা করে না কাউকে। যানবাহন যেমন- রিক্সা, ট্যাম্পু, বাসে চলাফেরা করে কিন্তু ঠিকমতো ভাড়া দেয় না। অবশ্য ড্রাইভারাও ছেড়ে দেয়। সকলে ওদের দুর্বলতাকে বড় করে দেখে। কিন্তু তারপরেও ওরা ভেতরে ভেতরে খুব কষ্টে থাকে। লিজা বলে ওর খুব শখ করে স্বামী থাকবে, সন্তান থাকবে, পরিবার পরিজন থাকবে কিন্তু বিধাতা এ আশা কখনো পূরণ করবে না।

পায়েলের বাড়ি ছিল ফকিরহাট। সমাজের প্রচণ্ড অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জীবন থেকে বেরিয়ে দলে এসে যোগ দিল। এখন হাসি-আনন্দে থাকতে পারে। প্রতিদিন যা আয় করে তাই নিয়ে খুব ভালো আছে। ওরা প্রার্থনা করে, সব সময় যেন ওদের মতো এরকম অবহেলিত জীবন নিয়ে আর কেউ জন্মগ্রহণ না করে।

আর যদি গেরস্থ নিম্নমধ্যবিত্ত হয় তাহলে টাকার অংক কিছুটা কমে, কিন্তু চাল ও অন্যান্য জিনিসগুলো দিতে হয়। যদি কেউ দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে এমন

www.pathagar.com

গালিগালাজ ও আচরণ শুরু করে তাতে ঐ পরিবার ধার করে হলেও দিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় ঝগড়া করতে করতে মাড়ি খুলে ফেলে, তারা বোঝাতে চায় সে সবার মতো তাদের শারীরিক গঠনের নয় সেহেতু তাদের না দিলে তারা কিভাবে চলবে। তাদের দায়িত্ব কেউ নেবে না, এভাবেই তাদের চলতে হয়। এরপর টাকা, শাড়ি এগুলো পেয়ে কুলা ভরা চাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে। এদের দেখলে মহিলা বলে মনে হয়। কিন্তু মহিলাদের মতো শারীরিক গঠন নয়। তবু ওরা সুন্দর শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট পড়ে। মুখে লাগায় বিভিন্ন রঙ্গের মেকাপ। মাথায় চুলে কারো থাকে কাটা, কেউবা ফিতা দিয়ে খোঁপা করে। মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য বাংলা হিন্দি সিনেমার সুপার হিট গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচে তারা। যেমন-

দেখাহে প্যাহলিবার সাজানকি আখোলে প্যায়
বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না

এই ভাবে একের পর এক বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায়, আসলে এটাই তাদের আয়ের একটা কৌশল।

লিজা, শাহানা, পায়েল জহীর বাচ্চু, তপন সাহা, শাহ আলম ভাণ্ডারী, শাহাদাৎ মাল, জলিল ভাণ্ডারী, হাসিনা বয়াতি, খোকন বয়াতি ও অন্ধ গায়ক সোহেল। মোস্তাফিজুর রহমান নামে একজন কবিতা লেখেন, প্রকাশ করেন এবং হাটে, বাজারে সুর করে তালে তালে কবিতা পড়ে তা বিক্রি করে জীবিকার্জন করেন।

৩. ঘরামি/ছৈয়াল/বাউয়ালি

মোরেলগঞ্জ উপজেলার ঘর বাড়ি প্রধানত কাঠের তৈরি এবং টিনের ছাউনি। সামর্থ থাকলে পাকা বাড়ি বা দালান তৈরি না করে কাঠের দোতলা ঘর তৈরি করে। কাঠের দোতলা বাড়ি এই উপজেলার আভিজাত্যের পরিচয়। হাট-বাজার, জীবন-জীবিকার প্রয়োজন ছাড়াও লোকজ সংস্কৃতির বিকাশে ভূমিকা রাখে। চাষী তার উৎপাদিত সামগ্রী এখানে এনে বিক্রি করে। মৃৎ শিল্পী কাঠ শিল্পী এবং বাঁশ ও বেত শিল্পীরা তাদের দ্রব্য সামগ্রী এখানে এনেই বিক্রি করে। এই সকল হাট বাজার ছাড়া তাদের জীবন-জীবিকা কঠিন হয়ে পড়ত এবং এই ধরনের লোকজ শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যেত।

৪. সুন্দরবনের দুবলায় শিশু শ্রম দাস

দুবলা বঙ্গোপসাগরের একটি ঐতিহাসিক চর। সুন্দরবনের সর্ব দক্ষিণের সাগর উপকূলবর্তী চর এটি। সমুদ্র বন্দর মংলা থেকে ৯০ কি.মি. দক্ষিণে এই চরের অবস্থান। দুবলার চর সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাংলাদেশ বন বিভাগের খুলনা সার্কেলের নিয়ন্ত্রনাধীন। এই চর ৮৯° ৩৬ মিনিট দ্রাঘিমাংশ এবং ২১° ৪৫মিনিট অক্ষাংশ অবস্থিত। দুবলার চরে জমির পরিমাণ রয়েছে ১০৫২৬ হেক্টর। চরের গাছ পালার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাখি রয়েছে। তার মধ্যেও মদন টাক, টিল ঈগল, শকুন, গাঙচিল, মাছরাঙ্গা, শামকখর, শালিক, কাঠঠোকরা, বাটাং, কাদাখোচা, ফিনফুট, পাকৌড়ি এবং সাদা বক বেশি দেখা যায়। চরের খাল গুলিতে রয়েছে বেশ কিছু লবণ পানির কুমির।

www.pathagar.com

দুবলার চরে প্রতি বছর ৬০০ থেকে ৬৫০ জন জেলে বহদ্দার অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করে সববাস করেন। শীত মৌসুমে জেলেরা বঙ্গোপসাগরে জাল পাতেন মাছ ধরার জন্য। জেলেরা সাধারণত মেদ, রূপচাঁদা, কোরাল, ছুরি, লইট্যা, শাপলা পাতা, হাঙ্গর, করাত, চালি এবং টাইগার চিংড়ি সমুদ্র থেকে আহরণ করে থাকেন।

জেলেদের এই কাজে সহযোগীতার করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের এখানে নিয়ে আসা হয। বিশেষ করে জেলে বহরের সর্দার যাকে বদ্দ বলা হয়, তারাই এই বাচ্চাদের সংগ্রহ করে থাকেন। বহর দাররা এই বাচ্চ সংগ্রহের জন্য দালালদের সাথে যোগাযোগ করেন এই দালাল বা দালালী বৃত্তির সঙ্গে জড়িত নয়। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিশু, নারী পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত। এই দালালরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। এরা রেলাস্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল, বাস স্ট্যাণ্ড সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিন্নমূল শিশুদের সংগ্রহ করে। এই ছিন্নমূল শিশুদের মধ্যে বাড়ি পালানো শিশুর সংখ্যা বেশি। বাড়িতে মা-বাবার সাথে ঝগড়া, ঠিকমত খাবার না পাওয়া বন্ধুদের সাথে বেড়ানোর পরিকল্পনা, অনেক সময় সৎ মায়ের অত্যাচারে এই সকল শিশু বাড়ি থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থান মনে করে আশ্রয় নেয় রেলওয়ে প্লাটফর্মে, লঞ্চ ও জাহাজ টার্মিনালে। এই সমস্ত শিশুর কাছে থাকা টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলে এরা অনাহারে দিন যাপন করতে থাকে। দালালরাও ঠিক এই সুযোগটি লুফে নেয়। দালালরা এভাবে শিশুদের কাজ দেবার নাম করে নিয়ে যায়। শিশুরা ভাল কাজের লোভে, খাবারের লোভে দালালদের সাথে দুবলায় পাচার হয়ে যায়। দুবলায় যাবার পর শিশুদের উপর অমানুষিক নির্যাতন হয়। শিশুদের ট্রলার বোঝাই করা মাছ বেছে রোদে শুকাতে হয়। লইট্যা মাছ বাছতে বাছতে শিশুদের হাতে ঘা হয়ে যায়। শিশুরা একসময় সাগর থেকে পালানো চেষ্টা করে, কিন্তু পালানোর পথ নাই, শিশুরা সুন্দরবনের পথে পালানোর সময় বাঘের ও সাপের আক্রমণে অনেকেই মারা যায়। দুবলার চরে বর্তমানে তিন শতাধিক শিশু শ্রমে নিয়োজিত আছে, এদের উদ্ধার করা প্রয়োজন।

৫. অলংকার খোঁজার ডুবুরি

হযরত খাজা খানজাহান আলী (রা.) এর স্মৃতি বিজড়িত বাগেরহাট জেলার আওতাভুক্ত একটি অবহেলিত জনপদের নাম রামপাল। বর্তমানে রামপাল একটি উপজেলা। রামপাল উপজেলার দক্ষিণে মংলা, উত্তরে ফকির হাট। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে রামপালে দুজন জমিদার বাস করতেন, তাদের একজনের নাম রাম এবং অন্যজনের নাম শ্যাম। এই রাম ও শ্যামের পদবী ছিল পাল। রাম পালের নামানুসারে জনপদটির নামকরণ হয় রামপাল। এই রামপাল উপজেলার দশটি ইউনিয়নের একটির নাম হুড়কা। হুড়কা ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পার্শ্বে একটি বিশাল দিঘি। দিঘিটির নাম ঝলমলিয়া। দিঘির চার পাড়েই রয়েছে বিশাল আকৃতির বট, তেতুল, অশোক, গাব এবং আম গাছের সারি। দুপুরের উত্তপ্তরোদে অনেক পথিক ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে গাছের ছায়ায়। ঠিক এমনই সময় দুজন লোক হাঁক দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। তারা কাছে আসতেই গলার স্বর স্পষ্ট শোনা গেল। একজন বলছে।

www.pathagar.com

ডুবুরীরা যায়
সোনা রূপার,
গহনা হারালে
খুঁজে দেওয়া হ . . য় . . . ।

দুজনেরই ঘাড়ে টিনের তৈরি দুটি সুদৃশ্য তিনকোনা ডোঙ্গা। ডোঙ্গা দুটি বাঁশের আগার সঙ্গে গেঁথে দেওয়া, বাঁশের গোড়ার দিকটা লোহার তৈরি নিড়ানীর সঙ্গে শক্ত করে এটে দেওয়া।

গ্রামের মহিলারা সাধারণত পুকুরে এবং নদীতে গোসল করেন, গোসল করতে গিয়ে অনেকের সোনা বা রূপার গহনা পানিতে পড়ে যায়। পানিতে পড়ার পর অনেকে খোঁজাখুঁজি করেন, অনেকে খুঁজে পান, আবার অনেকে পান না। অনেক সময় খুঁজতে গিয়ে গহনা পেড় মাটি বা কাদামাটির ভিতর ডেবে যায়, তখন অনেকে খোঁজা ভঙ্গ দেন। অনেকে ভাবেন পানিতে নেমে খুঁজে হয়রানি হয়ে লাভ নেই, তার চাইতে বরং গ্রামের রাস্তা দিয়ে যখন ডুবুরীরা যাবে, তখন তাদের দিয়ে সোনা খোঁজ করানো যাবে। ডুবুরীদের কিছু পারিশ্রমিক দিলেই তারা এই কাজটি ভালভাবে করে দেবে। ডুবুরীদের পাঁচ থেকে ছয়শ টাকা দিলেই হয়। ডুবুরীরা তাদের নিড়ানী দিয়ে হারানো জায়গায় ডুব দিয়ে কুরিয়ে কুরিয়ে মাটি তোলেন এবং সেই কোরানো মাটি ডোঙ্গায় তোলেন, তারপর ডোঙ্গাটি পানিতে ঝাঁকিয়ে কাদামাটি ধুয়ে ফেলেন। ডোঙ্গার নিচে ছোট ছোট ছিদ্র থাকায় কাদামাটি পানিতে ধুয়ে যায়। ডোঙ্গার তলদেশে অনেক সময় দেখা মেলে স্বর্ণ বা রূপার অলংকার। এবার গহনার মালিকের হাতে অলংকার তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় হন। অনেক সময় মালিক সন্তুষ্ট হয়ে ডুবুরীদের খাবার পরিবেশন করে থাকেন। ডুবুরীদের বাড়ি কাটাখালী। খুলনা-মংলা মহাসড়ক ধরে খুলনার দিকে যেতে চোখে পড়ে স্টেশনটি। মূলত বাস স্ট্যান্ড, তবে মোড়টি বেশ বড়, একদিকে বাগেরহাটের রাস্তা, একদিকে মংলাগামী রাস্তা, অন্যদিকে খুলনা গামী রাস্তা। কাটাখালী বাসস্ট্যান্ডের উত্তর পার্শ্বে সরকারী জমিতে রাস্তার পাশে পলিথিনের তাবু টানিয়ে হোসেন মিয়া ও কালাম শেখরা থাকেন। তারা দল বেঁধে বসবাস করেন। এরা পেশায় বেদে, তবে জাতে মুসলমান। হোসেন মিয়া বিবাহিত, ঘরে বৌ-বাচ্চা আছে। তবে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না তারা জন্মের পর থেকে কখনও স্কুলে যায়নি। নিজেও কখনও বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গাননি। হোসেন মিয়ার স্ত্রী খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে রান্না করেন। রান্না শেষ হলে স্বামী-সন্তানদের আগে খাওয়ান, তারপর নিজে খেয়ে উপার্জন এর জন্য বেরিয়ে পড়েন। হোসেন মিয়া যদি সারাদিন ঘুরে একটি কাজও পায় তাহলে পাঁচশ টাকা আয় হবে। তবে হোসেন মিয়ার তার স্ত্রীর উপর খুব ভরসা, সে গ্রামের মহিলাদের ঝাড়ফুঁক করে, সিঙ্গা ফুঁকে বিষ নামিয়ে রাতের তেল ও তাবিজ বিক্রি করে চাল, ডাল, তরি তরকারী, মাছ সবকিছু যোগাড় করে নিয়ে আসবে। তারপর ঠিক সন্ধ্যার আগে উভয়ের তাবুতে প্রবেশ। চলবে রান্না-বাড়া আমোদ-ফুর্তি, তাস খেলা, গান-বাজনা তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়া। আবার পূর্ব দিনের ন্যায় সকালে ঘুম থেকে উঠে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া।

www.pathagar.com

৬. পাতার বাঁশি বাজিয়ে জীবন-জীবিকা

মংলা উপজেলার সোনাইলতলা গ্রামের একটি হত দরিদ্র পরিবারের আব্দুল খালেকের জন্ম। খালেকের বয়স যখন সাত বছর, তখন তিনি এক পড়ন্ত বিকেলে বাড়ির পাশের সরকারী রাস্তায় দাড়িয়ে বাদাম ভাজা খাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখলেন একজন বৃদ্ধ ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর বাঁশি বাজাচ্ছেন। খালেক বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু বৃদ্ধের হাতে কোন বাঁশের বাঁশি দেখতে পেলেন না, দেখলেন বৃদ্ধের হাতে একটি ছোট পাতা। বৃদ্ধ পাতাটি আবার ঠোঁটে লাগালেন এবং সুর তুললেন। বৃদ্ধের পাতার বাঁশীর সুরে মুহুর্তের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ জন নর-নারী হাজির হলেন। পাতার বাঁশিতে বৃদ্ধ দুই/ তিনটি ভাটিয়ালী গানের সুর তুললেন, বাঁশি বাজনা থেমে গেলে বৃদ্ধ সকলকে বললেন আমি পাতার বাঁশি বাজিয়ে সংসার চালাই, তোমরা আমাকে কিছু সাহায্য কর। প্রত্যেকে বৃদ্ধের হাতে আট আনার আধুলি, চার আনার সিকি প্রদান করলেন। আব্দুল খালেকের কাছে দশ পঁয়সার একটি মুদ্রা ছিল, খালেক মুদ্রাটি বৃদ্ধের হাতে দিলেন, বৃদ্ধ মুদ্রাটি খালেককে ফেরত দিলেন এবং খালেকের চোখ ও মুখের দিকে তাকালেন, এবার খালেকের হাত শক্ত করে ধরলেন, খালেক বৃদ্ধাকে বললেন আমাকে ছাড় আমি বাড়ি যাব। বৃদ্ধ বললেন, বাড়ি যাবি ঠিক আছে, কিন্তু বাঁশি বাজানো শিখবি নে, আমি বড় আশা করে এসেছি তোকে বাশি বাজনা শেখাবো, তোর চোখে, মুখে ঠোঁটে, আমি প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি। খালেক বললেন কি পাতা দিয়ে তুমি বাঁশী বাজাও? বৃদ্ধ বললেন নোয়াল পাতা। আমাদের বাড়িতে দুটি নোয়াল গাছ আছে, প্রতি বছর টক-মিষ্টি ফলে গাছ ভরে যায় বললেন খালেক। কথায় আব্দুল খালেকের মন গলে গেল, খালেক এবার বৃদ্ধের হাত ধরলেন, এবং হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি প্রবেশ করলেন। আব্দুল খালেকের মা দূর থেকে বৃদ্ধের পাতার বাঁশির সুর শুনেছিলেন, সেজন্য তিনিও বৃদ্ধকে বাড়িতে দেখে বসতে দিলেন। বৃদ্ধ বারান্দার একটি কোনায় তাল পাতার চাটাইয়ে বসলেন এবং খালেকের মাকে বললেন মাগো এক গ্লাস পানি দাও, বৃদ্ধ খালেককে বললেন, তুমি নোয়াল গাছ থেকে চারটি পাতা ছিঁড়ে আনো, পাতাগুলি বুড়োও, না আবার কচিও না, মাঝামাঝি পর্যায়ের। বৃদ্ধ খালেকের মায়ের দেওয়া চিড়া-মুড়ি, গুড় ও পানি খেলেন, এবার খালেকের কাছ থেকে একটি পাতা নিয়ে দুই হাতের বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ধরলেন, খালেককে দেখালেন এবং একটি পাতা খালেককে ঠিক ঐ ভাবে ধরতে বললেন, খালেক দুই থেকে তিন বারের পর পাতাটি ভালভাবে ধরতে সক্ষম হলেন। বৃদ্ধ এবার পাতা ঠোঁটে লাগালেন, বুকে দম নিলেন এবং পাতায় ফু-দিলেন। পাতাটি বেজেই চলল। আব্দুল খালেক দুই হাতের আগুল দিয়ে পাতা ধরলেন, পাতা ঠোঁটে লাগালেন এবং ফু-দিলেন কিন্তু সুর সৃষ্টি হলো না, শুধুমাত্র ফু-দেওয়ার শব্দ সৃষ্টি হতে লাগল। বৃদ্ধ বললেন সময়ের দরকার একবারে হবে না, এসব হল নিবিড় সাধনার বিষয়। বৃদ্ধ খালেকের মাকে বললেন, আমি তোমার ছেলেকে পাতার বাঁশি বাজানো শিখিয়ে তবে এই বাড়ি থেকে যাব, প্রয়োজনে আমি এক সপ্তাহ তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করব। সন্ধ্যা সমাগত খালেকের বাবা আহমদ আলী বাড়ি আসলেন, খালেকের মায়ের কাছ থেকে সকল কথা শুনে বললেন, বেশ ভালোইতো, আমার খালেক যদি পাতার বাঁশি বাজাতে শেখে তাহলে আমাদের লাঠি খেলার দলকে ও সহযোগিতা

www.pathagar.com

করতে পারবে, তাতে আরও দুটো বাড়তি টাকা আয় হবে। খালেকের বাবা আহমদ আলী স্থানীয় খেলার দলের সর্দার, বিভিন্ন খেলায় লাঠি খেলা দেখিয়ে টাকা/ পঁয়সা উপার্জন করেন; লাঠি খেলা শেষে দর্শকরা গান ও বাঁশি বাজানো শুনতে চায় খালেক সেই কাজটি পারলে দলের সুনাম ও অনেক বেড়ে যাবে এটাই ভাবলেন আহমদ আলী। আহমদ আলী খালেকের ওস্তাদের জন্য হাঁস জবাই করলেন, পুকুর থেকে রুই মাছ ধরলেন, রাত্রে মহা ধুমধামের সহিত খাওয়া দাওয়া চলল। খালেকের মা ওস্তাদের জন্য খাটের উপর খেজুর পাতার রোনা পানি বিছালেন, তার উপর লেপ, কাঁথা, বালিশ ও মশারি টাঙ্গিয়ে বিছানা তৈরি করে দিলেন। পরের দিন খুব ভোরে ওস্তাদ বিছানা থেকে উঠলেন, খালেককে ডাকলেন। খালেক ওস্তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে, ওস্তাদকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হলেন, গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটি লেবু গাছ চোখে পড়ল, ওস্তাদ লেবু গাছ থেকে কয়েকটি কচি লেবুর পাতা তুললেন, পাতা ঠোঁটে ছোয়ালেন এবং বাঁশি বাজাতে লাগলেন। ওস্তাদ এবার খালেকের হাতে একটি পাতা দিলেন, সুন্দরভাবে দুই হাতের চারটি আগুল দিয়ে পাতা ধরানো শিখালেন, এবং পাতা ঠোঁটে লাগিয়ে সুন্দরভাবে ফুঁ দেয়ার কৌশল শেখালেন। খালেক পাতায় ফুঁ দিল, পাতা বাঁশের বাঁশির মতো সুরে বেজে ওঠল। ওস্তাদ এক সপ্তাহ খালেকদের বাড়ি থেকে হাতে কলমে খালেককে বাঁশি বাজানো শেখালেন। খালেক বর্তমানে পাতার বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়, প্রতিদিন তার একটা না একটা বায়না থাকে, কোনদিন খালেক যাত্রাদলের অনুষ্ঠানে বাজায় রামপাল উপজেলা পরিষদের সকল অনুষ্ঠান গুলিতে খালেকের আমন্ত্রণ থাকে। ২৬ শে মার্চের অনুষ্ঠানে খালেকের বাবার দল উপজেলা চত্বরে লাঠিখেলা দেখিয়ে ছিল, তার পর সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে খালেক লালন ফকিরের গান গাইল, তার পর পাতার বাঁশিতে সুর তুলে দর্শককে মোহিত করল। স্থানীয় এম পি হাবিবুর নাহার খালেকের হাতে পাঁচশ টাকার একটি নোট দিলেন, দর্শকরা ও দশ/বিশ টাকার নোট দিয়ে মালা গেঁথে খালেকের গলাই পরিয়ে দিল। খালেকের সর্ব সাকুল্য আয় হল একহাজার টাকা। খালেক এভাবে গান গেয়ে ও বাঁশি বাজিয়ে সংসার পরিচালনা করছেন।

৭. তাল পাতার বল, চাটাই ও পাখার জীবিকা

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা রামপাল ও মংলা। রামপাল উপজেলার খুলনা-মংলা মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম নাম ভাগাফন্ডি। গ্রামটি অন্যান্য গ্রামগুলির তুলনায় অনেক উঁচু। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে দুই/পাঁচটি তাল গাছ আছেই। গ্রামটির মধ্যে অবস্থিত একটি মহিলা কলেজ, যার নাম সুন্দরবন ডিগ্রী কলেজ, কলেজের চারিপাশে অনেক তালগাছের সারি সারি বাগান। তালের মৌসুমে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এখানে আসে তাল কিনতে। এখানের তালগুলি পাইকাররা কিনে প্রত্যন্ত এলাকায় বিক্রয় করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। গ্রামের মধ্যে বেশ কয়েকটি পরিবার আছে যারা গরমের মৌসুমে তালপাতা দিয়ে পাখা তৈরি করেন, বর্তমানে ১ টি উন্নত মানের তালপাতার পাখা ১৫ টাকায় খুচরা বিক্রয় হয়। রামপালের যে বেশি পরিমাণে তালপাতার পাখা কিনে থাকেন। কুটির শিল্পীরা তালপাতা দিয়ে দু ধরণের

www.pathagar.com

পাখা তৈরি করে থাকেন, একটি নর্মাল আরেকটি উন্নতমানের। উন্নত মানের পাখা গুলোর বেড় বা সাইড রঙিন কাপড় ও জরি দিয়ে বাঁধানো থাকে। জরি ও রঙিন কাপড় দিয়ে বাঁধানো একটি তালপাতার পাখা বাজারে ত্রিশ টাকায় বিক্রি হয়। যাদের বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে, তারাও দু-চার খানা পাখা বাড়িতে রাখেন, কারণ লোড শোডিং এ অনেক সময় গরমে তাদের কষ্ট পেতে হয়, সেজন্য তারা তালপাতার তৈরী হাতপাখা বাড়িতে রাখেন। তালপাতার তৈরী বল রামপালের শিশু ও কিশোরদের কাছে খুবই প্রিয়। ভাগা গ্রামের কুটির শিল্পের কারিগররা একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাতা ভাঁজ করে তালপাতা দিয়ে বল তৈরি করেন। একটি বল কারিগররা পাঁচ টাকায় বিক্রি করেন। শিশু-কিশোররা বল নিয়ে স্থানীয় স্কুল মাঠগুলোতে বল খেলে। একটি বল শিশুরা দুই থেকে তিনদিন খেলতে পারে, তারপর বলগুলো ছিঁড়ে যায়। ভাগা গ্রামের কারিগররা তালপাতা দিয়ে এক বিশেষ ধরনের চাটাই তৈরি করে থাকেন। চাটাইগুলো স্থানীয় দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের লোকজন কিনে নিয়ে যায়। যে সকল পরিবারে অর্থ-বিত্ত কম, যারা চেয়ার টেবিলে বসে খাবার খাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে না, সেই সকল পরিবারের সদস্যরা তাদের অতিথিদের বসার জন্য এবং বিছিয়ে বসে ভাত খাওয়ার জন্য তালপাতার চাটাই কেনেন। গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন সাধারণত বসার জন্য কড়ই ও কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি ব্যবহার করে। বর্তমানে একটি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি কিনতে গেলে পাঁচশ টাকার কমে কেনা যায় না। সেদিক বিবেচনা করে দরিদ্র পরিবারের লোকজন বিশ টাকা দিয়ে তালপাতার চাটাই কিনে নেয়। তাছাড়া ভাত খাওয়া এবং অল্প জায়গায় অনেকগুলো চাটাই সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা যায়। জনশ্রুতি আছে, রামপাল এলাকায় শত বৎসর আগে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে এখানে টোল ও পাঠশালায় লেখাপড়া শেখানো হতো, তখন ছাত্র/ছাত্রীরা তালপাতার কয়লার কালি দিয়ে লিখতেন তালপাতার চাটাইতে বসে। ক্লাস শেষ হওয়ার পর পাঠশালার চাটাইগুলো পাঠশালার বেড়ায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন। রামপাল উপজেলার তৎকালীন জমিদার ছিলেন রাম পাল ও শ্যাম পাল নামের দুই ভাই। শোনা যায়, জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রাম পাল ও শ্যাম পাল খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন, খাবার গ্রহণের সময় দুই ভাই একসঙ্গে তালপাতার বড় চাটাইতে বসে খাদ্য গ্রহণ করতেন; খাবার গ্রহণের সময় দুই ভাই ঘর্মাক্ত হলে, পাইক পেয়াদারা তাদের তালপাতার তৈরী বিশাল আকৃতির পাখা দিয়ে বাতাস করতেন। রাম পাল ও শ্যাম পাল অধিকাংশ সময় সোনার থালায় ভাত খেতেন, তবে একাদশীর দিন ও তার পরের দিন কলাপাতায় ফলমূল ও লুচি, সন্দেশ খেতেন। রাম পাল ও শ্যাম পালের বাড়ি বর্তমানে রামপালের কুমারখালী নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। রাম পাল ও শ্যাম পালের বংশধরেরা বর্তমানে রামপালে কেউ নেই, তবুও তালপাতায় চাটাইতে বসে ভাত খাওয়ার কাহিনী লোকমুখে প্রচালিত আছে।

৮. মৎস্য শিকার

বাবা আদর করে ছেলের নাম রেখেছিলেন মহব্বত আলী। মহব্বত আলী লেখাপড়া শিখবে, সমাজের দশজনের একজন হবে ভেবেছিলেন মহব্বতের বাবা-মা। কিন্তু বিধি

www.pathagar.com

বাম ছেলেবেলায় যখন তার লেখাপড়ার সময়, তখনই মা-বাবাকে হারান মহব্বত আলী। লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি, মাত্র ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে।

বারো বছর বয়সেই মহব্বত আলীকে নেমে পড়তে হয় কাজের সন্ধানে। বারো বছর বয়সে কাজ পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার, কেউ কাজে নিতে চায় না, তাছাড়া শিশুদের কাজ করালে আইনের জালে পড়ার ভয়ও আছে অনেকের। শেষ পর্যন্ত মহব্বত আলীর সুঠাম শরীর দেখে কাজে নিতে রাজি হয় সমুদ্রগামী মৎস্যজীবী সমিতির সদস্য অলি মোড়ল নামের এক জেলে বহদ্দার। বঙ্গোপসাগরে অলি মোড়লের বড় ধরনের মাছের ব্যবসা, তিন তিন খানা বড় বড় মাছ ধরা ট্রলার। ত্রিশ/পয়ত্রিশ জন কর্মচারী নিয়ে প্রতিবছর শীত মৌসুমে অলি মোড়ল সাগরে মাছ ধরার জন্য যাত্রা করে, অবস্থান নেয় সাগর সংলগ্ন দুবলার চরে। মহব্বত আলীর বেতন মাসে পাঁচশ টাকা। কাজ হল জেলেরা যখন সাগর থেকে মাছ ধরে ট্রলার ভর্তি করে কূলে ফিরবে, তখন সাগরের চরে বসে সেই মাছ বাছাই করে চাটাইয়ের উপর রোদে শুকানো। গেল বছর মহব্বত আলী প্রচণ্ড কষ্ট করে, ছয় মাস সাগরের চরে থেকে তিন হাজার টাকা আয় করে বাড়ি ফিরেছে। এবার শীত মৌসুমে আবার সেই সমুদ্র যাত্রা, তবে বেতন এবার বেড়েছে, মাসে এক হাজার টাকা। অলি মোড়লের বহরে পাঁচ জন শিশু শ্রমিক আছে, প্রত্যেকের বেতন মাসিক এক হাজার টাকা, আর খাওয়া থাকা-ফ্রি, তার মতে শিশুরা ভাল কাজ করে, এরা মাছ বাছাই করে, মাছ রোদে শুকায়, আবার অনেক সময় জেলেদের সাথে সখ করে গভীর সমুদ্রেও মাছ ধরতে যায়।

দুবলার চরে জেলে বহদ্দাররা প্রতি বছর মাছ ধরতে রামপাল থেকে রওনা দেন অক্টোবর মাসে। তখন সাগর শান্ত থাকে, মাছ ধরার উপযুক্ত সময়, এই মাছ ধরা চলবে ছয় মাস পর্যন্ত, তারপর আবার মার্চ মাসে সাগর উত্তাল হলে জাল, দড়ি, ঘরের সরাঞ্জামাদি, লোকজনসহ ট্রলার ভর্তি করে বাড়ি ফিরে আসা।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে মৎস্য আইন আছে, তা সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। মাছ ধরার ট্রলারে প্রতি লোকের জন্য সরকারি বি এল সি কাটতে হয় একশত পঞ্চাশ টাকা। অর্থাৎ একটি ট্রলারে দশজন জেলে থাকলে দিতে হয় পনেরশ টাকা। কিন্তু ফরেস্ট অফিসে ট্রলার প্রতি জমা দিতে হয় তিন হাজার পাঁচশ টাকা। বাড়তি দুই হাজার টাকা ফরেস্টারদের পকেটে যায় বলে শিশু শ্রমিকরা জানায়। ট্রলার নিয়ে যাওয়ার পথে ফরেস্ট চেক পোস্টে দিতে হয় একশ টাকা। এরপর আছে মহাজনের কাছ থেকে আনা টাকার চড়া সুদ। সাগরের দুবলার চরে যারা জেলেদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা ফিশারম্যান গ্রুপের লোকজন, এরা মাসলম্যান, অবৈধ অস্ত্রে সজ্জিত এক দুর্দান্ত প্রতাপশালী বাহিনী, এরা সুন্দরবনের ডাকাত, সাগরের জলদস্যুদেরও মনিব। ফিশারম্যান গ্রুপের লোকজন জেলেদের ট্রলার প্রতি দাদন দেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিনিময়ে সাগর থেকে আহরণকৃত সকল ধরনের মাছ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত জুড়ে দেওয়া হয়। তবে জেলেদের অধিকাংশ মাছ ফিশারম্যান গ্রুপের লোকজন কম মূল্যে ক্রয় করে নেয়। যেখানে একমন চালি চিংড়ির বাজারমূল্য বিশ হাজার টাকা, সেখানে তাদের কাছে বিক্রি করতে হয় মাত্র তের হাজার টাকায়, আর প্রতিমণ মাছে

www.pathagar.com

তাদের লেস দিতে হয় দশ কেজি, সেখানে জেলেদের আরও লোকসান হয় পাঁচ হাজার টাকা।

জেলেদের উপর আছে জলদস্যু, বন দস্যুদের চাঁদাবাজি ও অত্যাচার। প্রতি বছর জলদস্যুদের বছর প্রতি চাঁদা দিতে হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই দস্যুরা ফিশারম্যান গ্রুপের লোকজনের আশির্বাদপুষ্ট। দস্যুদের সময়মত টাকা না দিলে তারা জেলেদের ট্রলার, জাল দড়ি ও লোকজন জিম্মি করে বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করে নেয়। তাদের মনোপুত চাঁদা না হলে বা কোন জেলে বহদ্দার বিরুদ্ধাচারণ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাকে যে কোন উপায়ে ডাকাত সাজিয়ে আইনের হাতে তুলে দেয় বা হত্যা করে। এমন নজির অহরহ ঘটেই চলেছে। রামপালের জেলে বহদ্দার মন্টু মেম্বার ঠিক এভাবেই কিছুদিন আগে ক্রস ফায়ারে নিহত হয়েছেন।

জেলেরা বিগত বছরগুলোতে তাদের ব্যবহারের জন্য জঙ্গল থেকে ডালপালা সংগ্রহ করতে পারতেন, কিন্তু এবার থেকে আইন হয়েছে, তারা জঙ্গল থেকে কোন ধরনের কাঠ কাটতে পারবে না, সমুদ্রকূলে ঘর বেঁধে থাকার জন্য লোকালয় থেকে বাঁশখুটি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। তবে জেলেদের জন্য আশার কথা, ঘরের ছাউনির জন্য সুন্দরবন থেকে গোলপাতা সংগ্রহ করা যাবে।

মহব্বত আলী তার মালিকের কাছ থেকে দুই দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে। মহব্বত আলীর গৌরবরণ দেহ, লবণ আবহাওয়া ও লবণ পানিতে গোসল করতে করতে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। মাথার চুলগুলো তেল সাবানের অভাবে বিদেশীদের মতো লালবর্ণ ধারণ করেছে। সাগরের লইট্যা মাছ বাছতে বাছতে মহব্বতের হাতের প্রতিটি আঙ্গুলের গোড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানের ঘাঁ দিয়ে মাঝে মধ্যে পূঁজ-রক্ত ঝরতে থাকে।

এবার সাগরে মাছের আমদানি প্রচুর, ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ছে চুনা, আমাদী, লইট্যা, ভার্তি, ছুরি, চেলা, চাম্বল, খয়রা, মেদ, রূপচাঁদা, পাংখা, চাকা, সাগর পার্শে ও টাইগার চিংড়ি। সাগরে জেলেদের জালে মাছ বেশি ধরা পড়লে মহব্বত আলীদের কষ্ট কয়েকগুণ বেড়ে যায়। অনেকদিন এমনও গেছে, মাছ বাছতে বাছতে রাত বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু কিছুই করার নেই। চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে, তবুও মহাজনের কাজ শেষ করতেই হবে।

জীবন-জীবিকার তাড়নায় রাতের আধারে সুন্দরবনের পথে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকলেও উপায় নাই। মহব্বত আলী লোকালয়ে আসার পর তার আত্মীয় স্বজন এবং পড়শীরা তার অবস্থা দেখে, তাকে নিষেধ করেছে সাগরে যেতে।

কিন্তু মহব্বত আলী জানে এরা শুধু পরামর্শই দেয়, কোন কাজ দেয় না। এমন কি, গ্রামে আসার পর আত্মীয়-পড়শীরা তাকে একদিন ডেকে খাবারও খেতে বলেনি।

মহব্বত আলী তার আত্মীয় স্বজনের কথা শুনবে না। সে দুদিন পর আবারও সাগরের পথে রওনা হবে। মহব্বত আলী স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যতে সে একজন সফল জেলে বহদ্দার হবে, হাতে আসবে অনেক অনেক টাকা। অভাব ঘুচে যাবে, এক সময় বিয়ে করে সংসারী হবে, সন্তানাদী হলে তাদের স্কুলে পাঠাবে, মানুষ করবে, যা একদিন তার বাবা-মা মহব্বত আলীর জন্য চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

৯. নলের টাকায় সঞ্চয়

রামপাল উপজেলা বিশ্ব ঐতিহ্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন সংলগ্ন মংলা উপজেলার উত্তরে অবস্থিত। দুই লক্ষ্যাধিক জনবসতিপূর্ণ এই এলাকার জনগণের প্রধান পেশা লবণ পানিতে মৎস্য চাষ। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ব থেকে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা লবণ পানিতে বাগদা, হরিণা, গলদা, কাঁকড়া, ভেটকি, পার্শে ভাঙ্গল, দাঁতনে মাছের চাষ করে এদের জীবন-জীবিকা চলে।

মাত্র বছর দুয়েক হল, সমুদ্র থেকে আসা আইলার তিক্ত লবণ পানি এবং অজানা এক ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশের এই দক্ষিণ অঞ্চলের মৎস্য চাষ বিপর্যয়ের মুখে। রামপালের মৎস্যচাষীরা এজন্য দারুণ সঙ্কটে দিনাতিপাত করছে। ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীরা যারা অন্যের জমিতে লজী নিয়ে মাছ চাষ করতেন তারা আজ সর্বশান্ত। এমতাবস্থায় আশি ভাগ পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা তাদের নিজ পেশা পরিবর্তন করে, ভিন্ন পেশা অবলম্বন করে জীবন ধারণের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন, এমনই একজন চাষী যার নাম মোল্লা রফিকুল ইসলাম।

মোল্লা রফিকুল ইসলামের বাড়ি রামপাল উপজেলার বাঁশতলী ইউনিয়নের তালবুনিয়া গ্রামে। রফিকুলের সংসারে বৃদ্ধ বাবা, মা, শিশু তিন কন্যা ও স্ত্রী। মোট সাত সদস্যের সংসার। বর্তমানে মাছের ঘেরে ভাইরাস থাকায় রফিকুলের আয়ের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে। গত সপ্তায় একদিন সকলে উপবাসী ছিল, সংসারে চাউল কেনারও টাকা ছিল না, এ জন্য রফিকুল যে পথটি বেছে নিয়েছেন, তা হল সুন্দরবন থেকে নল কেটে তলই (এক ধরনের পাটি) তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সংসার পরিচালনা করা। নল হল বাঁশের ফকির মতো চিকন এক ধরনের গাছ যা লম্বায় আট থেকে দশ ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মহাভারত বিশ্বকাব্যে বর্ণিত আছে, ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বংশধররা নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে, নল খাগড়ার বন থেকে সুচালো করে নলের গোড়া কেটে একে অপরকে আঘাত করেন, যার ফলে শ্রী কৃষ্ণের যদু বংশ ধ্বংস হয়। অথচ এই নল এখন দরিদ্র জনগণের জন্য বহুত কল্যাণ বয়ে আনছে, বিশেষ করে তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য। সুন্দরবনের বিভিন্ন খালপাড়ে এবং চরে গেলে সহজেই অবলোকন করা যাবে এই নলের বন। তবে নলের বনে যাতায়াত করাটাও একটা ভয়াবহ কষ্টের ব্যাপার। বিশেষ করে লবণ পানির কুমিরগুলোর পালাবার এবং আশ্রয় গ্রহণ করার একটি বিশেষ জায়গা এই নলের বন। আবার অনেক সময় সুন্দরবন বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগাররাও তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘন জঙ্গল হিসেবে এই নলের বনকেই বেছে নেয়। নল কর্তনকারী বাওয়ালীরা সে জন্য খুব সাবধানে ধারালো হেসো ও রামদা নিয়ে নলের বনে প্রবেশ করেন। মাঝে মধ্যে নল কর্তনকারীরা নল বনের মাঝে বাঘ এবং কুমিরের লড়াই অবলোকন করে থাকেন, তবে তা কচিত। সুন্দরবনে নল কাটার মৌসুম শুরু হয় মূলত ডিসেম্বর মাস থেকে। সুন্দরবনে এই নল কাটা চলে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। নল কাটার জন্য বাওয়ালীরা প্রথমে সুন্দরবনে ঢোকার জন্য ফরেস্ট অফিসে যান। সেখানে নৌকা প্রতি বি.এল.সি কাটতে হয় একশ পঞ্চাশ টাকা। সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে এই টাকা। তবে নল কর্তনকারীদের দিতে হয় পাঁচশ

www.pathagar.com

টাকা। এর তিনশ পঞ্চাশ টাকা যায় ফরেস্ট অফিসারদের পকেটে। প্রতিটি নৌকা পারমিট পায় এক সপ্তাহের। প্রতিটি নৌকায় থাকেন তিনজন বাওয়ালী। একজন ধরেন হাল, আর দুজন টানেন দাড়। নৌকার ভেতর থাকে সব ধরনের সরঞ্জাম। চাল, ডাল, তরি তরকারী, তেল, মসল্লা, জাল, দড়ি সব কিছু। জাল থাকার কারণে বাওয়ালীরা অবসর মতো সুন্দরবনের খালগুলোতে ভাটার সময় খেওলা জাল দিয়ে নিজেদের চাহিদামতো মাছ সংগ্রহ করেন। জ্বালানী কাঠের সংগ্রহ সুন্দরবন থেকেই হয়। বিভিন্ন গাছের শুকনো ডাল যত্রতত্র পড়ে রয়েছে সুন্দরবনে, তাছাড়া বেশি পরিমাণে জ্বালানী সংগ্রহের জন্য বাওয়ালীরা অনেক সময় ডাঙ্গায় উঠে গাছের শুকনো ডাল ভাঙ্গে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাওয়ালীরা রান্না শুরু করে, তারপর দুটো খেয়েই খাল পাড়ের নল কাটা শুরু করে। নল কাটার সময় বাওয়ালীদের সারা শরীর কাদায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কারণ খাল পাড়ের মাটি নরম ও কর্দমাক্ত। এভাবে সপ্তাহ ধরে নল কাটার এক পর্যায়ে নৌকা ভরে যায় নলের আটিতে। নলে নৌকা বোঝাই হবার পর বাড়ি ফেরার পালা। বাওয়ালীরা নল বোঝাই নৌকা নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। বাড়ির বয়স্করা বিশেষ করে বৃদ্ধা বাবা মায়েরা এজন খুব উদ্বিগ্ন থাকেন, সপ্তাহের শেষ দিকে তারা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ঘাটে বসে থাকেন, তাদের দৃষ্টি থাকে অপলক, কখন তার বাছা নল বোঝাই নৌকা নিয়ে ঘাটে ফিরবে। নৌকা ঘাটের কিনারায় ভেড়ার পর নলের আটি ভাগ হয়। তারপর যার যার ভাগের অংশ বাড়ি বয়ে নিয়ে যায় মহা আনন্দে।

এবার শুরু হয় বাড়ির মহিলাদের পরিশ্রমের পালা। মুগুর বিহীন ঢেকিতে নল ছেঁচতে হয়, নল ছেঁচার পর শুরু হয় তলই বোনার কাজ। পাঁচ হাত লম্বা এবং চার হাত চওড়া একটি তলই বুনতে একজন মহিলার দুই ঘণ্টা সময় লাগে। এভাবে একে একে বাড় বাধানো শক্ত তলই তৈরি হয়।

মোল্লা রফিকুল ইসলাম প্রথম সপ্তাহে ভাগে পেয়েছেন চল্লিশ আটি নল। চল্লিশ আটিতে চল্লিশটি তলই তৈরি হবে। প্রতিটি তলই এর পাইকারী বাজার মূল্য পঞ্চাশ টাকা। পাইকাররা এসব তলই বাড়ি এসে কিনে নিয়ে যান এবং তারা হাটে গিয়ে খুচরা প্রতিটি তলই সত্তর থেকে আশি টাকায় বিক্রি করেন। প্রথম সপ্তাহে রফিকুলের আয় হয়েছে দুই হাজার টাকা। এভাবে মাসে চারটি ট্রিপ যেতে পারলে আয় হবে আট হাজার টাকা। খরচ বাদ দিলে রফিকুলের ক্যাশ থাকবে ছয় হাজার টাকা। রফিকুলের সংসার এখন ভালভাবেই চলছে।

এখন ধান কাটার মৌসুম, চাষীরা ধান শুকানোর জন্য নলের তলই কিনবেন। আবার ধান শুকানোর পর ঘরের ভিতর সারা বছর ধান সংরক্ষণ করে রাখার জন্য নলের তলইয়ের গোলা তৈরি করবেন। এজন্য ধান চাষীদের মাঝে নলের তৈরি তলইয়ের চাহিদা ব্যাপক। যারা সুপারীর ব্যবসা করেন, তারাও নলের তৈরি তলই কেনেন, তাদের সুপারী গোলাজাত করে রাখার জন্য।

রফিকুল বর্তমানে ভাল আছেন। সংসারে শান্তি ফিরে এসেছে। মেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। এভাবে রফিক মোল্লা ছয় মাস যাবত কাজটি করতে পারলে তার সংসারে বাড়তি কিছু সঞ্চয়ও হবে।

www.pathagar.com

১০. কবিরাজ

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার ধরণ বড়ই বিচিত্র। ওঝা ও কবিরাজদের দ্বারা সনাতন পদ্ধতিতে রুগীর চিকিৎসা এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। রামপাল উপজেলার অন্তর্গত গৌরম্ভা ইউনিয়নের প্রসাদ নগর গ্রামে এমন চিত্র অহরহই পরিলক্ষিত হয়।

প্রসাদ নগর গ্রামের ৪৮ বছর বয়সী সুচিত্রা রাণী তার জীবন ও জীবিকার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছেন তার নাম আয়না পড়া। আয়না পড়ার মাধ্যমে মানুষের হারানো এবং চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধারের অভিজ্ঞতা সুচিত্রার এক দিনের নয়, এজন্য তাকে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে।

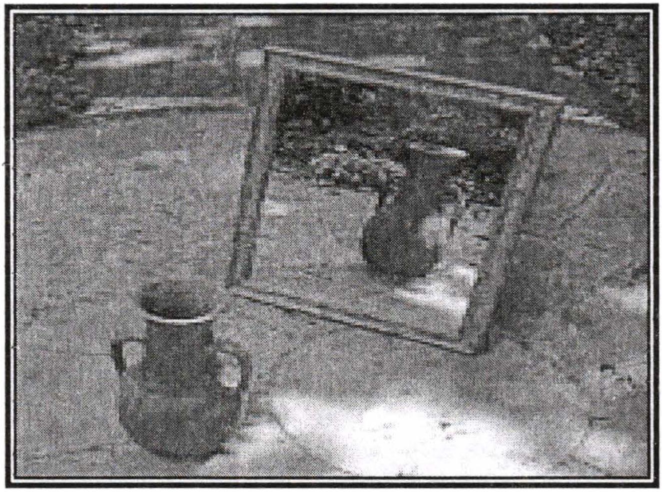

আয়না

সুচিত্রার বয়স যখন ৬ বছর, তখন ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধ কবিরাজ কৃষ্ণপদ রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সুচিত্রার মা গুরুদাসীর অকাল মৃত্যুর পর বাবা ধীরেন্দ্র নাথ মেয়েকে তুলে দেন বৃদ্ধ কবিরাজের হাতে। সুচিত্রা তার স্বামীর বাড়িতে যাবার পর দেখতে পান, তার স্বামীর কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে রুগী আসেন। রুগীদের মধ্যে সাপে কাটা, ভুত-পেত্নীতে ধরা, জিনে ধরা এবং মৃগী রুগীর সংখ্যাই বেশি। সুচিত্রা বড় হতে থাকেন, আর স্বামীর বিদ্যারপ্ত করতে থাকেন। কবিরাজ কৃষ্ণপদ তার নাতনী বয়সী স্ত্রীর আগ্রহ দেখে, খুব মনোযোগ দিয়ে সুচিত্রাকে সকল ধরণের মন্ত্র বিদ্যা শেখাতে থাকেন। সুচিত্রা এক ধরণের ভক্তিভাবে প্রণীত হয়ে স্বামীর সকল বিদ্যা আয়ত্ব করেন। এক্ষেত্রে বলতে গেলে কৃষ্ণপদ কবিরাজই সুচিত্রার গুরু, স্বামী এবং পথ প্রদর্শক।

কৃষ্ণপদ কবিরাজের মৃত্যুর পর স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে স্বামীর ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছেন সুচিত্রা বর্তমানে সুচিত্রা তার বাবার বাড়িতেই থাকেন। নাড়ার ছাউনিযুক্ত ছয়

www.pathagar.com

হাত বাই দশ হাত একটি মাটির দেওয়াল যুক্ত ঘরে সুচিত্রার অবস্থান। সন্তানাদি নেই, একা রান্না করেন একাই খান।

সুচিত্রার জীবন-জীবিকা চলে একটি কাচেঁর তৈরি আয়নার উপর। ভুক্তভোগীদের আহবান মতো সুচিত্রা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আয়না দর্পণ দিয়ে বেড়ান। সুচিত্রা তুলা রাশির জাতিকা। কারো কোন জিনিস হারানো, খোয়া বা চুরি হলে, তারা সুচিত্রাকে সঙ্গে করে তাদের বাড়িতে যান। আয়না দর্পণের শুরুতে সুচিত্রা মাটিতে একটি গণ্ডি দেন এবং গণ্ডির ভেতর কাঁচের আয়নাটা রেখে মন্ত্র পাঠ করেন।

মা বনবিবি তুমি বনের ঠারণ
তোমার আগমনে মাগো, দূর হয়ে যাক
সকল বিপদের কারণ।
ও মা কালি, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ
তারকচাঁদ, জয় বাবা পাগল চাঁদ।
ঈশ্বর তুমি আমার মা
সব দেবতার দেবতা, ও মা কালি।
আমি যদি কোন অপরাধ করি
তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও।
দোহাই মা কালি দোহাই মা কালি দোহাই মা কালি॥

মন্ত্র পাঠ শেষে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করে সুচিত্রা আয়না ধরেন, আর গলার স্বর ও হাত কাঁপিয়ে বলতে থাকেন ঐ যে চোরে ছবি দেখা যায়। সুচিত্রা বলতে থাকেন চোর সিঁদ ফেঁটে ঘরে ঠুকলো, তোষকের তলা থেকে চাবি নিল, খুলল,আলমারি খুলল,ঐ যে টাকা পয়সা,সোনা দানা নিয়ে ঘর থেকে বের হল। ঐ যে চোর চলে গেল দিঘির পাড়ে,মালমালগুলো একটা কাপড়ে ভালো করে বাঁধলো,এবার বাগানের পথ ধরে উওর দিকে হাঁটা দিল। আর দেখা যাচ্ছে না, একথা শেনার পর গৃহস্বামীর চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। কিন্তু আয়নার ভিতর অন্য কারো দেখার উপায় নাই, কারণ সুচিত্রা তুলা রাশির জাতিকা, এবং মন্ত্র পাঠ করে সেই আয়না দর্পন দিচ্ছে। এখানে সুচিত্রাই এ রাজ্যের রাণী।

গৃহস্বামী চোরের চেহারার বর্ণনা মনে ধারণা করেন কে চোর। তারপর গৃহস্বামী স্থানীয় চৌকিদার ও মেম্বারকে সাথে নিয়ে চোরের বাড়ি গিয়ে চোরাই মাল উদ্ধার করেন। এজন্য সংঘবদ্ধ চোরেরা সুচিত্রার উপর খুব নাখোশ। একবার এক গৃহস্থের গরু চুরি গেলে, সুচিত্রা আয়না দর্পণ দিয়ে চোর সনাক্ত করেছিলেন, চোরেরাও সুচিত্রার উপর এক ঘা নিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে চোরেরা সুচিত্রার হাতে দা দিয়ে কোপ মেরেছিল। সেই থেকে সুচিত্রা বর্তমানে খুব সতর্ক। তবে একে বারেই যে চুরির ঘটনা দেখেন না তা অবশ্য না, কারণ পেট তো চালাতে হবে।

সুচিত্রা আয়না দর্পন দিয়ে যা আয় করেন তা দিয়ে তার সংসার এক প্রকার ভাল ভাবেই চলে যায়। ইদানিং একটি মোবাইল ফোন ও কিনেছেন, কভারের ভিতর সুতা দিয়ে গলায় ঝোলানো থাকে প্রায় সময়। প্রতিদিন সুচিত্রার সর্বনিম্ম আয় পঞ্চাশ টাকা,

www.pathagar.com

যারা টাকা দিতে পারে না তারা সুচিত্রাকে চাউল, তরি তরকারী এমনকি মাছ পর্যন্ত উপহার প্রদান করেন।

সুচিত্রার জীবনে সবচাইতে বড় সাফল্যতম ঘটনার স্থান সিলেট। একবার এক পরিচিতের আত্মীয়ের বাসায় চুরি হয়েছিল। তারা সুচিত্রাকে আমন্ত্রণ জানায়। তারা সুচিত্রাকে দূর-পাল্লার বাসে করে নিয়ে যান সিলেট। সুচিত্রা আয়না দর্পণ দেন এবং আয়নার ভিতর এক মহিলা চোরকে দেখতে পান, সুচিত্রার বর্ণনা অনুযায়ী গৃহস্বামীর স্ত্রী চোরকে সনাক্ত করেন এবং তারই কাছ থেকে আট ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার উদ্ধার করেন। উপকার স্বরূপ সুচিত্রাকে তারা পাঁচহাজার টাকা পুরস্কৃত করেন। সুচিত্রার জীবনে এটাই সবচাইতে বড় উপার্জন।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

সুপ্রাচীন কাল থেকে গ্রাম বাংলার লোকচিকিৎসা প্রচলিত। কালের বিবর্তনে জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটলেও গ্রাম বাংলায় লোকচিকিৎসা ধরে রেখেছে তার শক্তিশালী অবস্থান।

লোকচিকিৎসার বস্তুগত ব্যবহারের কিছু নমুনা নিম্নে প্রদর্শন করা হলো -

১. ঝাড়া

ওঝালি

জয়নাল হোসেন, বর্তমান বয়স ৮০ বা ৮২ বছর। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে ছাতা হাতে সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ে কাজে। খুব সকাল বেলা উঠে তাঁকে বেড়িয়ে যেতে হয় গৃহস্থবাড়িতে। পরনে থাকে প্যাঞ্জাবি-পাজামা ও কালো কোট। মুখে এক গোছা পাকা দাঁড়ি রুগ্ন শুকনো চেহারা, মনে হয় অনেক দুর্বল। কিন্তু না শহরে, শহরের বাইরে অনেক দূর-দূরান্তে রোগীদের বাড়ি যান তিনি, কোন ক্লান্তি নেই তাঁর কাজে। এই কাজের পারিশ্রমিক দিয়েই সংসার চলে তাঁর।

হাড়িখালী পালপাড়ার মধ্যে নিজস্ব বাড়িতে থাকেন তিনি। কোথাও ঘর বন্ধ, বাড়ি বন্ধ, শরীর বন্ধ, তাবিজ বানান, অশুভ শক্তি থেকে দূরে থাকার বিভিন্ন কায়দা কৌশল,তন্ত্র মন্ত্র নিয়েই ব্যবসা তাঁর জ্বিনে পাওয়া রোগীর জ্বিন ছাড়ানো তাঁর অন্যতম কাজ। এছাড়া দোষের কারণে যে সকল শারীরিক সমস্যা হয়, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শুকিয়ে যাওয়া- এগুলো দেখেন তিনি। তাঁর ভাষায় এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি আল্লাহর পবিত্র কালাম ব্যবহার করেন, আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। তাঁর কাজের হাতিয়ার সামগ্রী হলো লাল ও কালো কলম ও একটি বই, যে বইটির মধ্যে বিভিন্ন দোয়া, সুরার সংক্ষিপ্ত রূপ লেখা আছে। যে বাড়িতে তাঁকে খবর দেয় সেই বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যান হাতিয়ার নিয়ে। বিভিন্ন দোয়া দুরু পড়ে ফু দিয়ে ঝেড়ে দেন। আর শরীরে যেন কোন অশুভ শক্তি এসে আশ্রয় না নিতে পারে এ জন্য তাবিজ কবজ লিখতে বসেন। সাদা কাগজে লাল কালি কলম দিয়ে দোয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ লিখে তাবিজ তৈরি করেন। প্রতি তাবিজ ৫০ টাকা, বাড়ি বন্ধ দিতে খুব ভোর বেলা সূর্য ওঠার আগে চলে আসেন সেই বাড়িতে। সবার অলক্ষে গৃহকর্তাকে নিয়ে বাড়ির চারপাশের সীমানা নির্ধারণ করে-গর্ত করেন, তারপর ঐ গর্তে তাবিজ, সোনা রূপার তার- এগুলো পুতে ফেলেন এবং বাড়ির চার পাশে আলতো করে একটা দাগ টেনে দেন যাতে ঐ দাগের মধ্যে কোন পাপ আত্মা প্রবেশ না করতে পারে। এসব

www.pathagar.com

পাপ আত্মা, জ্বিন এগুলো বাড়ির ভেতরে একবার ঢুকলে বাড়ির লোকেদের বিভিন্ন অসুখ ভর করে। এগুলো থেকে উনি রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

২. সঞ্জীবনী অক্ষয় নবরত্ম তাবিজ

সুন্দরবন এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যে সকল বিষাক্ত সরীসৃপ আছে বিশেষ করে চন্দ্রবোড়া, কেউটে, টিয়ে বোড়া, শিয়ালচান্দা, গোলবাহারী সাপের কামড়ে প্রতি বছর শতাধিক লোক মৃত্যুবরণ করে।

সুন্দবনের খালে মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে কুমিরের পেটে যায়, বনে কাঠ এবং মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের থাবায় মরে অনেকে। গোলপাতা কাটতে গিয়ে অজগর সাপের আক্রমণে অনেকে আহত হয়। সাপ এবং ভীমরুলের কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা ওঝাদের কাছ থেকে এক ধরণের তাবিজ নিয়ে ব্যবহার করেন, তাবিজের নাম শত্রু নাশক নবগ্রহ বিজয়ী সঞ্জীবনী অক্ষয় তাবিজ। তাবিজ তৈরি করেন এমন এক ওঝার নাম সুভাষ চন্দ্র মন্ডল। সুভাষ চন্দ্রের বয়স ৬০ বছর, সুভাষ চন্দ্রের ওস্তাদের নাম লক্ষীকান্ত কবিরাজ। গ্রাম দোয়ানিয়া বেলাই, ইউনিয়ন হুড়কা, উপজেলা রামপাল। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পূর্বে একটি তাবিজ তৈরি করতে পাঁচশ এক টাকা নিতাম। এখন ধাতুর দাম বেড়ে যাওয়াতে বাজারে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্ব গতির কারণে, একটি তাবিজ প্রস্তুত করে পারিশ্রমিক বাবদ বিনিময় মূল্য নেই এক হাজার এক টাকা। তিনটি ধাতুর তৈরি তাবিজের মূল্য এবং গাছ-গাছড়া সংগ্রহ বাবদ পাঁচশ টাকা খরচ হয়ে যায়। অতএব একটি তাবিজ বিক্রয় করে নিট লাভ থাকে পাঁচশ টাকা।

ওঝার ভাষ্য অনুযায়ী তাবিজ তৈরির কৌশল:

তাবিজটি হবে তিন ধাতুর। তামার বেড়, রূপার কড়া এবং রং সহযোগে ঝালাই দিয়ে তাবিজ তৈরি করতে হবে, তবে তাবিজ তৈরির সময় স্বর্ণকার বা বানিয়াকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাবিজ তৈরির সময় তাবিজে থু-থু লাগান যাবে না, তাবিজ তৈরির সময় লুঙ্গিতে ঘষা যাবে না। তাবিজ তৈরির সময় কারিগর প্রশ্রাব পায়খানা করতে যেতে পারবে না আর গেলেও পাক-পবিত্র হয়ে ধৌত করা বস্ত্র পরে একমনে বসে বানাতে হবে

ওঝারা তাবিজের ভিতর যে সকল বস্তু দেন :

১। সাপের শঙ্খ মাখা কাপড়ের কিয়দংশ।

২। একুশটি পুরের মাটি- যেমন পার্বতীপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, পিরোজপুর এমন ধরনের।

৩। তামা, শিসা এবং চুম্বকের গুড়ার কিয়দংশ।

৪। একটি প্রবাহমান নদীর ভাঙ্গন এবং চরগড়া কুলের মাটি।

৫। দুইটি সূচের অগ্রভাগ।

৬। দুইটি বর্শির অগ্রভাগ।

৭। ভাত খাওয়ার সময় যে ধান পাওয়া যায় তার একটি।

www.pathagar.com

৮। শ্বেত রিরালার মূল।
৯। শ্বেত আখন্দের মূল।
১০। অনন্ত গাছের মূল।
১১। বৃহৎ দারকা (দেবদারু) গাছের মূল।
১২। শিষ আখন্দের মূল।
১৩। গুয়ে বাবলার মূল।
১৪। দাঁতন গাছের মূল।
১৫। খিরিকা মূল।
১৬। মহাসমুদ্র গাছের মূল।
১৭। বিলম্ব (বেল) মূল। শিকড় তুলতে হবে

রবিবার সকালে। শিকড় তোলার সময় নিজের ছায়া যেন গাছে না পড়ে। উপর্যুক্ত দ্রব্যগুলি তাবিজের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তাবিজের মুখ মোম দিয়ে আটকাতে হবে, তারপর তাবিজটি হাতে, মাজায় অথবা গলায় ধারণ করতে হবে। ওঝার ভাষ্য অনুযায়ী তাবিজের গুনাবলী :

- তাবিজধারীর দেহে কোন অমঙ্গলজনিত গ্রহের প্রভাব পড়বে না।
- ব্যবসায়িকভাবে অবশ্যই লাভবান হবেন।
- শত্রু মিত্রতে পরিণত হবে।
- কেউ গুলি করে মারতে চাইলেও ব্যর্থ হবে, হয় গুলি ফুঁটবে না, তা নাহলে গুলি অবশ্যই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।
- সাপে কামড়াবে না। তাবিজধারীকে দেখা মাত্র সাপ মাথা নিচু করে চলে যাবে।
- কুমিরে স্পর্শ করবে না।
- সুন্দরবনে গেলে বাঘের দেখা মিলবে না।
- বনদস্যুরা অপহরণ করতে পারবে না।
- ভূত, পেত্নি, ডাইনী এবং জিনের আছর লাগবে না।
- ডাকিনী, যোগিনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কেউ ক্ষতি বা বশ করতে চাইলে তা ব্যর্থ হবে।
- স্মৃতি শক্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।
- হজম শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
- অপঘাতে মৃত্যু হবে না।
- ডায়াবেটিস এবং হাঁপানী রোগ চিরতরে সেরে যাবে।
- অল্প সময়ে বীর্য স্খলনকারীদের বীর্য ধারণ ক্ষমতা চার গুণ বেড়ে যাবে।
- স্বামী-স্ত্রীর ভিতর মিল মহব্বত হবে, কেউ ভাঙ্গন ধরাতে পারবে না। সংসারে সুখ শান্তি এবং অনাবিল আনন্দ বিরাজমান থাকবে।

www.pathagar.com

খ. তন্ত্রমন্ত্র

১. বাঘ ঠেকাতে ব্রহ্মজাল মন্ত্র

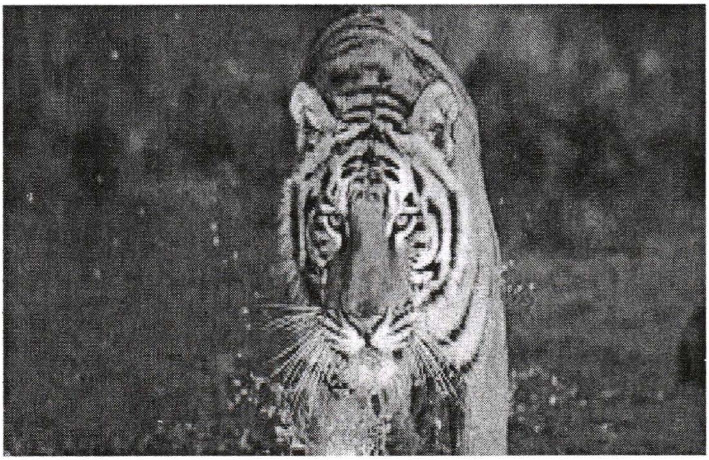

বাঘ

কুশইলাল মণ্ডল নামটি তার বংশধরদের কাছে অতি গর্বের। কুশইলালের পাঁচ পুত্র শরৎ, রসিক, কিরণ, নিরোধ ও গৌর। কুশইলাল ১৯১২ সালে ফরিদপুরের পোড়াবাড়ি এলাকা থেকে সুন্দরবন এলাকার হুড়কা ইউনিয়নের ভেকটমারী এলাকায় এসে জঙ্গল পরিষ্কার শুরু করেন। পাঁচ পুত্র সন্তানকে সাথে নিয়ে ঝোপ ঝাড় এবং সুন্দরবনের বৃক্ষ কেঁটে বসতি স্থাপন করেন। কুশই লালের পুত্রদের সঙ্গে থাকত ধারালো কুঠার ও ধারালো হেসো দা। পুত্রদের হেসোর আঘাতে কত বিষাক্ত সরিসৃপের প্রাণ গেছে তার ইয়াত্তা নেই। জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্যই কুশই লালের পরিবারের বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত সুন্দরবনের বাঘ ও বন্য শুকর। একদিন জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় একটি মাঝারি আকৃতির বাঘ কুশই লালের মেজপুত্র রসিক লালের উপর আক্রমণ করে। কুশই লাল ও তার অন্য চার পুত্ররা বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঠার ও দা নিয়ে বাঘটিকে তারা ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলে, কিন্তু আহত পুত্র রসিকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। এলাকায় কখন কোন উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না, তখন তারা নৌকায় করে রসিকের চিকিৎসার জন্য খুলনার ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের কাছে নিয়ে যাবার জন্য নদী পথে রওনা দেন। কৃষ্ণধন ঘোষ তৎকালীন দিনের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ঋষি অরবিন্দের বাবা। নৌকায় খুলনায় যেতে দুই দিন সময় লাগত, গাড়ি ঘোড়া ছিল না, রাস্তা ঘাট হয়নি। কুশই তার মেজপুত্র রসিককে বাঁচাতে পারেননি, নৌকা বটিয়াঘাটার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর রসিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

কুশই লাল ও তার পুত্রদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, এক পর্যায়ে তারা জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য বাঘ এবং শুকরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার জন্য মন্ত্রবিদ্যা পারদর্শী ওস্তাদ হীরামন সাধুর শরণাপন্ন হন। হীরামন সাধু কুশই লালকে ব্রহ্মজাল মন্ত্র শিখিয়ে

www.pathagar.com

দেন। ব্রক্ষ্মজাল মন্ত্র এমনই এক জাদুকরী মন্ত্র, যা এলাকা নির্ধারণ করে পাঠ করলে, সেখানে যে অবস্থায় বন্য প্রাণী আছে তাদের দাঁতে দাঁত লেগে অসাড় অবস্থায় পড়ে থাকবে। বন্য প্রাণীরা এই সময় কাউকে কামড়াতে পারবে না, এমনকি উঠে দাঁড়িয়ে শিকার করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলবে। কুশই লালের বড় পুত্র শরৎচন্দ্রের পুত্র হরিপদ মণ্ডলের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ব্রক্ষ্মজাল মন্ত্রটি এখানে উল্লেখ করা হল।

ওঁ ব্রক্ষ্মা ওঁ ব্রক্ষ্মা ওঁ ব্রক্ষ্মা
তুমি সৃষ্টির আদি পিতা। তোমার নাম স্মরণ করে
মাটিতে দিলাম হাত
এই এলাকায় আছে যত বাঘ, কুমিরের জাত তোমার নামের জোরে
সব অসাড় হয়ে যাক। দোহাই সৃষ্টির আদি পিতা
ব্রক্ষ্মার দোহাই তোমার নামের কলঙ্ক যেন
না হয় প্রভু
অধমের এই মিনতি।

কুশই লাল এবং তার পুত্ররা এখন আর কেউ বেঁচে নেই। কুশই লালের পুত্রের পুত্ররা এখনও বসতি স্থাপন করে আছে ভেকটমারী গ্রামে। কুশই লাল তার পুত্রদের নিয়ে যে সম্পত্তি বানিয়েছিলেন এলাকার লোকের ভাষায় এক কাটি কাটা সম্পত্তি বলে। প্রায় ৪০ বিঘা অর্থাৎ বিশ একর জমিজমা নিয়ে বসবাস করছে কুশই লালের বংশধররা।

২. মাছ শিকারে গিয়ে বাঘ তাড়ানোর মন্ত্র

মোসলেম উদ্দিন সানা। বয়স ৫২ বছর। মোসলেমের বয়স যখন ৪০ তখন জীবন ও জীবিকার তাড়নায় সুন্দরবনে যান মাছ ধরতে। মোসলেমের আছে একটি ডিঙি নৌকা ও একটি বেহুন্দি জাল। মোসলেম উদ্দিন দুবলার চর সংলগ্ন একটি খালে ভাটায় বেহুন্দি জাল পেতে বসে থাকেন, আধাঘণ্টা পর পর, জালে ওচল দেন এবং মাছগুলি নৌকার খোলের মধ্যে রেখে দেন। জালে যে সকল মাছ ধরা পড়ে, তার মধ্যে পাশে, হরিনা, চাকা, বাগদা, দাঁতনে ও চেলা মাছ বেশি। চাকা বাগদা ও হরিণা চিংড়ি গুলি পার্শ্ববর্তী কামাল সাহেবের ডিপোতে বিক্রি করেন, বাকি মাছগুলি বটি দিয়ে চিরে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করেন। এভাবে মাস যায়, বছর যায়, দেখতে দেখতে বারোটি বছর কেঁটে গেল। খাদ্য খাবারের অভাব নেই। যে সকল ডিপোতে মাছ বিক্রি করেন, তারাই মংলা থেকে ট্রলার করে, চাল, ডাল, তরিতরকারি ফলমূল এনে দেন। দীর্ঘ ১২ বছরে মোসলেমের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠেছে পার্শ্ববর্তী বানর ও পক্ষীকুলের সঙ্গে। মোসলেম যখন তার জালে ওচল দেন তখন বানরেরা তাকে সহযোগিতা করে, বানরেরা মাছগুলা বেছে দেয়, তারা মাছ খায় না, তবে মাছের ভেতর থাকা পোকাগুলা তারা খায়। মাঝে মধ্যে দু'একটি শুঁটকি মাছ মোসলেম বানরদের খেতে দেন। বানরদের সাথে সাথে কিছু শালিক পাখিও মোসলেম উদ্দিনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। পাখিগুলিও মোসলেমের আশে পাশেই থাকে। মোসলেম মাঝেমধ্যে পাখিগুলিকে চিংড়ি মাছ খাওয়ায়। সুন্দরবনে ১২ বছর পূর্তির ঠিক ২ দিন আগে মোসলেম বিপদের মাঝে পড়ে যায়। একটি মানুষখেকো বাঘ মোসলেমকে আক্রমণ করে বসে। মোসলেম যখন তার

www.pathagar.com

নৌকায় বসে জালে ওচল দেবে ঠিক সেইসময় বাঘটি লাফ দিয়ে ডাঙ্গা থেকে নৌকায় ওঠে, মোসলেম তার সুন্দরী কাঠের বৈঠা দিয়ে বাঘকে পেটাতে থাকে, আর ওদিকে শালিক পাখি ও বানরেরা পেছন দিক দিয়ে এসে বাঘকে কামড়াতে থাকে এবং পাখিরা ঠোকাতে থাকে, বাঘ উপায়ন্তর না দেখে নৌকা থেকে লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে চলে যায়। মোসলেম উদ্দিনের জীবনে বিপদ শুরু হয়, ঐদিন রাত একটার দিকে মোসলেম তার জাল ধরার অদূরে ডাঙ্গায় একটি ছোট্ট ঘরে থাকত। ঐ ঘরে গভীর রাতে বাঘটি আবার আক্রমণ করে বসে। মোসলেম উদ্দিনের ঘরের বেড়া শক্ত বাঁশের চটার। বাঘটি প্রথমে থাবা মেরে বাঁশের চটা ভাঙতে থাকে, তখন মোসলেম ধারালো সুন্দরীর ছড় দিয়ে বাঘটির চোখে আঘাত করে, এক পর্যায়ে বাঘটি আরও মরিয়া হয়ে বাঘটি লাফ মেরে ঘরের চালে ওঠে, এবং চাল ফাঁক করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে, মোসলেম এবারও সুন্দরীর ধারালো চিকন ছড় বাঘের চোখে ঢুকিয়ে দেন, বাঘটি চাল থেকে লাফ মেরে নিচে নামে এবং ঘর থেকে চার/পাঁচ হাত দূরে গিয়ে বসে থাকে। মোসলেম ভাবতে থাকেন কি করা যায়, এমন সময় তার মনে পড়ে যায় বহুদিন পূর্বে তার এক আত্মীয় তাকে বাঘ তাড়ানোর মন্ত্র শিখিয়েছিল, কিন্তু এই মূহুর্তে মন্ত্রের সব লাইন তার মনে আসছে, তবে সামান্য কিছু মনে আছে সেটুকু সে বার বার আওড়াতে থাকেন।

পাঁচ পির বদর গাজি
নিয়ে যাও তোমার চেলা পাজি দোহাই মা বনবিবি তোমার পোষা বিড়াল যেন
আর এক দণ্ড না থাকে
আমার সীমানার মধ্যে।

কয়েকবার মন্ত্র পাঠ করার পর, বাঘ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় এবং চলে যায়। মোসলেম উদ্দিন সুন্দরবন ছেড়ে চলে এসেছেন লোকালয়ে, গচ্ছিত অর্থ দিয়ে রামপাল উপজেলার বাঁশতলী ইউনিয়নের ইসলামাবাদ গ্রামে একটি কাঠের দোচালা ঘর তুলেছেন, বিয়ে করেছেন। এক স্ত্রী ও ৫ বছর বয়সী একটি কন্যাকে নিয়ে বসবাস করছেন।

এসো হে পথিক সখা এ পবিত্র প্রিয় বাগেরহাটে
সবুজ সুন্দর শ্যাম রমণীয় ছায়া তরু বাটে।
পির খানজাহানের শুভাশীষ নিয়ে যাও প্রাণে
তোমার চলার পথ প্রসন্ন হোক ছন্দে গানে।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

কুশপুত্তলিকা দাহ/বুড়ীর ঘর পোড়ানো

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যায় (শেষ দিনের সন্ধ্যায়) মোরেলগঞ্জ এলাকার মানুষেরা কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। কলার বাশনা, সুপারির পাতা প্রভৃতি দিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়। খড় বা কুটো দিয়ে একটি বুড়ির মূর্তি বানানো হয়। ওই ঘরের ভিতরে বুড়িকে বসানো হয়। ঠিক সন্ধ্যাকালে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। বাঁশের খোলা বা খেজুরের ফেতরা বেতের মধ্যে ফুড়িয়ে বোন্দে বা কাড়ে তৈরি হয়। ওই বন্দে বা কাড়ে জলন্ত বুড়ির ঘরের আগুনে আগুন ধরিয়ে চারদিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরানো হয়। এই পুরো অনুষ্ঠানটি বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীদের জন্য আয়োজিত হয় এবং তারাই এর সব কাজ করে থাকে।

এই আগুন এবং ধোঁয়ায় কীট-পতঙ্গ, মশা-মাছি পুড়ে যায় এবং মরে যায়। এর ফলে ফসলের উপকার হয়। বুড়ি ছিল অশুভের প্রতিভূ। তার কুশপুত্তলিকা দহনের মধ্য দিয়ে সকল অশুভ দূরীভুত হয় বলে লোকের বিশ্বাস।

হিন্দু ধর্ম মতে আশ্বিন-কার্তিক মাসে মৃত্যু হার কম। শ্মশানে শবদাহ হয় কম। শ্মশানচারী শিবঠাকুরের ছাইয়ের অভাব পড়ে। তাই শিবের দেহে ছাই সরবরাহের প্রয়োজনে বুড়ির ঘর পুড়িয়ে সেই ছাই সরবরাহ করা হয়।

১. সুন্দরবনের ভুত-পেত্নি

সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন মৌসুমে কমপক্ষে বার হাজার লোক জীবন ও জীবিকার তাড়নায় সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। এদের মধ্যে কাঠ সংগ্রহকারী, মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহকারী, পোনা ধরা, এবং গোলপাতা সংগ্রহকারীর সংখ্যা বেশি। বছর খানেক আগের ঘটনা, দীনেশ ও হরেন নামের দুই সহোদর ভাই সুন্দরবন থেকে নল নামক উদ্ভিদ সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে। দীনেশ ও হরেন তাদের পিতৃ প্রদত্ত একটি মাঝারি আকৃতির নৌকা নিয়ে প্রতি বছর জঙ্গলে যায় নল কাটার জন্য। গতবার তারা দুই ভাই শীত মৌসুমে এক সপ্তার বি এল সি কেটে খাবার দাবার নিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। নল কাটার জন্য দিনেশ ও হরেন ভদ্দর নদীর পাশে খালে প্রবেশ করে। নৌকাটি নোঙ্গর করে দুই ভাই রান্নার আয়োজন করতে থাকে, বড় ভাই দীনেশ, হরেনকে বলে ভাই, ডাঙ্গা থেকে কিছু শুকানো ডাল ভেঙ্গে আনো। হরেন দাদার আদেশ মতো খালে নামেন। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও কিছু না দেখে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করেন একটি শুকনো গাছ থেকে হরেন, কিছু ডাল ভাঙ্গে।

www.pathagar.com

ডালগুলি আঁটি করে বেঁধে নৌকার কাছে আসতে থাকে। হঠাৎ নরেন দেখে একটি হরগজার ঝোঁপ, ঝোঁপের ভেতর দুইখানা পুরু তক্তা, হরেন চিন্তা করে তক্তা দুইখানা নিতে পারলে ভাল হয়, নৌকার পাটাতন তৈরি করা যাবে। যেই হরেন তক্তা দুটি টান মেরেছে, অমনি তক্তার অপর প্রান্তে ঝোপের মধ্যে বসে থাকা একটি বড় বাঘ, লাল গামছার মতো উড়ে এসে হরেনকে থাবা মারল। হরেন দাদা ভাই বলে জোরে চিৎকার দিল। দীনেশ একখানা দা নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করল, দীনেশ বাঘকে এলোপাথাড়ি কোপাতে লাগল, বাঘ এবার হরেনকে ছেড়ে দীনেশকে ধরল, দীনেশের পিঠে বসল প্রচণ্ড এক থাবা, হরেন এই ফাঁকে দাদাকে সাহায্য করবে সে উপায় নেই, বাঘের কামড়ে তার ঘাড়টাই মটকে গেছে, মাথার পেছনের দিকের খুলি ঝুলে পড়েছে। দীনেশ মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল, এই ফাঁকে হরেনকে পিঠে ফেলে বাঘ চলে গেল গহীন জঙ্গলে। ঘটনা ঘটার ঘণ্টাখানেক পর, পাটজাল জেলেরা দীনেশকে উদ্ধার করে আনে। পরে জেলেরা ফরেস্ট অফিসে খবর দেন। ফরেস্টাররা বাঘের পায়ের ও রক্তের দাগ দেখে এগোতে থাকেন, ততক্ষণে বাঘটি হরেনের দেহের অধিকাংশ অংশ খেয়ে ফেলেছে। দীনেশকে জেলেরা নৌকায় করে মংলায় নিয়ে আসে। মংলা বন্দর হাসপাতালে ভর্তি করায়, দীনেশ হাসপাতালে দশদিন থাকার পর খানিকটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। বাড়িতে যাবার পর ঘুমের মধ্যে দীনেশ স্বপ্ন দেখে ছোট ভাই হরেন তাকে বলছে দাদা, তুমি বাদায় এসো, আমি তোমার সাথে কথা বলব, তোমার সাথে আমার জরুরী কথা আছে। মাসখানেক পরের ঘটনা দীনেশ একটি নৌকা নিয়ে একাই রওনা দেন জঙ্গলে। দুই ভাই বাদায় এসে যেখানে নৌকা নোঙ্গর করে ছিলেন সেখানে এসে নৌকা ভিড়ান, কিছু সময় পর বিকাল গাড়িয়ে সন্ধা হলো, আস্তে আস্তে রাত গভীর হল, দীনেশ এবার শুনতে পেলেন ডাঙ্গায় কে যেন সুন্দরী গাছের চিকন ছড় দিয়ে গাছে বাড়ি মারছে আর উচ্চ গলায় ডাকছে ভাইরে---হু। এভাবে চার/পাঁচটি ডাক দেবার পর দীনেশ নৌকা থেকে ডাঙ্গায় উঠলেন, সঙ্গে আলো, টর্চ বা ম্যাচ জাতীয় কিছু নিলেন না, পাছে আলো দেখে তার ভাই নরেন দূরে চলে যেতে পারে, তার সঙ্গে কথা না-ও বলতে পারে। দীনেশ জঙ্গলে উঠে দেখলেন চারদিকে সুনসান অন্ধকার, নিজের হাত পায়ের আঙ্গুলগুলি নিজে ভাল করে দেখতে পারছেন না। এবার খানিকটা দূর থেকে আবার শব্দ ভেসে আসল, ভাইরে----হু। দীনেশ কিছুদূর অগ্রসর হলেন, মাঝেমধ্যে বড় গাছে বাড়ি খেয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। কিছু সময় দীনেশ অন্ধকারে একটি বড় গাছের শিকড়ের উপর বসলেন, ক্লান্তিতে দীনেশের চোখে ঘুম আসল, স্বপ্ন দেখলেন নরেন বলছে দাদা, নৌকায় যাও, মানুষ খেকো বাঘটি এই এলাকাতেই আছে, দাদা তুমি আমার সন্তানকে দেখো। দীনেশ সম্বিত ফিরে পেয়ে অন্ধকারের ভেতর অতি কষ্টে নৌকায় গিয়ে উঠলেন। দীনেশ প্রতি বছর একবার জঙ্গলে যান, তবে নল কাটতে নয়, ভাইয়ের সাথে দেখা করতে, দীনেশের ধারণা তার ভাইয়ের আত্মা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এবং গভীর রাত্রে দীনেশকে ডাকে ভাইরে ---হু। স্থানীয় লোকজনের ভাষায় জঙ্গলের এই সকল অপমৃত্যু বরণকারী লোকজনের আত্মা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সুন্দরবনের বাওয়ালীরা এই সকল ভূতকে বলেন "পড়ো"।

www.pathagar.com

২. চৌদ্দ শাক ভোজন ও চৌদ্দ প্রদীপ দান

কার্তিক মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা চৌদ্দশাক খেয়ে থাকেন। গুনে গুনে চৌদ্দ ধরনের শাক একসাথে রান্না করতে হয় এবং খাদ্যের একটি প্রধান আইটেম (তরকারী) হিসাবে পরিবেশন করা হয়। খেতে যথেষ্ট সুস্বাদুও বটে। বিশ্বাস এই যে, ওই দিন চৌদ্দ শাক খেলে, শরীর ভালো হবে এবং মৃত্যুর দেবতা জমের অহংকার চূর্ণ হবে।

ওই সন্ধ্যাতেই চৌদ্দটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ির বিভিন্ন স্থানে রাখতে হয়। সাধারণত ঐরাতেই অমাবশ্যা হয়। কার্তিক মাসের অমাবশ্যা ভয়ের রাত বলে বিশ্বাস। ভুত-প্রেত বেরিয়ে আসে। তাই অন্ধকার দূর করবার জন্য এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আয়োজন।

সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো বাগেরহাট জেলার শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন।

৩. ভাদ্দুরে পান্তা ভাত

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে (শেষ দিনে) নারিকেল গাছের গোড়ায় বাসি পান্তা ভাত দিলে নারিকেলের ফলন বৃদ্ধি পায় বলে মোরেলগঞ্জের মানুষের বিশ্বাস। অবশ্য অধুনা এই বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে।

www.pathagar.com

ধাঁধা

সংগৃহীত ধাঁধা

১. ছিছ পাতা বিজোড় ডাল, ফলটা বাঁকা মধ্যে লাল
উত্তর : তেতুল।

২. হাড় মুড়মুড়ি পাতা খাই, ছোবলাটা নিয়ে হাটে যাই।
উত্তর : পাট গাছ।

৩. রাজাগো হাতি, নিত্যি খায় লাথি-
উত্তর : ঢেঁকি।

৪. শিশুকালের কথা, নয় লক্ষ তেতুল গাছে কয় লক্ষ পাতা?
উত্তর : ১৮ লক্ষ।

৫. এই মাটি চৌচির, তার মধ্যে সোনার পীর
উত্তর : ইঁদুর।

৬. এই মাটি থগর বগর তার মধ্যে সোনার ডগর
উত্তর : হলুদ।

৭. এ্যাকগাছ টান দিলে ব্যাক গাছ নড়ে, কুক্কায় ডিমপাড়ে শ্যাওলায় ভাসে-
উত্তর : বৃষ্টির ফোঁটা যা পানিতে পড়ে।

৮. রাজাগো খোঁড়া গাই, ঘাটে ঘটে পানি খায়।
উত্তর : বড়শি।

৯. আইল বেয়ে যায় সাপ, ফিরে ফিরে চায়
উত্তর : সূচ।

১০. ছোট ছোট ছোয়ালটি দুধ ভাত খায়, বড় বড় গাছের দিকে আড়ে আড়ে চায়
উত্তর : কুড়াল।

১১. সোল গরুর কয়ডা ঠাং-
উত্তর : ৪টি।

১২. আইড়োনের লাঠি বাইড়োনের ফল, সোনার ঢাকনি টেকসি কল
উত্তর : আচার বেলি, ফ্যান ঝাড়া কাইটো।

১৩. চার কলসি মধুভরা বিনা ঢাকনে উল্দে কলা-
উত্তর : গরুর দুধের বান।

১৪. এক বুড়ির তিন মাথা, সে খায় লঙ্কার পাতা-
উত্তর : চুলা (উনুন)

১৫. দুই ঠ্যাং ধরে অমনি দিলাম ভরে, চাপ দিলে গেল হয়ে-
উত্তর : সুপারী কাটা যাতি।

১৬. আহা বেটি করলি কি, বোট নেই তার ধরব কি-
উত্তর : ডিম।

১৭. ছোট্ট খাট্ট ছোয়ালটি, গলার গোড়ায় নুনুটি-
উত্তর : বদনা।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

সংগৃহীত প্রবাদ-প্রবচন

১। শক্তের ভক্ত নরমের যোম।
২। ঢাকে ঢোলে বিয়ে, উলু দিতে মানা।
৩। নেই ঘরে খাই বেশি।
৪। ভ্যাদা মাছে কোঁচ ভাঙ্গে।
৫। আঘে ছোঁচে না মুতে গলা জলে যায়।
৬। হাতি মরলিও লাখ টাকা।
৭। নরম মাটিতে কেঁচো ব্যর ব্যরায়।
৮। চোর পলালি বুদ্ধি বাড়ে।
৯। মামা ভাগ্নে যেখানে, আপদ বালাই সেখানে
১০। সেইতো ভাডি হলি, মারে কেন কান্দালি।
১১। আড়ে নেই ফোঁড়ে আছে।
১২। ঘোমটার তলে ঘন্টা বাজে।
১৩। পরের ভাতে বাগুন দেয়া।
১৪। ধান ছাড়াতি চালির দায়।
১৫। চোর ছাড়ে ডাকাত পোষা।
১৬। আসে কিনা আসে বর, কন্যা নিয়ে তুলে ধর।
১৭। ঘুঘু দেহিছ পালে পালে, ফাঁদ দেহনি কোন কালে।
১৮। নাড় জব্দ কিলি, কিষেণ জব্দ বিলি।
১৯। ম্যাড়া কোন্দে খুটোর জোরে।
২০। কপালে নেই ঘি ঠকঠকালি হবে কি।
২১। মোটে মা রান্ধে না, তথ্য আর পান্থা।
২২। চা'য়ে পায় না ভাত, কেটি কুয়ুরির ঠাট।
২৩। গুদি জোটেনা ত্যানা, তার নিত্যি হাটে তামাক কেনা।
২৪। দুই দিনির ফকির ভাতরে কয় অন্ন।
২৫। ওঠ ছিমড়ি তোর বিয়ে।
২৬। উড়ে এলো শ্যাখ, তার ন্যাক ন্যাকানিডা দ্যাখ।
২৭। শুয়ি খাওতো ঘরে বসে খাও, পোঙায় কামড় ভাঙ্গ যদি রায় মঙ্গল যাও।
২৮। ছাই ফেলতি ভাঙ্গা কুলো।
২৯। হাউস করে গ্যালাম রামায়ণ শুনতি, পোঙা চিরে গেল হরি বুলতি বুলতি।
৩০। জানে না যোন্ত্ররের নাম গুতোয় ভাঙ্গে বস।

www.pathagar.com

৩১। আমে দুধি মিশে গ্যালো,আঠির আমড়া ছটকে গ্যালো।
৩২। ভাতের চায়ে ডাল উঁচু।
৩৩। ছলতো এ্যাক পায়ে খাড়া, মায়ের তো কথা নেই।
৩৪। একদিনের জ্বরে, গুদ দেহে গ্যালো পরে।
৩৫। রাজার চলতি ভেন্যের মরণ।
৩৬। গুদ ন্যাংটা, মাথায় ঘোমটা।
৩৭। চোরে চোরে হালি, এক চোরে বিয়ে করে আরেক চোরের শালী।
৩৮। সারাদিন যায় হেলে বেলে, জ্যোৎসনা রাতি বউ ভারা বানে।
৩৯। চোর গেলি বুদ্ধি বাড়ে।
৪০। ভাল এ্যাত্তি পারি না মোন্দ এ্যাতি পারি, কি দিবি দে।
৪১। উৎপাতের ধন চিৎপাতে যায়।
৪২। গাছে আম বিলি সোল।
৪৩। শাড়ি মল্লো সয়ালে, নায়ে খায়ে কাঁদব আমি বিয়েলে।
৪৪। পাঠায় পাঠায় ধুল পরিমাণ।
৪৫। তাওই পায় না মাউই এর চ্যাদরানী।
৪৬। বুঝলি নালো বালি, বুঝবি দিন গেলি।
৪৭। যেনা রঙের বর তার আবার দুই পায়ে আলতা।
৪৮। ছোট্ট মরিচে ঝাল বেশি।
৪৯। শাল তুমি মাঠে ক্যানো আস আমার পোঙার মধ্যি।
৫০। ছুচতি আগুল গুদি গেল।
৫১। মারির নাম যশোদা ভুত পলায় ডরে।
৫২। মাছ না পায়ে ছিপেয় কামড়।
৫৩। নিখায়গুি ঢ্যাপের মা, না খাতি খাতি ফোলে গা।
৫৪। যোম, জামাই, ভাগ্না তিন নয় আপনা।
৫৫। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।
৫৬। দেখতি পাললি আর শুনতি চায় কেডা।
৫৭। কপাল ভাল যে চোহি কামড়ায়নি।
৫৮। তলে পড়েও এক ঠ্যাং উপরে রাখতি চায়।
৫৯। গাই বাছুর ঠিক থাকলি হাটু জলেও দুধ খাওয়া যায়।
৬০। গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।
৬১। যে বেলাইতে ইঁদুর মারে তার ল্যাজ দেখলে চেনা যায়।
৬২। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে
৬৩। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।
৬৪। কায়দার বাগেরহাট।
৬৫। নাপিত দেখলে নখ বলে।
৬৬। যে লাউ সেই কদু।

www.pathagar.com

৬৭। ধান ছড়ালি বালইয়ের অভাব হয় না।
৬৮। হয়া ভাতে আর বাগুন দিতি হবে না।
৬৯। রস পাড়ার কেউ না জাউ খায়ার ঘাড়া।
৭০। সোমায় খারাপ হলি হাটু জলেও ডুবে মরে।
৭১। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।
৭২। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার।
৭৩। এক মাঘে শীত যায় না।
৭৪। সব পাখি মাছ খায় মাছরাঙার দোষ হয়।
৭৫। ঢেকি সর্গে গেলিও ধান বানে।
৭৬। ঠেলার নাম বাবাজি।
৭৭। বিপদে পড়লি বিলোইও গাছে ওঠে।
৭৮। ঘুরোলী লাঠি ফিরোলী খোন্তা।
৭৯। শেখলাম কয়ানে দেখলাম যেয়ানে।
৮০। বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা।
৮১। ভিখতে কাজ নেই কুত্তুর ঠেয়া।
৮২। সাজদি গুজদি ফিঙে রাজা।
৮৩। খেদাই না উঠোন চষি।
৮৪। সন্নাসী চোর না বোচকায় ঘটায়।
৮৫। কারো পোষ মাস কারো সর্বনাশ।
৮৬। প্যাটে খালি পিঠে সয়।
৮৭। টায়া নেই পয়সা নেই বন্ধু কাল আবার আইসো।
৮৮। যে যা দিয়ে খায় তার সেই ঢেউর ওঠে।
৮৯। চোরের মার বড় গলা।
৯০। পিঠে খাও তার ফোড় গোন না।
৯১। নিজির দেশের কুকুর পরের দেশের ঠাকুর।
৯২। গুনতি না জানলে কি হয়। কোম পড়লি ঠিক পাই।
৯৩। ক্ষুর দেখলি নোখ বাড়ে।
৯৪। বিটিগে চোদ্দ হাত কাপড়েও ব্যাড় আটে না।
৯৫। ডুবোয় ডুবোয় জল খায় একাদশির বাপও জানে না।
৯৬। নাড়ে বেলতলায় একবারই যায়।
৯৭। মরবো বলে করব না বাঁচলি খাব কি।
৯৮। ন্যাংটার আবার বাজ পাড়ার ভয়।
৯৯। না'ড়ে ভূতি ধরলি আর হরিবোলায় কুলোয় না।
১০০। তলের ভাততো নুন দিয়ে খায়ে দেহ না।
১০১। পরের ধনে পোদ্দারী।
১০২। মার পোড়ে না মাসির পোড়ে।

www.pathagar.com

১০৩। এক কাটে ধারে আর এক কাটে ভারে।
১০৪। সব ছ্যাওতে ডোঙ্গা হয় না।
১০৫। থাকলি তায়ই এর বাপেরও শ্রাদ্ধ করা যায়।
১০৬। যত ডায়ে তত ডহে না।
১০৭। নিজি শুতি জায়গা পায় না শঙ্করিরে ডাহে।
১০৮। চোরে খায় দুধ কলা আরো চোরের বড় গলা।
১০৯। হাসে না বুড়োর দুঃখ দেহে।
১১০। গরু যদি গোয়ালে আসে না ন্যাদায়ে যায় না।
১১১। খাইয়ে কাজ থাকলি আর জাগর কাটা আসে না।
১১২। ভাঙ্গা ক্ষ্যাপে রাঙ্গা মাছ।
১১৩। এক হাতে তালি বাজে না।
১১৪। আদাড়ের পাত কোনদিন সর্গে যায় না।
১১৫। মোচের পাছে ভজন আছে।
১১৬। পরের ভরসায় গাঙ সেছা যায় না।
১১৭। যে দেশে কায়ো নেই সে দেশে কি রাত পোহায় না।
১১৮। ডালের মজা তলে।
১১৯। লজ্জা, ঘৃনা, ভয়, তিন থাকতে নয়।
১২০। গোদের উপর বিষ ফোড়া।
১২১। সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ।
১২২। যার মাইয়ের বিয়ে তার পাতে অম্বল নেই।
১২৩। তেলে জলে কোনদিন মিশ খায় না।
১২৪। চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি ধরা না পড়ে।
১২৫। কপাল ভালো যে চোখে কামড়ায় নেই।
১২৬। নাবি গোনে গাই বিয়েলি বাছুর বাঁচে না।
১২৭। নাকতে দরকার নেই ফাপ সরলি হয়।
১২৮। সময় খারাপ হলি ব্যাঙেও চাটি মারে।
১২৯। মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি।
১৩০। ডায়া কুকুরে কামড়ায় না।
১৩১। খালি গামছায় গিরে আটে না।
১৩২। দারোগার চেয়ে মাঝির জোর বেশি।
১৩৩। এক কাজে দুই কাজ হাত দিয়ে দেহি তিন কাজ।
১৩৪। জুতো মারে গরু দান।
১৩৫। পেট ভরে তো চোখ ভরে না।
১৩৬। শালিশ মানি তাল গাছটা আমার।
১৩৭। সাপের লেহা, বাঘের দেহা।
১৩৮। উচিৎ কথায় লক্ষী বেজার।

www.pathagar.com

১৩৯। ফোদের নেই বোদ।
১৪০। খাজনার কড়ি বাজনায় যায়।
১৪১। পাঠা নয় পড়তি হোল নিয়ে টানাটানি।
১৪২। না মরতি ভূত।
১৪৩। ওঠ বলতি বোকচা কান্দে।
১৪৪। যেমনি বুনো ওল তেমনি বাঘা তেতুল।
১৪৫। কাশিতে ভূমিকম্প।
১৪৬। যেই নিতের মা সেই পায়রা বুড়ি।
১৪৭। বাদায় গেলি সব ভাই ভাই।
১৪৮। সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে।
১৪৯। মরিচ পাকলি ঝাল হয়।
১৫০। একেতো নাচনী বুড়ি তাতে আবার ঢোলের বাড়ি।
১৫১। ভাত পায় না ময়না দিদি খয়রা ভাজা খায়।
১৫২। যারে দেখতে নারি তার চলন বাকা।
১৫৩। গুতোয় পড়লি ছুচোয় নামাজ পড়ে।
১৫৪। অতটা গুড় আধসের না।
১৫৫। হাফালে গুয়ো আর নেই।
১৫৬। মাচা নেই তার বুধবার।
১৫৭। হলো ভাতে কাঠি ঘুরানো।
১৫৮। যেনা রঙের বিয়ে তার আবার চিতেই বাজনা।
১৫৯। সব মাছে গু খায়, ট্যাংরা মাছের দোষ হয়।
১৬০। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়।
১৬১। গেও জুগি ভিখ পায় না।
১৬২। নাপিত দিছে যুতো পায়, আর কি নাপিত কথা কয়।
১৬৩। ডেয়া যতো ডায়ে, ততো ডহে না।
১৬৪। তোর বাবা চেনে না ফয়লার হাট, তুই যাতি চাস বাগেরহাট।
১৬৫। যেমন কুকুর তেমন মুগুর।
১৬৬। পিঠে খাও তার ফোড় গোন না।
১৬৭। ধান খাচ্ছ বালই যাচ্ছ কনে।
১৬৮। ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কেলা খাই না।
১৬৯। এক মাঘে শীত যায় না।
১৭০। দায়ে ধার নেই তার আছাড়িতে যুত আছে।
১৭১। চায়া দুধি ছল বাঁচে না।
১৭২। আড়ের চাষ ঘোড়ার ঘাড়ে।
১৭৩। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
১৭৪। ঘোড়া কোনদিন গাঙ্গ দিগেলী হয় না।

www.pathagar.com

১৭৫। লাভের ধন পিড়েয় খায়।

১৭৬। পচা কাঠালের মুচি খদ্দের

১৭৭। ভূই না পেয়ে উঠোন চষে, মানুষ না পেয়ে ভাগ্নে পোষে।

১৭৮। ঢিপির কাঠাল টিপে নরম হয় না।

১৭৯। কানার আবার দিন আর রাত।

১৮০। ভক্তিতে মুক্তি।

১৮১। লাভের ধন পিঁড়েয় খায়।

১৮২। আঙুল ফুলে কলা গাছ।

১৮৩। অত মাইনে যতিন খায় না।

১৮৪। আলির মুড়ো আর বাড়ির বুড়ো।

১৮৫। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

১৮৬। অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর।

১৮৭। অতি ছোট্ট হইওনা ছাগলে মুড়ে খাবে।

১৮৮। চিলের অভিশাপে আর বিল শুকায় না।

১৮৯। হাভাতেরে শাকের ভূই দেহাইয়ে না।

১৯০। শাক তুলতে মই পালের গীত

১৯১। বুড়ো দাদারে আর কলা চিগানো শিখেয় না।

১৯২। কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে না।

১৯৩। চুন খেয়ে গাল পুড়িছে,দই দেহে ভয় নাগিছে।

১৯৪। চাচী মেতে আর চাচা পানি পানি দেহে।

১৯৫। গরীবের দুয়ারে হাতীর পাড়া।

১৯৬। ঝোলের লাউ, আম্বলের কদু।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

১. সুন্দর বনের ত্রিকোণ দ্বীপে হরিণ শিকার

দুবলার চরে প্রতিবছর অগ্রহায়ণ মাসে রাস পূর্ণিমা তিথিতে এক বিশাল মেলা রামপাল, মংলা, মোরেলগঞ্জ, শরণখোলা, দাকোপ, চালনা, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, পাইকগাছাসহ পার্শ্ববর্তী জেলা গুলি থেকে লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় এই মেলায়। দুবলার এই রাস মেলা প্রায় দুশ বছরের প্রাচীন মেলা। দুবলায় রাসমেলা অনুষ্ঠিত হবার সময়ে জেলা বহদ্দাররা মাছ ধরার জন্য দুবলায় অবস্থান করেন, সেজন্য মেলার জম-জমাট ভাবটি আরও বেশি পরিলক্ষিত হয়। দুবলার রাস মেলায় দর্শণার্থী হিসাবে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সমাবেশ ঘটে থাকে, বিশেষ করে হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা প্রায় সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। মেলায় গমনকারী দর্শণার্থীদের পূর্ব থেকে একটা পরিকল্পনা থাকে, মেলার ১০ থেকে ১৫ দিন পূর্বে তারা ট্রলার ভাড়া করেন, নিত্য ব্যবহার্য চাল ডাল, পানি, হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া তোলা হয়। দুবলার মেলার দর্শনার্থীদের মনে একটি সুপ্ত বাসনা কাজ করে তা হলো হরিণের মাংস খাওয়া। কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে হরিণের মাংস খাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। এর জন্য দর্শনার্থীদের অনেক কাঠ-খড় পোহাতে হয়, একেতো সুন্দরবনের হরিণ শিকার বা মারা সম্পূর্ণ বে-আইনী, তাছাড়া জঙ্গলের ডাকাত ও ফরেস্টারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে হরিণ শিকার করে মাংস খাওয়া একটি কঠিন ব্যাপার। তবে এর মধ্যেও কিছু হরিণ যে শিকার হয় না তা নয়। মংলা হয়ে পশুর নদী দিয়ে নৌকা বা ট্রলারে ৩০ (ত্রিশ) কিলোমিটার সাগরের দিকে এগুলেই, একটি ছোট্ট দ্বীপ পরিলক্ষিত হয়, দ্বীপটির নাম ত্রিকোণ দ্বীপ। দ্বীপটি সর্বসাকুল্য ১ (এক) বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে পরিব্যপ্ত। এই ত্রিকোণ দ্বীপে বাঘ নেই একটিও, হয়তো স্বল্প জায়গা বলে বাঘের চলাচলে বিঘ্ন হয়, সেজন্য এখানে কোন বাঘ বাস করে না, তবে এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে হরিণ আছে, কারণ এখানে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস ও ওড়া কেওড়ার গাছ। দুবলার মেলায় যাবার পথে অনেক অতি উৎসাহী দর্শনার্থীরা এই ত্রিকোণ দ্বীপে নৌকা বা ট্রলার নোঙ্গর করেন।

তারপর পাঁচ থেকে ছয়শ লোক হাতে দা এবং লাঠি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে বাগান তাড়াতে শুরু করেন, হরিণগুলোও তাদের বাচ্চা কাচ্চাসহ দৌড়াতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে হরিণগুলো আত্মরক্ষার জন্য পানিতে লাফিয়ে পড়ে, এই সুযোগে লোকজনও লাঠি ও দা দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আঘাত করে হরিণ শিকার করে, তারপর সেই হরিণ জবাই করে সকল ট্রলারের যাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এভাবে প্রতি বছর দুবলার রাস মেলার সময় ত্রিকোণ দ্বীপে কমপক্ষে ১০০টি হরিণের জীবনের অবসান হয়।

www.pathagar.com

২. মুণ্ডাদের কুমির শিকার

সুন্দরবন সংলগ্ন শ্যামনগর উপজেলায় মুণ্ডানামে এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। বনে জঙ্গলে পশু-পাখি শিকার করে এরা জীবন ও জীবিকা চালায়। মুণ্ডারা সাধারণত বনবিড়াল, মেছোবাঘ, বাঘযাসা, খরগোশ, কচ্ছপ, সাপ, গুইসাপ ও কুমির শিকার করে থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চামড়ার বাজারে কুমিরের ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে মুণ্ডারা কুমির শিকারের দিকে বেশি ঝোকেন। কুমির শিকার খুব ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে মুণ্ডারা কুমির ধরার জন্য দুটি অসত্র ব্যবহার করেন এক হল ধারালো বর্শন দুই বড়ধরনের বর্শি মাঝিরা কুমির শিকারের জন্য সুন্দরবনের যে সকল নদীতে বেশি পরিমাণে কুমির আছে সেখানে চলে যায় , বিশেষ করে মরা পশুর ও ভদ্দর নদীতে শীত কালে প্রচুর পরিমাণে লবণ পানির কুমির দেখা যায়। মুণ্ডারা দল বেধে একসঙ্গে আট থেকে দশ জন সদস্য হাঁটাপথে ষোলভাগ দিয়ে গভীর সুন্দরবনে প্রবেশ করে ভদ্দর নদীর পাড়ে উপস্থিত হন। শীতকালে কুমিরগুলো রোদ পোহানোর জন্য পানি থেকে চরে উঠে। ঠিক ঐসময়ে মুণ্ডারা বর্শিতে মাছ গাথেন এবং কুমিরের সামনে চেলে দেন। কুমির মাছটি গিলে ফেলে বর্শি ... এবং বর্শির দড়ি শক্ত করে গাছের সাথে বেধে ফেলে মুণ্ডারা। কুমির বর্শি থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রাণপণে দাপাদাপী করতে থাকে। এবার দলপতি ছাড়া সকল শিকারী মুণ্ডারা কুমিরের চারদিকে ধারালো বর্ষা নিয়ে অগ্রসর হন। দলপতির নির্দেশ পেলে সবচাইতে শক্তিশালি মুণ্ডাটি তার বর্ষা কুমিরের ঘাড়ে গেঁথে দেয়। কুমিরের ঘাড় অন্যান্য স্থান থেকে নরম হওয়ার কারণে মুণ্ডারা ঘাড়েই আঘাত করেন। এরপর সুন্দরবনে জন্মায় দড়ির মতো দেখতে লম্বা লতানো গাছ , যাকে স্থানীয় ভাষায় সড়া গাছ বলে, সেই গাছের তৈরী ঢোয়া নিক্ষেপ করে কুমিরকে বেঁধে ফেলা হয়, তারপর কুমিরটিকে ডাঙ্গায় তুলে ছামড়া ছাড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মুণ্ডারা একটি কুমিরের চামড়া পাইকার চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা পযর্ন্ত বিক্রয় করে থাকেন। মুণ্ডারা জানেন কুমিরের চামড়া দিয়ে কী হয়। তবে পাইকারী চামড়া ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন, এই চামড়া দ্বারা খুবই উন্নত মানের ভ্যানিটি ও মানিব্যাগ তৈরি করা হয়।

৩. বাঘ শিকার

মনাদাশের বড় ভাইয়ের নাম কিরণ দাশ। মনা ছোট বেলা থেকেই শিকারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করত, প্রথমে গুলতি দিয়ে কাক, বক, শালিক, ঘুঘু, শিকার করে বেড়াত ঝোপ-ঝাড়ে, বন-বাদাড়ে। মনার বয়স যখন ১৯ বছর তখন দাদর একনলা পাকিস্থানী সেকেন্দার বন্ধুক নিয়ে বের হন বালিহাঁস শিকার করার জন্য; রামপাল উপজেলার গাজীখালীর বিলে প্রচুর পরিমাণে বালি হাস পড়তো। মনা দাশের পাখি শিকার করার এক অভিনব পন্থা ছিল, পাখিরা যখন ঝাঁক বেঁধে আকাশে উড়তো তখন মনাদাশ তাঁর বন্ধুক উঁচু করে পাখির ঠোঁট বরাবর নিশানা করে গুলি ছুড়তো, গুলি গিয়ে লাগত পাখির বুকে, পাখিরা আর্ত্মনাদ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। মনাদাশের হাতের অব্যর্থ নিশানা দেখে তার বন্ধুরা তাকে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ শিকারের পরামর্শ দিল। মনাদাশ

www.pathagar.com

তার দুই বন্ধু কেনারাম মণ্ডল ও রেজোয়ান গাজীকে সাথে নিয়ে হলদিবুনিয়ার পথে বৈদ্যমারী হয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করল। একটি মানুষখেকো বাঘ দীর্ঘদিন ধরে রাতের বেলা বৈদ্যমারী এলাকায় যাতায়াত করছে, মাঝেমধ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার অনেকের গোয়াল গরু ও ছাগল শূন্য হতে লাগল। রাতের বেলা বাঘের ভয়ে লোকজন ঘরের বাহির হন না। মনাদাশ সামনে, মাঝে কেনারাম, তার হাতে একখানা ধারালো দা, রোজেয়ান গাজীর তাতে একটি দোনলা বন্দুক। কেনারাম বাঘের পায়ের ছাপ বিশেষজ্ঞ, বাঘের পায়ের ছাপ দেখে কেনারাম বলে দিতে পারে কতক্ষণ আগে বাঘটি এখান দিয়ে হেঁটে গেছে। কেনারাম পরীক্ষা করে বলল, মাত্র আধাঘন্টা আগে বাঘটি এই পথ দিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করছে। বাঘের পায়ের ছাপ ধরে তিন বন্ধু অগ্রসর হতে লাগল। আধামাইল হাঁটার পর একটি উঁচু ঢিবি মতো জায়গায় এক হেতাল বনের মধ্যে বাঘটির সন্ধান পাওয়া গেল। মনাদাশ, বাঘের চিবানোর শব্দ শুনতে পেল। হেতাল বাগানের পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি খাল বয়ে গেছে সেজন্য গাছা দিল বাগানটির উত্তর ও দক্ষিণ পাশে। মনা ও কেনা একটি বাইন গাছে উঠে বসল, রেজোয়ান উঠল একটি কেওড়া গাছে। অনেকক্ষণ হলো বাঘ বের হয় না, সম্ভবত খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাঘের ঘুম ভাঙ্গলো সন্ধ্যার ঠিক আগে, বাঘটি লম্ব হয়ে আলস্য ত্যাগ করল, দুটি ডাক দিল, তারপর হন হন করে বাইন গাছটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মনাদাশ তার বন্ধুকে এল জি গুলি ভরল, ট্রিগারে আগুল রাখল, এবং বাঘের কপাল লক্ষ কলে গুলি করল, বাঘ চিৎকার দিল, এবং ১০/১৫ হাত লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল, মনা সাথে সাথেই আরেকটি গুলি ভরে বাঘের কান বরাবর গুলি করল, বাঘটি নিস্তব্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে রইল, কেনারাম মেপে দেখল লম্বায় আট হাত। বাঘটিকে ফেলে রেখে তিনজনে বৈদ্যমারী বাঘের মৃত্যুর খবর লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পরদিন সকালে মনা, কেনা ও রেজোয়ান দুজন কসাই সাথে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করল বাঘটির চামড়া ছাড়িয়ে আনার জন্য। চামড়া ছাড়ানো হল, চামড়ায় লবণ মাখানো হলো ১০ কেজি। বাঘের চামড়া নিয়ে তিন বন্ধু কেনারামের বাড়িতে পৌছালো, কেনারাম তার মামার বাড়ির ছাদে যত্ন সহকারে চামড়াটি শুকালো, তারপর একদিন কিরণ দাশের নির্দেশ মতো মনাদাশ চামড়াটি বাড়ি নিয়ে যায় এবং খড়-কুটা ও বাঁশের চটা দিয়ে বাঘের মূর্তি তৈরি করে চামড়াটি পড়িয়ে দেয়। দুটি কাঁচের মার্বেল দিয়ে বাঘের দুটি নকল চোখ তৈরি করা হয়। কিরণ ও মনাদাশের মৃত্যুর পর বাড়িটি বাংলাদেশে সরকার এস পি অফিস বানায়। বাঘের মূর্তিটি বর্তমানে বাঘেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে গচ্ছিত আছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি